ক্যানভাসে

অনিরুদ্ধ বসু





ক্যানভাসে

অনিরুদ্ধ বসু





ক্যানভাসে

অনিরুদ্ধ বসু



স্মৃতি পাবলিশার্স

CANVASE
A Bengali Novel by ANIRUDDHA BOSE
Published by SMRITI PUBLISHERS
Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
প্রথম ই-বুক প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদপটঃ অদিতি চক্রবর্তী
অলংকরণঃ স্বপন দত্ত

ISBN No: 978-93-82303-40-4
প্রকাশকঃ
স্মৃতি পাবলিশার্স
'ওয়েসিস' সি এফ - ৪১ সেক্টার ১
সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৭০০০৬৪

আমার পিতৃস্থানীয়
অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় কে-

যাদের সহায়তা এই লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

দেবাশিস বসু

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভিবজিওর শব্দটার অর্থ আমাদের সবারই জানা। সূর্যের সাদা আলোর বর্ণালির সাত রং-এর ইংরেজি আদ.ক্ষরগুলিকে পরপর সাজালে এই শব্দটি পাওয়া যায়। তার মানে সাদা রং ভেঙে এই সাতটি রং মেলে। বিপরীত ভাবে দেখলে, সাতটি বিভিন্ন রং মিলে তৈরি হয় সাদা রং।

পিওর ম্যাজিক!

আবার এই দৃশ্যমান রং-এর জগতের ওপারে আছে এক রংহীন জগৎ, অতি বেগুনি আর লাল উজানি আলোর এক ভিন্ন রাজ্য। সেখানে পৌঁছতে পারলে কোথায় রং? মানুষের চোখ সেখানে হয়ে পড়ে অকেজো। অনুভূতির অন্য স্তরে সেখানে বিরাজমান অন্য ইন্দ্রিয়ের অনন্য অনুভূতি।

মানুষও ঠিক এ রকম নয় কি? প্রতিটি মানুষের চরিত্রই তো কত রকম রং-এর, সাত বা সাতাত্তর, কেউ কি খেয়াল করে? কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটি বিশেষ রং, আর দর্শকরা বলে 'বাঃ!' কখনো বা ঝলসে ওঠে অন্য কোনো রং, আর সেই দর্শকরাই অবাক হয়ে বলে 'আরে, এরকম তো আগে দেখিনি!' আসলে সবই তো সেই জীবন নামক প্রিজমের খেলা। একই জন, বিভিন্ন প্রকাশ। আরও গভীরে যদি কেউ ডুব দেয়, তবে হয়তো পৌঁছে যাবে সেই রং-এর ওপারের অপ্রকাশ জগতে, যেখানে একজন বর্ণময় মানুষ হয়ে ওঠে অবচেতনের আবছায়া।

এই যে মানব চরিত্রের রং-এর খেলা, এটা দেখার এক টুকরো খোলা জানালা অনিরুদ্ধ বসুর এই উপন্যাসটি। অনিরুদ্ধ বরাবরই নতুন নতুন আঙ্গিক নিয়ে লেখে। লেখা নিয়ে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করে। এই উপন্যাসটি এক নতুন ধারায় লেখা। একই নারীকে নিয়ে সাতটি ছোটগল্প, আর তারপর সব মিলে মিশে একটি উপন্যাস – এ যেন সেই সাত রং-এর খেলা। ভিবজিওর মিলে মিশে সাদা।

তারপর কেন্দ্রীয় চরিত্রটি (প্রথাগত নায়িকা বলতে আমার কুণ্ঠা হচ্ছে!) এক সময় খুঁজে পায় তার রঙিন বাইরের খোলসের অন্দরের গভীর বর্ণহীন অন্তর্সত্ত্বাকে। এ যেন

ভিবজিওরের ওপারের অতি বেগুনি বা লাল উজানি আলোর খোঁজ পাওয়া।

জানি না, আর কেউ এ ভাবে মানবী চরিত্র বিশ্লেষণ করে উপন্যাস লিখেছেন কি না। তবে বাংলা ভাষায় আমরা যারা মেন স্ট্রিমের বাইরে দাঁড়িয়ে, নতুন কিছু বলার বা লেখার চেষ্টা করছি, তারা স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ জানাচ্ছি অনিরুদ্ধকে, তার এই অসাধারণ প্রচেষ্টার জন্য।

আশা করি মননশীল পাঠকরাও একমত হবেন।

দুর্গাপুর

আগস্ট ২০১৪ আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

অনি. দ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছু কথা...

অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, কলকাতায়। পেশায় প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জন। লেখাটা তার নেশা। ২০০৬ সাল থেকে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন।

প্রথম উপন্যাস 'অন্বেষণ' আলোড়ন সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্য মহলে। ছুঁয়ে যায় আপামর বাঙালি মন। তথাকথিত উচ্চবিত্ত সমাজের পঙ্কিলতা ঘেঁটে আসল ঘরের অমোঘ সত্যটা গণিতের Venn Diagram Theory - র ওপর ভিত্তি করে মানুষের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। পরে তার ইংরেজি ভাবান্তর 'Quest' নামক উপন্যাসে প্রকাশিত হয়।

তার দ্বিতীয় উপন্যাস 'নিঃশব্দে' বর্তমান সমাজের বিরাট ক্যানভাসে আঁকা, আজকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান খণ্ডিত সময়, পূর্ণতার আস্বাদ নিয়ে, এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবনদর্শনের উপাখ্যান। শুধু বহুদিন ধরে বেস্টসেলারই হয়নি, লন্ডন বুক ফেয়ারে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ সাক্ষর রাখে।

তৃতীয় লিরিক্যল উপন্যাস 'দেখা' তার পৃথিবী পরিক্রমা ও জীবন দর্শনের এক নিভৃত আরাধনা। পশ্চিম দেখছে পুবের জাগতিক দৈন্যের পিছনের এক বিশাল ঐতিহ্যকে। নাকি পুব দেখছে পশ্চিমের বৈভবের আড়ালে এক অনন্ত হাহাকারকে? কী ভাবে দেখছে? অণুবীক্ষণে না দূরবীক্ষণে? না কী, বিহঙ্গ দৃষ্টিতে! এই উপন্যাসও বেস্টসেলারের খাতায় নাম লেখায়। উপন্যাসটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় 'The Vision' নাম নিয়ে।

সে বারবার তার রচনাশৈলী ও চিন্তাধারাকে সাজাতে চায় নতুন আঙ্গিকে, নতুন দর্শনের বিন্যাসে।

যার ফলস্বরূপ তার চতুর্থ চাঞ্চল্যকর খুনের উপন্যাস 'চক্র' প্রচলিত দেশি ও বিদেশি প্রথার বেড়া ভেঙে পরিবর্তন এনেছে মৌলিক চিন্তাধারায়। যুক্তি বিদ্যা ও আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এক নতুন আঙ্গিকের রহস্য কাহিনি, যা খুন এবং খুনির বিবর্তন ঘটিয়েছে এই উপন্যাসটিতে। এটিও বেস্টসেলারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা পরে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে 'Fulcrum' নাম নিয়ে।

পঞ্চম উপন্যাস 'তোমাকে...' - তে একটি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে উপস্থাপনা করেছে প্রেমের ছন্দোময় পত্র-উপন্যাসে। নামহীন দুজন মানব মানবী, আধুনিক জীবনের গোলোকধাঁধায় কানামাছি খেলতে খেলতে কখন পৌঁছে যায় সময়ের অন্দরমহলে, যেখানে সময় হয়ে ওঠে উল্লম্ব, নিয়ে যায় তাদের তুরীয় লোকে। আগের মতোই বেস্টসেলারের তালিকায় এটিও অন্তর্ভুক্ত হয়।

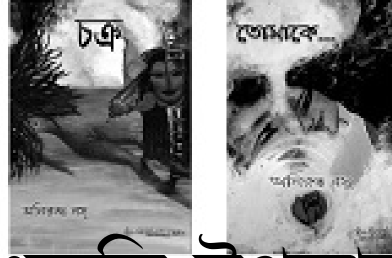
তার প্রথম স্বরচিত ইংরেজি ইন্টারন্যাশনল অ্যাড্রিনালিন চার্জড থ্রিলার 'Pursuit' এক অনন্য চিন্তাশৈলীর উদাহরণ। অনেক রহস্যময় মৃত্যুর ফাঁকে উঠে আসে বর্তমান জগতের কঠিন জিও-ইকনমিক্স। আর নিভৃতে ফল্গুধারার মতো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউসিকের মতো বেজে চলে বিশ্বশান্তির অমৃতবাণী। উঠে আসে মানুষের উত্তরণের অমোঘ মন্ত্র, যা পরিণতি পায় তার আগামী ইংরেজি উপন্যাসে।

প্রতিটা লেখায় সে নিজেকে ভেঙে, নতুন ছাঁচে সাজাবার চেষ্টা করে, যার আরেক নিদর্শন 'ক্যানভাসে'।

নিজেকে নতুন নতুন ভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই তার সৃষ্টির তৃপ্তি। জীবনের শান্তি খুঁজে পায় স্ত্রী স্মৃতি বসুর মধ্যে।

লেখকের অন্যান্য বেস্টসেলার বাংলা উপন্যাস





ইংরেজি উপন্যাস



. রু...

"আপনি আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখবেন?"

ফেসবুকের মেসেজ বক্সে মেসেজ দেখে চমকে উঠলাম। একজন মহিলার আবদার! কিন্তু কে এই মহিলা? প্রোফাইলে গিয়ে দেখলাম 'ফেসবুকের অসংখ্য 'ফ্রেন্ড' এর তালিকার মধ্যে একজন। পরিচয় জানি না। তাকে চিনি না। তার আসল পরিচয়টাও যে কী, সেটাও তো অজানা! একটা ভারচুয়াল প্রোফাইলের ওপর কী গল্প লেখা যায়? জীবন থেকে বিচ্যুত এক অলীক কল্পনার মাধুরীতে ঢাকা একটা অস্পষ্ট অবয়ব। ধোঁয়াশায় ভরা এক নারী।

প্রোফাইলের ছবিগুলো দেখলাম। একবার... দুবার... বেশ কয়েকবার। সুন্দরী তো বটেই। এর আগে তো চোখে পড়েনি! হয়ত ব্রাউজ করতে করতে ছবিটা কখনও সামনে আসেনি। তাই 'ফ্রেন্ড' লিস্টে থাকলেও ঠিক চেনা হয়ে ওঠেনি।

"না জেনে কি গল্প লেখা যায়? সম্ভব না" মেসেজটা পোস্ট করে ভাবলাম, ঠিকই তো। না জেনে, না চিনে, না বুঝে কি কাউকে নিয়ে লেখা যায়? বাজারে গাঁজাখুরি গল্পের কমতি নেই। আমি আর সেই ভিড়ে নিজেকে জড়াই কেন? ভিত্তিহীন অসংলগ্ন সৃষ্টির অন্ধকারে? যেখানে স্বপ্ন আর বাস্তব তালগোল পাকিয়ে গেছে?! সৃষ্টির ব্যাপক প্রাণহীন উল্লাসে। হয়ত বা প্রাণ প্রাণোজ্জ্বল হয়ে ভাসছে – চাটুকারিতার দমকা বাতাসে। অস্তিত্বহীনতার শেষ সোপানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ফলাও করা স্লোগানে...

"অন্তত আপনার বইয়ের কভার পেজে আমার ছবিটা ছাপাবেন?" মেসেজ-বক্সে কাতর মিনতি মাখা উত্তর।

মানে স্বপ্ন দেখতে চাইছে নিজেকে নিয়ে। কিংবা স্বপ্নে ভাসাতে চাইছে আমাকে। ঠিক কোনটা বুঝলাম না। তবে স্বপ্নের চেতনার এক বাস্তবিক রংমশাল জ্বালাতে চাইছে কোথাও একটা - চেতনার ক্যানভাসে। হয়ত চেতনার ওই সাদা ক্যানভাসে কিছু আঁকতে চাইছে। মনকে সাজাতে চাইছে রামধনুর সাতটা রং-এর বাহারে, নতুন করে একটা তুলির স্পর্শ

টেনে দিতে। তবুও সে স্পর্শকে চেনা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না। ধরতে গিয়েও ক্রমশ অস্পষ্ট আকারটা আবার নিরাকার হয়ে যাচ্ছে।

ক্ষণিকের ভেসে ওঠা মুখটা আবার না-পাওয়ার ভাসমান আকাশে হারিয়ে যাচ্ছে নানা রং-এর রামধনুর বাহারের বাইরে - না-রং-এর তুলিতে আঁকা এক ছন্দ, সুর, গন্ধ মাখা বর্ণচ্ছটায়। বাস্তবের পৃথিবীর অর্থহীন ঘনঘটায়। তবুও মন যেন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বার বাইরে অবলুপ্তির অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে একটা অস্পষ্ট অবয়ব।

নামটাও ঠিক কি না জানি না। এই ভারচুয়ালটির পৃথিবীতে কোনটা যে সত্যি আর কোনটা যে মিথ্যে বোঝবারও যো নেই!

ধরা যাক তার নাম নন্দিনী।

নামে কী আসে যায়? নন্দিনী না হয়ে পদ্মিনী, দর্পিণী, মৃগনয়নী হলেও কিই বা আসে যায়? একটা ছবির না-চেনা অবয়ব। দেখতে সফিস্টিকেটেড, বেশভূষায় আজকের যুগের বৈশিষ্ট্য, প্রসাধনে নিজেকে সুন্দর করে দেখানোর প্রয়াস। মনে হয় উত্তর চল্লিশের ধারে কাছে কিংবা হয়ত একটু বেশি। আধুনিকা গৃহিণীকে নিয়ে না চিনে অনেক কিছুই তো লেখা যায়। নাই-বা দেখলাম তাকে। নাই-বা চিনলাম তাকে।

লেখকের বাস্তবিক কল্পনার ডানা মেলে ভেসে গেলে, মন্দ কী? চেষ্টা করে দেখা যাক না কেন।

হয়ত একটা কাহিনিও হয়ে যেতে পারে?

. থম নন্দিনী

সময় যে আর কাটতেই চায় না। সকাল ন'টার মধ্যেই রান্না শেষ। ততক্ষণে অনীশ স্কুলে বেরিয়ে গেছে। এখন বড় হয়ে গেছে। স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয় না। আগামী বছর মাধ্যমিক দেবে। ঘর ঝাঁট দিয়ে, স্নান সেরে, হেয়ার-ড্রায়ারে বব চুলটা শুকিয়ে হাউস কোটটা ঠিক করতে করতে নন্দিনীর মনে হল, বিয়ে করেও শেষ পর্যন্ত ঘরটা আধুরা রেয়ে গেল। ছবিটা আঁকতে গিয়েও ক্যানভাসে ছবিটা আঁকা হল না। শুধু পড়ে রইল তার আদরের অনীশ। ওকে বুকে আগলে এতটা বছর কেটে গেল, অনীশকে মানুষ করতে করতে। নতুন করে ছবিটা আঁকতে গিয়ে অসমাপ্ত রয়ে গেল ক্যানভাসটা।

কেন যে এমন হয়?

যেদিন অর্ণবকে বিয়ে করেছিল, দুজনে মিলে নতুন একটা ছবি আঁকার স্বপ্ন দেখেছিল। ওর হাত ধরেই মাঝ সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়েছিল দেশ থেকে দেশান্তরে। বিয়ের পর প্রথমবার অর্ণব তাকে নিয়ে গেছিল সঙ্গে করে। এক সপ্তাহের ওপর জাহাজে ভেসে বেড়ানো – কলকাতা থেকে হনলুলু। ট্রিপটা ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে অর্ণবের সাহচর্য। অন্যদিকে নতুন জীবনের স্বপ্ন। হনিমুনের মাধুর্যে অসীম সমুদ্র আর গভীর নীলের ক্রেডেলে, মধ্য প্যাসিফিকে অনীশের ভ্রূণ নিজের গর্ভে ধরে ঘরে ফিরেছিল নন্দিনী।

অর্ণব বলেছিল "আফটার দিস প্রব্যবলি ইউ কান্ট একম্প্যানি মি এনি মোর। ইন দ্য মিড ওসেন মেটারনিটি সার্ভিসেস আর নট ওয়েল গিয়ারড..."

সেই গিয়ার ঠিক রাখতেই, এত বছর ধরে, একা সংসারের গাড়ি সামলে আর জীবনের স্টারটার চাপা হল না। অনীশ দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই পিক-আপ নিয়ে ছুটবে। কিন্তু নন্দিনীর গাড়ি স্ট্যাটিক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সিডি ব্লকের বাড়িটার মধ্যে – সামনের মাঠটার দিকে উদাস চোখে যৌবনের বাতিগুলো আস্তে আস্তে নিভে যেতে দেখে, অপরাহ্নের ধূসর ছবিটা ফুটে ওঠার দিকে উদাসীন ভাবে চেয়ে। না-পাওয়ার পাহাড়টাকে ক্রমশ মেনোপসের দিকে হামাগুড়ি দেওয়া তার পূর্ণ যৌবনকে পাথেয় করে, না পাওয়ার রংটাকে নতুন তুলির টানে ভরিয়ে দিতে, একটা না-চেনা ব্ল্যঙ্ক ক্যানভাসে।

ক্যানভাসটা বোধহয় চিরকালই ব্ল্যাঙ্ক। তবুও বারবার নতুন রং দিয়ে তাকে ভরতে চেয়েছে। কিংবা সাজাতে চেয়েছে তাকে জীবন থেকে কুড়িয়ে আনা ধূসর মাটির প্রলেপ দিয়ে, সাজাতে তাকে নতুন রং-এর সম্ভারে। যতবারই আঁকতে চেয়েছে ছবিটা, আবার তা মিলিয়ে গেছে রং থেকে বেরং-এ, বর্ণ থেকে বর্ণহীন ধূসরতায়, পাওয়া থেকে না-পাওয়ার চিত্রগাথায়। রং-এর ঔজ্জ্বল্য থেকে বর্ণহীন ক্যানভাসে।

কোন রং-এর ছবি? কার ছবি? কীসের ছবি? কেনই বা তার নারী মন বারবার একটা ছবি আঁকতে চায়? জৈবিক জীবনে স্বাক্ষর আঁকতে চায় পূর্ণতার রঙে ভরা ক্ষুদ্র জীবনের পরিব্যপ্তিতে?

তখন ইন্দ্রনীলের ঠোঁটটা নতুন কিছু চাইত। নন্দিনীর কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের রঙে মিলিয়ে ফাগুয়ার হোলি খেলতে।

"উঃ..." নন্দিনীর কাঁপা কাঁপা দেহের, বুকের ওঠা নামার ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে।

দেহ খুঁজত দেহ, ছন্দে আনন্দে আবেগের বন্দনা গানে। আজ এত বছর পরে, একটু ভারী হয়ে যাওয়া সুঠাম দেহটা কী আজও কাঁপে? অস্থির আবেগে একা ঘুম ভাঙা অন্ধকারে? মাঝরাতের ছটফটানি কী মিশে যায় চাতকের স্লোগানে! না-পাওয়ার ভাষাহীন বেদনার তানে? নিজেকে আবার খুঁজে দেখার অপরিচিত অভ্যুত্থানে?

ফোনটা বেজে উঠল "নন্দিনী... আমায় চিনতে পারছ?"

"কে?" স্মৃতির ঝাঁপিতে কোন চেনা সুরকে খুঁজছে নন্দিনী।

"চিনতে পারলে না?"

"না তো। কে আপনি?"

ওপার থেকে ভেসে এল একটা মুচকি হাসির শব্দ। তারপর একটা কাশির আওয়াজ। ঠিক ক্রনিক স্মোকারদের যেমন হয়।

"আরেকটু ভেবে দেখ। স্মৃতির পাতা থেকে..." নন্দিনীর মনে হল কেউ যেন কানামাছি খেলছে।

"নাঃ। চিনতে পারলাম না..."

"আর একটু ভেবে দেখ..."

বিরক্ত হয়ে নন্দিনী বলল "নামটা বলুন। তা না হলে ফোন কেটে দিচ্ছি"

ওপাশ থেকে ভেসে এল “বেশ। আমিই কেটে দিলাম। ভাববার সময় দিচ্ছি। ভেবে দেখ”

কলার নিজেই লাইনটা কেটে দিল নন্দিনীকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে। এক শূন্যতার মধ্যে আরেক শূন্যতা যোগ করে। সাদা পট সাদা রয়ে গেল। রঙিন হল না তুলির স্পর্শে। সেই শূন্যতার মধ্যে, নন্দিনী অতীতের পাতাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখার চেষ্টা করল, কে এই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। অতীত থেকে বর্তমানে এমন কাউকে মনে করতে পারল না, যে ধোঁয়াশায় রেখে নন্দিনীকে ফোন করতে পারে। এ জীবনে অনেক বসন্ত থেকে তাপদগ্ধ গ্রীষ্ম পার হয়ে এসেছে। কিন্তু হেঁয়ালি মেশানো অতর্কিতে হঠাৎ ফোন করতে পারে, এমন কারও কথা স্মৃতির র‍্যম মেমরি থেকে ক্যাসেও নেই, যে তাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

নারায়ণ নীচের বেল টিপতেই দরজাটা খুলে দিল নন্দিনী। নন্দিনীর হাতে থলিটা এগিয়ে বলল “আপনি বলেছিলেন কচি পাঁঠার মাংস আনতে। দোকানদার বলল পাঁঠার চেয়ে মুরগি বয়সে আরও বেশি কচি। তাই চিকেন নিয়ে এলাম”

“বেশ করেছ” ঝাঁঝিয়ে উঠল নন্দিনী। নারায়ণকে নিয়ে আর পারা গেল না। ও শুধরাবে না। তবুও তো একজন ফাইফরমাশ খেটে দেয়। তা না হলে তো নন্দিনীকেই রোজ রোজ বাজারে ছুটতে হত।

ব্যাগ খুলে দেখল অন্তত চিকেনটা কেটে এনেছে। ভাগ্যিস! বলা তো যায় না। হয়ত গোটা চিকেনটাই নিয়ে আসতে পারে! নারায়ণের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

অনীশ পাঁঠার মাংস ভালবাসে বলেই তো আনতে দেওয়া। উঠতি বয়সে একটু চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাবে না, তো কি বুড়ো বয়সে খাবে? যখন সব দাঁত পড়ে গেছে? নন্দিনী ভাবতেও পারে না অনীশ বুড়ো হয়ে যাবে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার অর্ণব বিয়ের কয়েক বছর পরেই হারিয়ে যাওয়ায়, তাকে ইতিহাসের সাজঘরে সাজিয়ে, অনীশকে নিয়েই বাঁচতে শিখেছে নন্দিনী।

কালকে আবার নিজেকে গিয়েই কচি পাঁঠা কিনে আনতে হবে। মুরগির মাংসটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে নারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলল “মুরগিটা বুড়ো নয় তো?”

“একদম নয়” নারায়ণ জিভ কেটে বলল “দোকানদার বলল একেবারে কচি... পোলট্রির মুরগি তো... কচি ঘাস খেয়ে বড় হয়ে উঠেছে”

পয়েন্টলেস। নারায়ণের যুক্তির পৃষ্ঠে কথা বলা বাতুলতা মাত্র। নন্দিনীর ক্ষমতা নেই নারায়ণের যুক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার।

"ভাবছিলাম তোকে কিছু শাকসবজি আনতে দেব। থাক...কালকে আমি যখন বেরব, তখন নিজেই কিনে আনব"

"বলুন না দিদিমণি...আমি কিনে আনি..."

"না থাক। আমিই কিনে আনব" একটু থেমে বলল "যা তো – ছাদের গাছগুলোতে একটু জল দিয়ে আয়। কতদিন দেওয়া হয়নি। আবার না মরে যায়..."

নারায়ণ বেরিয়ে যেতেই আবার ফোনটা বেজে উঠল "এখনও চিনতে পারলে না?"

মহা জ্বালাতন তো। আবার সেই লোকটা বলে চলল "বাঃ এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে? ইন্দ্রনীল আর শ্রীমিতাকে?"

নন্দিনী বাঁ হাতটা অন্যমনস্কভাবে গালের ওপর বোলাতে লাগল। কে এই লোকটা? কতটুকু জানে নন্দিনী সম্বন্ধে? যে ষোলো বছর আগেকার ঘটনাকে ফিরিয়ে আনছে এত বছর পর!

বহুদিন আগের কথা। তখনও নন্দিনীরা কলেজে পড়ে। সেদিন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তখন ইন্দ্রনীলের কাকুলিয়ার ফ্ল্যাটে। নন্দিনীর বিবস্ত্র দেহটা তার প্রতিটা স্পর্শ দিয়ে উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে ইন্দ্রনীলের রোমশ দেহের প্রতিটা কণায়। আলো আঁধারিতে না বোঝা গেলেও, নন্দিনী বেশ অনুভব করছিল, ঢোঁড়া সাপটা ক্রমশ কেউটের আকার ধারণ করছে। খালি ছোবলটার অপেক্ষায় থর থর করে কাঁপছে নন্দিনীর দেহটা... আর কয়েক মুহূর্ত... এই বুঝি ইন্দ্রনীল একশো আশি ডিগ্রি ডিগবাজি খাবে...

এমন সময়, ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাইরের টিপটিপ বৃষ্টিকে দমকা হাওয়ায় রূপান্তরিত করে শ্রীমিতা ঘরে ঢুকে নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল "হাউ ডেয়ার ইউ স্লিপ উইথ মাই লাভার?"

নন্দিনী জানত শ্রীমিতা ইন্দ্রনীলের বাড়িতে পিজি থাকে। অন্তত ইন্দ্রনীল সেকথাই বলেছিল। থাকতেই পারে। 'লাভার' শব্দটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল।

'লাভ' এর সংজ্ঞাটা ইন্দ্রনীলের কাছে কখনও জানতে চায়নি নন্দিনী। সেই মুহূর্তে শ্রীমিতাকে তার মানে বোঝানো বাতুলতা মাত্র। নন্দিনী নিঃশব্দে নিজের বিবস্ত্র দেহটাকে

ইন্দ্রনীলের দেহ থেকে তুলে নিজের প্যন্টি, নীল জিনস আর কালো জ্যাকেটটা গলিয়ে কাকুলিয়ার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

এক অন্য জীবন! ফেলে আসা জীবনকে পেছনে রেখে আবার নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিল তার মুছে দেওয়া ক্যানভাসে নতুন রং ছড়িয়ে। ইন্দ্রনীলকে পেছনে ফেলে, অর্ণবের হাত ধরে নতুন জীবন শুরু করে নতুন তুলিতে নতুন চিত্রপট আঁকতে।

সে তো বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু এই অজ্ঞাত ব্যক্তি আবার সে কথা মনে করিয়ে দিল।

“কে আপনি? আমি তো ওই নামের কাউকে চিনি না!”

“সত্যি?” ওপাশ থেকে একটা তির্যক হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

যেন বিদ্রুপ করছে নন্দিনীকে। না কি, অন্ধকারের চাদরে মোড়া ওর সত্ত্বাটাকে। না, রি-সাইকল বিন থেকে বার করে আনছে বর্জিত নিজের আমিটাকে? যে আমিটাকে দেখেও দেখতে চায়নি এতদিন।

“কেন বারবার ফোন করে আমায় বিরক্ত করছেন? কে আপনি?”

“সেটা তো আপনারই বলবার কথা”

“আমি রাখছি। আমায় দয়া করে আর ফোন করবেন না”

নন্দিনী আর কথা না বাড়িয়ে কেটে দিল। মনে একটা ভয় দানা পাকতে শুরু করেছে এই ঘোস্ট কলারকে নিয়ে। অনীশকে নিয়ে একা থাকে। তাও আবার পাড়া বর্জিত সল্ট লেকের মত জায়গায়। এতদিন পর্যন্ত শান্তিতেই ছিল। একা একাই থাকতে ভালবাসে। গান শুনে আর কম্পিউটারে ফেসবুক করে সময় কেটে যায়। কখনও রং আর তুলি নিয়ে এলোপাথাড়ি খেলা।

সেই সময়ের ছন্দের মধ্যে এ কোন দ্বন্দ্বে ফেলে দিল তাকে। দুপুরের খাওয়ার আয়োজন করতে করতে স্মৃতির ব্যাক-আপ ড্রাইভ-এ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল সেই ঘোস্ট কলারের অস্তিত্ব।

সেদিন রাতে ইন্দ্রনীলের ফ্ল্যাটে তো আর কেউ ছিল না। থাকারও কথা নয়। কলকাতায় থাকার জন্য বাবার কাছ থেকে পাওয়া ফ্ল্যাটটা। পরে শুনেছিল ইন্দ্রনীল শ্রীমিতাকে বিয়ে করলেও শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে টেকেনি। ইন্দ্রনীলের কথা আজ আর মনে পড়ে না। তাকে

অতীতের রি-সাইকল বিনে ফেলে ক্যানভাসের ছবিটা মুছে দিয়েছিল। শুধু পার্মানেন্টলি ডিলিট করেনি। সেই আন-ডিলিটেড ছবিটা আবার যেন নতুন আঙ্গিকে ভেসে উঠছে।

ইন্দ্রনীলের ছবিটা বিনে ফেলে দিলেও, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে সম্পর্কের মধুর অনুভূতিগুলো কী করে এত তাড়াতাড়ি মুছে দেবে? প্রথম জীবনের দৈহিক উন্মাদনা। রিপ্রেসড আধুনিক বাঙালি নারীর শরীরিক বন্দনা। নিজের অচেনা যৌবনের নতুন চেতনা। ক্ষুধার্ত শরীরটা প্রতিটা কোষের মধ্যে নারীত্বের অঙ্গিকার খুঁজছে। সৌন্দর্যের উপাসনায়, মনের বাসনার পূর্ণতায়। ঈশ্বরের দেওয়া অনুভূতিটার পার্থিব বহিঃপ্রকাশ।

শ্রীমিতাকে কী ইন্দ্রনীল প্রশ্রয় দিয়েছিল? বুঝতে পারেনি নন্দিনী। হয়ত দিয়েছিল বলেই শ্রীমিতা সদর্পে কথাগুলো বলতে পেরেছিল নন্দিনীকে। এখন মনে হয় নিশ্চয়ই দিয়েছিল। শ্রীমিতার সঙ্গে সম্পর্কটা কতদূর কিংবা কতখানি নন্দিনী বুঝে উঠতে পারেনি কোনোদিন। আজকেও নয়। সেই মুহূর্তে আগামীর ছবিটা ইন্দ্রনীল আঁকতে চেয়েছিল নন্দিনীকে নিয়ে। অন্তত নন্দিনীর তাই ধারণা হয়েছিল।

"আমার লুকানোর কিছু নেই। আমি ওকে আমার কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে থাকতে দিয়েছি। তার মানে ওর সঙ্গে যে আমার কোনো রিলেশন থাকবেই, এমন নয়। এক ছাদের তলায় থাকা মানেই প্রেম নয়। ভবিষ্যৎটা কী তোমার সঙ্গে আঁকা যায় না?"

"কেন যাবে না?" ইন্দ্রনীলের দিকে ফিরে নন্দিনী বলেছিল।

"একটা সেয়ারড অ্যাকমডেশনে কোনো রিলেশনশিপ হয় না। আমাকেও তো বাঁচতে হবে" একটু থেমে বলেছিল "আমার মতো করে"

বুঝতে একটুও ভুল হয়নি যে শ্রীমিতাকেই ইঙ্গিত করেছিল ইন্দ্রনীল... কেন ভাঙল? কেন শ্রীমিতা আজও কাকুলিয়ার ফ্ল্যাটে থাকে, এসব প্রশ্নের মধ্যে ঢুকতে চায়নি নন্দিনী। ব্যাপারটা যখন তাকে কেন্দ্র করে নয়, তখন এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অবান্তর।

"নিশ্চয়... তাহলে আমাকে নিয়ে বাঁচবে?"

"আপাতত, সেটাই তো চোখের সামনে ভাসছে"

সেই স্বপ্নে দেখা ছবিটা ক্যানভাসে রূপ দেওয়ার আগেই, সেই টিপ টিপ ভেজা রাতে তা মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গিয়েছিল সেই রাতে, শ্রীমিতার চিৎকারে। নন্দিনী বুঝেছিল, ওদের সম্পর্কটা যাই থাক না কেন, শুধু পিজি অ্যাকমডেশনে সীমাবদ্ধ নয়। দৈহিক খিদে

ছাড়া নন্দিনী সেখানে বাড়তি। আর যাই হোক না কেন, ইন্দ্রনীলকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা ছেলেমানুষি। যদি অন্য একটা সম্পর্ক হয়েও থাকে, একটা সম্পর্ক ভেঙে আরেকটা সম্পর্ক তৈরি হলেও স্থায়ী হয় না। সেটাও ভেঙে যাবে। কিংবা শ্রীমিতা সেটা ভেঙে দেবে। এক অস্থির জীবনের চোরাবালিতে ঘর ভেঙে শান্তির নীড় রচনা করার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র।

তারপর বহুবার নানা রঙে ছবি আঁকার নিরলস প্রয়াস। কত নতুন মানুষ। কত নতুন অভিজ্ঞতা। চলার পথে যে এত রং ছড়িয়ে আছে, জানা ছিল না। তবুও রংগুলো কুড়োতে গিয়েই একটা ছবি আঁকার স্বপ্ন দেখা। ছবি আঁকতে যে বড় ভালবাসে নন্দিনী। কিংবা সব নারীই একটা নিটোল ছবির স্বপ্ন আগলে সারা জীবন বাঁচতে চায়।

নন্দিনীও চেয়েছিল।

আজ এই ফোন পাওয়ার পর বুঝতে পারছে, হয়ত কিছুই মোছেনি। শুধু ব্যাক-আপ ডিস্কে পড়েছিল। এখন আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। ফণা তোলার চেষ্টা করছে।

দুপুরের খাওয়ার পর ইউসুয়ালি ঘুমোয় না নন্দিনী। সিরিয়াল দেখে, বা ফেসবুক করে। যতক্ষণ পর্যন্ত অনীশ স্কুল থেকে না ফেরে। আজ আবার ফেসবুক খুলতেই ইন বক্সে একটা মেসেজ দেখে চমকে উঠল।

"অত সহজেই কি সব কিছু ভোলা যায়? ভুলতে পারবে শ্রীমিতাকে? ভুলতে পারবে ইন্দ্রনীলকে?"

কে মেসেজ পাঠিয়েছে? নামটা দেখল 'মনের আয়নায়'। অবশ্যই ছদ্মনাম। প্রোফাইল খুলে দেখল অনেক ফ্রেন্ড লিস্টের মধ্যে মনের আয়নায়ও আছে। একাই ফ্রেন্ড, কেবল নন্দিনীর সঙ্গে। হয়ত এই ফেসবুক থেকেই নন্দিনীর হদিস বার করেছে। প্রোফাইলে শুধুই কতগুলো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের ছবি। পেশায় লেখা আছে আর্টিস্ট। লোকটির নিজের কোনো ছবি বা তার চেনা পরিজনদের কোনো ছবি নেই!

বেশ কিছুক্ষণ প্রোফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করার পরও আর নতুন কোন তথ্য খুঁজে পেল না। কোন অজান্তে ফ্রেন্ড লিস্টে ঢুকে পড়েছে, এই নাম-না-জানা আর্টিস্ট। কী ছবি আঁকতে চাইছে জানে না। নন্দিনীকে কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তাও জানে না।

একটা পরিচয়হীন অস্তিত্ব তার জীবনে উঁকি মারতে চাইছে, ব্যাক-আপকে রিকভার করে – তার বর্তমানের স্ট্যাবিলিটিকে ডি-স্ট্যাবিলাইজ করতে।

নন্দিনী জীবনের ছন্দ থেকে বিচ্যুত হতে চায় না। এই জীবন, তার চলমান ছন্দ, গতি, মাধুর্যটাই বাঁচার একমাত্র হাতিয়ার। সেটা ক্র্যশ করুক সে চায় না। সুখের পৃথিবীতে এটাই যে তার একমাত্র সম্বল। সম্বলটাকে হারাতে চায় না নন্দিনী। অনেক অন্ধকার পেরিয়ে অন্ধকারকে আর দেখতে চায় না সে। বেঁচে থাকতে চায় তার একান্ত নিজস্ব স্বপ্নের দিবালোকে।

কয়েক মুহূর্ত।

ব্লক করে দিল ‘মনের আয়নাকে’। হারিয়ে গেল শিল্পী। মুছে গেল আধুরা ক্যানভাসটা কালো রং-এর আঁচড়ের আগেই মাউসের একটা ক্লিকে।

সারাটা দিন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কাটল নন্দিনীর। সে কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারছিল না। সারাক্ষণ মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসছিলো সেই নামহীন ফোনটার কথা। কে হতে পারে? কে? কী চাইছে তার কাছে? ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে? কিন্তু কেন? কী ভাবে? না কি আরো সিনিস্টার কিছু? হাজার প্রশ্ন সারাদিন ওর মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না, কী করবে? কার কাছে যাবে? একেক বার, একেক জনের নাম মনে ভেসে এল। কিন্তু কাউকেই সুটেবল মনে হল না। পুলিশের কাছে যাবে? কিন্তু পুলিশকে কী বলবে? সে ঠিক জানেও না, এটা সাইবার ক্রাইমের মধ্যে পড়ে কি না।

সারাটা দিন কেটে গেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। সন্ধে গড়িয়ে রাত। একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে সময়টা কাটছিল নন্দিনীর। ডিনারে খাবারগুলো একটু নাড়াচাড়া করেই সে উঠে পড়ল। বিছানায় শোওয়ার পরেও তার সেই অস্বস্তি কাটল না। মনে হচ্ছিল, এখনই বুঝি আবার ফোনটা আসবে। উলটোপালটা চিন্তার ঘেরাটোপ টপকে কখন যে ঘুমের স্রোত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সে ঠিক নিজেও জানে না।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল ফোনের তীক্ষ্ণ শব্দে। একটানা বেজে চলেছে ফোনটা। নন্দিনী ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। অজান্তেই ঘড়ির দিকে চোখ চলে গেল ... পাঁচটা সতেরো! ভোর হয়ে গেছে!

ফোনটা আচমকা থেমে গেল। নন্দিনীর বুকটা ধক ধক করে চলছে। ফোনটা থেমে যাওয়ায় তার মনে হল সে নিজের হার্ট বিট শুনতে পাচ্ছে দামামার মতো জোরে জোরে।

ঠিক সেই সময় হঠাৎ আবার ফোনটা বেজে উঠল ...

দ্বিতীয় নন্দিনী

"রুম নম্বর ৪৪৪"

চারতলার চুয়াল্লিশ নম্বর ঘরের দরজাটা বেয়ারা খুলে দিতেই নন্দিনীর মনে হল ডেমিয়েনের রেসারেকশন নয় তো? হলে ওমেন-এর বদলে আরও একটা সিরিস হলিউড ব্লকবাস্টার হয়ে যেত।

মনে মনে হাসল নন্দিনী। অত কী ভাবার সময় আছে?

বেয়ারাকে টিপস মিটিয়ে দিয়ে জিনস-টপস খুলে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। কিছুটা মুহূর্ত নিজের জন্য। তারপর মিঃ বিশ্বনাথের জন্য আসর সাজিয়ে ফেলতে হবে। সাজাতে হবে নতুন উন্মাদনার নতুন ক্যানভাস। মহামান্য অতিথি বলে কথা। 'মহামান্য'কথাটা মনে হতেই হাসি পেল নন্দিনীর। মহামান্য-র সংজ্ঞাটা কেমন বদলে গেছে ছোটবেলা থেকে। যে পয়সা ছড়ায়, সেই মহামান্য। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে, নন্দিনীর কাছে যারা আসে, তারা সবাই মহামান্য। আজও এই দুনিয়ায় টাকার বিনিময় মান কেনা যায়।

এম জি রোডের দ্য ওবেরয়-তে তো যে সে লোক আসতে পারে না! একমাত্র মিঃ বিশ্বনাথের মতো সত্যিকারের 'মহামান্য' লোক ছাড়া। বিজনেস ট্রিপে ব্যাঙ্গালুরুতে এলেই এই ৪৪৪ নম্বর কামরা ওর জন্য বাঁধা। বাঁধা কাজের শেষে নন্দিনীর নরম হাতের প্রলেপ। নন্দিনী ইজ ইম্যাকুলেট, ইরিপ্লেসেবল ইন দ্য ইভিনিংস ইন ব্যাঙ্গালুরু। নট ইভেন দ্য ইভনিং বিজনেস ডিনারস আর অ্যাজ চার্মিং অ্যাজ ডিয়ার সুইট নন্দিনী।

রেন্ডি!

কথাটা বাজারে শোভা পায়। পাঁচতারা হোটেলের সুইটে নয়। এক ঘণ্টায় দু লাখ টাকা। ফিফটি পার্সেন্ট এজেন্সিকে দিয়ে নিট এক লাখ টাকা হাতে। আর মিঃ বিশ্বনাথের মতো রেগুলার কাস্টমারের সঙ্গে সারারাত কাটাতে পারলে ডিসকাউন্ট নিয়ে আট লাখ টাকা! কম কী? তারপরেও কেউ সাহস করবে 'রেন্ডি'বলতে? কে বলে ইন্ডিয়া গরিব দেশ? নন্দিনীর তো মনেই হয় না।

কে কী নাম দিল, কী আসে যায়? সম্রাজ্ঞীর কী কোনও নাম থাকে? সে তো শুধুই সম্রাজ্ঞী। ভারতের উঁচু মহলের একচ্ছত্র রানি – নন্দিনী।

একটা ফিনফিনে আকাশি রঙের সিল্কের হাউসকোট পরে, ফ্রিজ থেকে বার করা বরফটাকে গ্লাসে ফেলে, ৪৪৪ নম্বর সুইটে মিঃ বিশ্বনাথের আসার আগে স্টক করা বার থেকে গ্লেনফেডিচ ঢেলে বারান্দায় গিয়ে বসল। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল আকাশের দিকে।

মেঘটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। মেঘের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদটা আত্মপ্রকাশ করছে নিজ দ্যুতিতে। যেন শূন্যতা থেকে পূর্ণতা জানান দিচ্ছে। অন্ধকার থেকে আলোর নিশানা। হোক না সে ধার করা আলো। তবুও তো সূর্যের কিরণের প্রতিবিম্ব। সূর্যকে তাদের দুনিয়ায় ঝলসাতে দিয়ে, তার থেকে ধার করা কিরণ ছড়াবার মধ্যেও তো একটা স্নিগ্ধতা আছে।

মায়ের মুখে শুনছিল, কোনও এক পূর্ণিমা তিথিতে তার জন্ম।

জ্যোতিষ বলছিল "শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ভোর চারটে চুয়াল্লিশ মিনিটে জন্ম। এ মেয়ের জীবন আলোয় আলোয় ভরে উঠবে"

বাবা বিদ্রুপ করে বলেছিল "এমন ধিঙ্গি মেয়ে, ছোট ছোট জামা পড়ে সারা পাড়া নাচিয়ে বেড়াচ্ছিস। পড়াশোনার বালাই নেই। তোকে দিয়ে কিসসু হবে না"

উঠতি বয়সের ঠিকরে পড়া দেহসৌষ্ঠব। মডার্ন ওয়ান-পিসের দৌলতে চাঁদের আলোর মতো ঠিকরে পড়ছে। সেই ছড়িয়ে পড়া পি এল লাইটের দ্যুতিতে যে তার চারপাশের অন্ধকারের মধ্যে পোকাগুলো কিলবিল করবে না, সে কথা ভাবাও ভুল। সে কিছুই করেনি। শুধু চাঁদের আলোর মতো দ্যুতি ছড়িয়েছে। সেই দ্যুতির রোশনাইয়ে যে কত হৃদয় মুখ থুবড়ে পড়ে ছটফট করেছে আলো আঁধারির বেলাভূমিতে তার হিসেব করেনি নন্দিনী। পড়ে থাকা আধমরাদের নিয়ে ভাবতে গেলে এগোনো যায় না।

ভাবেওনি!

বাবার তির্যক ব্যঙ্গ "যে ভাবে চলছিস কেউ তোকে বিয়েও করবে না। নেহাৎ মেয়ে হয়ে জন্মেছিস তাই তো ফেলে দিতে পারব না"

“তোমাকে আমার বিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমার কপালে যা আছে তাই হবে”ঝাঁঝিয়ে উত্তর দিয়েছিল নন্দিনী।

সেদিন বোঝেনি কথাটা তার জীবনে কতখানি সত্যি হয়ে দাঁড়াবে। সেকথা, প্রবহমান জীবন তাকে পরে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। জ্যোতিষ কী অর্থে কপালটাকে দেখেছিল প্রশ্ন করার সৌভাগ্য হয়নি নন্দিনীর।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সিগারেটটা টেবিলের অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে মনে মনে হাসল। কোনটা যে আলো, আর কোনটা অন্ধকার, কে জানে? লেখাপড়া শিখে কয়েকটা ডিগ্রি পকেটে পুরে নন্দিনীর কি ক্ষমতা ছিল ঘণ্টায় দু-লাখ টাকা কামাবার? বাবার দেওয়া আদর্শের বুলিগুলো যতই নীতিবাগীশ হোক না কেন, কোথায় সে নীতির আলো জ্বলে, সেটা হয়ত সময়ই বলে দেবে।

তখনও স্কুলে পড়ে। যেদিন রাতে বাড়ি ফিরে বাবার তির্যক ব্যঙ্গ শুনতে হয়েছিল “এই ধিঙ্গি মেয়ে রাতে বেশ্যাবৃত্তি সেরে বাড়ি ফিরলেন!” সেদিন আর নিতে পারেনি। এনাফ ইজ এনাফ। ইট হ্যস টু এন্ড। এন্ড নাউ। দুজনের পথ ভিন্ন।

ঈশ্বরই দুজনের পথ আলাদা করে দিয়েছিল। একা একা নিজেই পথের ধ্রুবতারা খুঁজে নিতে।

ঘর থেকে বাইরে। নিশ্চয়তা থেকে অনিশ্চয়তায়। স্থিত চলমানতা থেকে অনির্দিষ্ট পথে হাঁটা। ‘ডিসক্রিশন ইজ দ্য বেটার পার্ট অফ ভ্যালার’। নিজেকে সেই ডিসক্রিটলি ডিসক্রিট করে তুলতে গিয়ে ছুটে বেড়িয়েছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। নদীর মোহনা এক সময় মিশে গেছে বিশাল সমুদ্রের জলরাশিতে।

“আই উইল বি এ বিট লেট টুডে”মিঃ বিশ্বনাথের ফোন “হ্যভ ইউ রিচড দেয়ার অলরেডি?”

“ইয়েস। কোয়াইট এ হোয়াইল ব্যাক। টেক ইওর টাইম হোয়াইল আই এনজয় দ্য ফুল মুন”

“বাই অল মিনস... গো অ্যাহেড। উইথ এ ফুল স্টম্যাক। আই কান্ট সি ইউ উইথ এ সালেন ফেস হাঙ্গারি” হাসতে হাসতে ফোনটা কেটে দিল মিঃ বিশ্বনাথ।

পেট আর তার নীচের তাড়নাতেই তো গোটা পৃথিবীটা চলছে। পার্থিব বিশ্বের মহাচক্র তো এই গোলকেই ঘুরছে। আহাঃ! বাবা যদি একথা বুঝত। নীতিকথাগুলো ঝিপ ফাইলে কমপ্রেস করে ব্যাকআপ ড্রাইভে ফেলে রাখত। নন্দিনী আজও বুঝতে পারে না এইসব সত্যমিথ্যার নীতি কোথায় লেখা হয়েছিল। কারাই বা লিখেছিল? কেনই বা? সামাজিক একটা কোহেশন আনতে! অনেক পলিটিসাইজড ধর্ম, নীতি, আচার, কৃষ্টির মতোই এটাও কী একটা সেন্স অফ কন্ট্রোলের আত্মপ্রকাশ? মানে এগো অফ ডমিন্যান্স?

তাহলে তো নন্দিনীর এগোটা সব থেকে বেশি থাকা উচিত। এগোটাকে জাহির না করেও আন্ডার-কারেন্টের মতো একটা ডমিন্যান্স থেকে যায়! যা প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি, সৌহার্দ্য সে ছড়িয়ে দিতে পারে মানুষের মধ্যে। উইদাউট এনি কনফ্লিক্ট।

৪৪৪ কিংবা ৬৬৬ কিংবা ডবলিউ ডবলিউ ডবলিউ!

সবই তো ডমিন্যান্স–এর শেষ কথা। কী ভাবে ডমিন্যান্সটা জীবনে খাটছে, সেটাই ভাববার। ৪৪৪-এ ফ্রি ডবলিউ ডবলিউ ডবলিউ আছে। তাই নিয়ে খেলতে উঠে গেল নন্দিনী।

সত্যি! তার জীবনটাও তো একটা গল্প। কেউ যদি তা নিয়ে লিখত। বেশ্যাকে নিয়ে মাঝরাতে ফুর্তি করা যায়। তাকে নিয়ে কী গল্প লেখা যায়! তবুও একটা চেষ্টা করে দেখা মাত্র।

"আপনি আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখবেন?"

লিখবে? কেউ? সব কথা কী বলা যায়? না, বললেই লেখা যায়? গল্প তো একটা ছকের মধ্যে পড়তে হবে। তা না হলে কী গল্প হয়?

সুইটের বেলটা বাজতেই, প্রায় ট্রান্সপ্যারেন্ট নীল হাউস কোটটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দরজার এপার থেকে বলল "হু ইজ ইট?"

"হু এলস? ইটস মি" বিশ্বনাথের জন্য দরজাটা খুলে দিতেই বিশ্বনাথ ঘরে ঢুকে নন্দিনীকে চুমু খেয়ে বলল "সরি ডিয়ার... আই অ্যাম লেট" ব্রিফকেসটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল "আই অ্যাম ডাইং। নিড টু পি। হ্যভ ইউ হ্যড সামথিং টু ইট?"

"নট কোয়াইট। ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইউ। হাউ ক্যান আই উইদাউট ইউ?"

বাঙালি মেয়ের এই ঘরণীপানা বিশ্বনাথের ভাল লাগে। তাই তো নন্দিনী অনন্যা। তার প্রফেশনাল কাজের বাইরেও একটা মানুষ লুকিয়ে আছে। সেটা বিশ্বনাথ অনুভব করতে পারে।

ফ্লাশটা টেনে বাথরুম থেকেই বলল "দেন অর্ডার ফর সাম। মাস্ট বি কোয়াইট ফিলিং, হোয়াইল আই হ্যভ এ কুইক বাথ"

নন্দিনী রুম সার্ভিসকে ফোন করে ইটালিয়ান ভূরিভোজের অর্ডার দিল। বিবস্ত্র অবস্থায় সাওয়ার থেকে বেরিয়ে, বিশ্বনাথ নন্দিনীকে বলল "পাস মি দ্য বাথরোব ফ্রম দ্য ক্লজেট"

নন্দিনীর দেওয়া রোবটা জড়িয়ে সোফায় বসে বলল "টুডে হ্যস বিন এ হেক্টিক ডে"

হয়ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, নন্দিনী সিঙ্গল মল্টের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল "রিল্যক্স"

উলটো দিকের সোফায় বসে নিজের হাফ-ফিনিসড গ্লাসে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল "নো নিড টু মেনশন। আই আন্ডারস্ট্যন্ড"

বিশ্বনাথ নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল "ইউ ওয়ার ওয়াচিং দ্য মুন ফ্রম দ্য ব্যালকনি?"

"ইয়েস... স্য দ্য ক্লাউডস পাস টু লাইট ইট ইন অল ব্রিলিয়ান্স। হ্যভ ইউ হ্যড টাইম টু সি দ্য মুন?"

"নট ইন রিসেন্ট টাইমস। হাউ অ্যাবাউট হ্যভিং এ মুনলিট ডিনার ইন দ্য ব্যলকনি?"

"হোয়াই নট?"

সদ্য আনা ইটালিয়ান ডিশ বেয়ারাকে ব্যলকনিতে রাখতে বলে গ্লাসটা ব্যলকনির টেবিলে রেখে, ডিনারটা সাজাতে লাগল। বিশ্বনাথও এসে বসল পাশের সোফায়। দুজনেরই খিদে পেয়েছে। কথা না বলে গোগ্রাসে খেতে থাকল।

শেষে রুম সার্ভিসকে তলব "সব লে জানা"

"অউর কুছ?"

বিশ্বনাথ একটা পাঁচশো টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বলল "কুছ নেহি। তুম যা সকতে হো"

বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই বিশ্বনাথ বিছানাতে গা এলিয়ে দিল। আর বসে থাকতে পারছে না। সারাদিন ধরে মিটিং-এ বসে কোমরটা ব্যথা করছে। আড়চোখে দেখল নন্দিনীর

ট্রান্সপ্যারেন্ট নীল হাউস কোটে মোড়া তন্বী দেহটা নিতম্ব দুলিয়ে, পেছনে দরজাটা টেনে, বাথরুমে মিলিয়ে গেল। কতক্ষণ বাথরুমে নন্দিনী ছিল সে নিজেও জানে না। বেশিক্ষণ নয়। বডি ফ্রেশনার দিয়ে নিজেকে সুগন্ধি করে ফিরে এল বিশ্বনাথের আজকের দেখা ক্যানভাসে ছবিটাকে জীবন্ত করে তুলতে।

দেখল বিশ্বনাথ খাটে ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়ত টায়ার্ড। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিক। রাত তো ফুরিয়ে যায়নি। বারান্দায় গিয়ে বসল পূর্ণিমার চাঁদকে আবার দেখতে। চাঁদের অনেকখানি মেঘে ঢেকে গেছে। কয়েক ঘণ্টা আগের মতো উজ্জ্বল নয়। যেন আলো আঁধারির লুকোচুরি খেলছে। মেঘটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। বৃষ্টি আসতে পারে। কত তাড়াতাড়ি না আকাশের রং পালটায়! জ্যোতিষের কথা মনে পড়ল... "শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ভোর চারটে চুয়াল্লিশ মিনিটে জন্ম। এ মেয়ের জীবন আলোয় আলোয় ভরে উঠবে"

কবে, কে জানে?

বিশ্বনাথ কী এখনও ঘুমিয়ে আছে? ঘরে ঢুকে দেখল, বিশ্বনাথ আগের মতোই শুয়ে আছে। হাত দিয়ে গা টা নাড়াতেই ছ্যক করে উঠল বুকটা। আলতো করে ধাক্কা মারতে বিশ্বনাথের হাতটা এলিয়ে পড়ল। ভয় কেঁপে উঠল বুকটা। এবার বেশ জোরে ঝাঁকানি দিল। দেহটা অসহায়ের মতো নিথর। এবার রীতিমতো ভয় করছে নন্দিনীর। নাকের কাছে হাতটা নিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল। কোনো শ্বাসের চিহ্ন নেই! পালসও নেই!

ছুটে গিয়ে রিসেপশনে ফোন করল "কাম ইমিডিয়েটলি। ইমার্জেন্সি। হারি..."

লোকজন ছুটে এল। ইন-হাউস ডাক্তার ছুটে এল। অ্যাম্বুলেন্স এল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল কার্ডিয়াক ম্যাসেজ দিতে দিতে। প্রাণহীন দেহটা ততক্ষণে বিশ্বনাথ ধামে পৌঁছে গেছে।

নন্দিনী একা ঘরে ফিরে এল। ঠিক কী করবে বুঝতে পারছে না। পরিচয়টা গোপন করবে? না, মানবিকতার খাতিরে সামনে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করবে? ৪৪৪ নম্বর কামরায় ব্যাগটা প্যাক করতে করতে ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। মৃতদের নিয়ে ভাবতে গেলে এগোনো যায় না। কিন্তু তাকে তো চলতে হবে।

অনেক... অনেক... অনেক দূর!

বিশ্বনাথ চলে গেলেও তো পড়ে আছে তার কয়েকশো পার্মানেন্ট ক্লায়েন্ট।

কৃষ্ণপক্ষ হলেও শুক্লপক্ষের রাগ গাইতে হবে। সে যে রোহিণী নক্ষত্রের জাতক। ঘন মেঘের মধ্যেও চাঁদের হাসি ফোটাতে হবে।

৬৬৬ অথবা ৪৪৪ - সময় কি ঘর যাই হোক না কেন!

সে তো যে সে লোক নয়! রাজার দুলালী নন্দিনী! কামধেনু আর বশিষ্ঠের কন্যা। ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা। আনন্দের প্রতিমূর্তি। তা ছড়ানোর মধ্যেই তার দ্যুতি। তার প্রস্তুতি আবার নতুন করে শুরু করে দিল রাজনন্দিনী নন্দিনী।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ করল। ছোট্ট, কিন্তু একটা কম্বিনেশন লক দেওয়া। উপরে লেদার ফিনিশ থাকলেও ভিতরে সূক্ষ্ম স্টিলের জাল দেওয়া ব্যাগটা সহজে কেউ কাটতে পারবে না। তারপর কম্বিনেশন ঘুরিয়ে ব্যাগটা খুলে একটা ছোট্ট মোটোরোলা সেল ফোন বার করল। এটা বিশেষ ফোন। মেরেকেটে দশটা নাম্বার আছে কি না সন্দেহ। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া এ নাম্বারগুলোতে কল করা যায় না। আগে তার কখনো দরকার হয়নি। কিন্তু আজ সে নিরুপায়। আজ বাঁচতে হলে কল করতেই হবে এই নাম্বারগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা, মুখহীন কায়াহীন মুস্কিল আসানদের। কোনটা কার নাম্বার, তার কোনো ধারণাই নেই। দরকারও নেই।

সে র‍্যানডামলি একটা নাম্বারে ডায়াল করল। ওপাশে রিং হচ্ছে – একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় হিন্দি গানের মিউজিক বাজছে। তারপর একজন সুকণ্ঠী মহিলার গলায় ভেসে এল “রিল্যাক্স। জাস্ট টেল মি ইওর প্রবলেম ডিয়ার” ...

তৃতীয় নি. নী

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কোনও জামাকাপড় পরার আগেই মোবাইল বেজে উঠল। নন্দিনী দৌড়ে গিয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিল।

"আজ আসব?" ফোনের কলার আইডি দেখে আগেই বুঝেছিল ফেরদৌস। গলার স্বরে স্পষ্ট হয়ে গেল।

তোয়ালে দিয়ে চুলটা মুছতে মুছতে বলল "নাঃ"

"কেন?"

"জাস্ট ওয়াণ্ট টু বি এলোন। আজ থাক। অন্য একদিন"

এসির ঠান্ডা হাওয়ায় গাটাকে শুকিয়ে নিতে ভারি আরাম লাগছে। সারাদিনের ঘেমো গায়ের ক্লান্তিটা ঝেড়ে ফেলতে পারছে। বেশ কিছুক্ষণ খালি গায়েই খাটের ওপর বসে রইল। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল করেনি। শোকানো গায়ে শিরশির করা হাওয়ায় মৃদুমন্দ কম্পন। আর বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে। ড্রেসিং টেবিলে পড়ে থাকা হাউসকোটটা জড়িয়ে ফ্রিজ থেকে একটা গ্লাসে বরফ ঢালল। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে কম্পিউটারটা সুইচ-অন করল।

অন্যান্যদের মতো সারাদিনের কাজের শেষে টিভির রিমোট বটনটা কোনদিনও টেপে না নন্দিনী। কারণ সারাদিনই তো ওই পৃথিবীতে পড়ে আছে। কাজের শেষে আবার সেই পৃথিবীতে ফেরত যেতে মন চায় না।

পর্দাটা টেনে খুলে দিল। তার মাল্টিস্টরিড অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে ধানমুন্ডি লেকের অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। সারাদিনের ক্লান্তির পর হুইস্কিতে মৃদুমন্দ চুমুক দিতে দিতে ধানমুন্ডি লেকের ওপাশের বাড়িগুলোর রোশনাই দেখে, সময়টা বেশ কেটে যায়। পুরনো বাড়ির টিমটিম করা আলো আর নতুন মাল্টিস্টরিড-এর ঠিকরানো রোশনাই-এর রিফ্লেকশন যেন ঢেউ তুলছে ঢাকার এই অভিজাত পল্লিতে। মাঝে মাঝে অন্ধকারের মধ্যে হাওয়ায় নড়া গাছের ডালগুলো যেন অতীত আর বর্তমানের একটা যুগলবন্দি খেলে

যাচ্ছে। যেন রাগ ললিত গৌরী মিশে যাচ্ছে রাগ আনন্দী কল্যাণের সঙ্গে। শাওনি কল্যাণের অসংলগ্ন একটা যুগলবন্দিতে।

মনে পড়ে, এই তো সেদিন এই অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল। যখন এরশাদ সাহেব আচমকা চাকরির অফারটা পেড়েছিল। হাতে যেন একটা স্বর্গ পেয়েছিল। তার চ্যনেলের আর্ট ডিরেক্টরের চাকরি। বাংলাদেশে থাকার জায়গা চাই। এরশাদ সাহেব থাকার জায়েগা করে দিয়েছিল এখানে। ছন্নছাড়া জীবন থেকে একটা নিশ্চিন্ত বাসস্থান। সঙ্গে ভদ্রভাবে বাঁচার মোটা মাইনে।

মন্দ কী?

হুইস্কির নেশা একটু যেন লেগেছে। কিছুক্ষণ ধরেই ভাবছিল কম্পিউটার চালিয়ে গান শুনবে। কিন্তু কুঁড়েমির জন্য আর কম্পিউটার চালানো হয়ে ওঠেনি। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। ধ্যত... ঘরে নিভৃতে দুদণ্ড বসে হুইস্কিও খাওয়া যাবে না! জ্বালাতন। ফোনটা অফ করেই রাখত, যদি না চাকরির খাতিরে সর্বদাই ওটা অন করে রাখার একটা অনুচ্চারিত শর্ত অজান্তে ফল্গুধারার মতো নিভৃতে বিচরণ করত।

"বাড়ি ফিরেছ?"

"হ্যাঁ। এই কিছুক্ষণ আগে"

"নেক্সট মাসে আমাদের কামবোডিয়া ট্রিপের কথা মনে আছে?" রেজ্জাক ওপাশ থেকে বলল।

মনে মনে ভাবল, এরা আর সময় পায় না! নেক্সট মাসে একটা আর্ট-এর ওপর ডকুমেন্টারি করার জন্য কামবোডিয়ার পরিকল্পনা কী সারা দিনের কাজের শেষে এখনই বসে না করলেই নয়? তবু কাউকে চটানো যাবে না।

"হ্যাঁ" সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

"কিছু প্ল্যান করেছ?"

ধ্যস!

এক মাস আগে থেকে প্ল্যান করার কী আছে? নিকুচি করেছে কামবোডিয়া ট্রিপ-এর। এত ঘটা করে একটা ডকুমেন্টারি করতে হবে। কাজের কাজ কিসসু হবে না। বিদেশে যাওয়া যেন একটা নেশা। সেই নেশার মাদকতায় যেন সবাই বুঁদ হয়ে আছে।

কামবোডিয়া না হয়ে বলিভিয়া হলে কী আসে যায়? কে বোঝাবে? লোভের সো-কেসে পৃথিবীটাকে সাজিয়ে ফেলতে চাইছে বিদেশ থেকে ম্যল-ইস্বাইবড এই কালচার। 'ফরেনে' যাওয়ার যেন একটা উন্মাদনা। একটা কালচারের অঙ্গ।

কী আর করা যাবে?

"এখনও তো মাসখানেক বাকি। তাড়া কীসের?"

"একটা রেয়ার ডকুমেন্টারি বলে কথা। আগে থেকে প্ল্যান না করলে চলে?"

একটু বিরক্ত হয়েই বলল "সারাদিনের কাজের শেষে? এই ভর সন্ধেবেলা?"

"তাহলে সানডেতে চলে আসি। দুজনে বসে প্ল্যান করে নেওয়া যাবে"

"পরে কোনও একদিন প্ল্যান করে নেব। এখন ভালো লাগছে না"

রেজ্জাক বুঝল নন্দিনীর মুড এখন ভালো নেই। পরে এ নিয়ে কথা বলা যাবে।

"ঠিক আছে। রাখছি"

রেজ্জাক সাহেব এই ডকুমেন্টারির ডিরেক্টর। হয়ত সে সত্যি সত্যি এই ডকুমেন্টারিটা নিয়ে বড় বেশি চিন্তা করছে। তাই ফোন করেছে। এমন যদি কিছু হত, যাতে একজন মানুষ আরেকজনের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারে - জীবনটা তাহলে কত সহজ হয়ে যেত। অনেক সময় মনের কথাটা বলে দিতে হয়।

সেখানেই অসম্পূর্ণতা।

শুধু রেজ্জাক বলেই নয়। নারী হিসেবে নিজের অসম্পূর্ণতাতেও খামতি। রামধনুর সাতটা রং-এর মধ্যে কোনও রং-ই পূর্ণতার গান গাইতে পারছে না। ছবিটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে। বরং বর্তমানের ছবিটা অনেক স্পষ্ট। কিংবা নিজের ক্লান্তিটা।

দূরে রবীন্দ্র সরবরের ওপাশে আট নম্বর রাস্তার ব্রিজের অ্যাম্ফিথিয়েটারের ওখানে বহু লোকের সমাগম। নিশ্চয়ই কোনো শো ভেঙেছে। প্রায়শই ওখানে প্রোগ্রাম লেগে থাকে।

ফোনটা কেটে কম্পিউটারটা চালিয়ে দিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যাওয়া কতক্ষণ, কে জানে? ভুলেই গিয়েছিল স্ক্রিনটা আটকে আছে পাসওয়ার্ড-এর অপেক্ষায়। পাসওয়ার্ডটা টাইপ করে আবার হুইস্কিতে চুমুক দিল।

ধান্দার বাইরে একটা অস্তিত্ব খুঁজছে অনেকদিন ধরে। একটা নিটোল নির্ভেজাল অ-ব্যবসায়িক সম্পর্ক। এত বছর কাজের সূত্রে ব্যবসায়িক ধান্দাবাজি তো কম দেখল না।

এরশাদ সাহেব যতই ভালবাসুক না কেন, চ্যানেলের আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে তার টুঁটিটাও বাঁধা। পলিটিক্যল গিমিকস, আন্দোলন, রাইটস থেকে রেপ, খুন-খারাপির কাহিনি থেকে সেলেব্রিটি, চ্যানেলের মাথাদের পদলেহন – সবই যেন ক্যানভাসে এক একটা অসম্পূর্ণ ছবি। ঘেন্না ধরে গেছে।

ছোট বয়সে – কত আদর্শ!

যেন একাই একটা সম্পূর্ণতা খুঁজে নিতে পারবে। হয়ত কিছুটা পরিবর্তনও আনতে পারবে। কোথায় সম্পূর্ণতা? কোথায় পরিপূর্ণতা? সব স্বপ্নই যেন হাজার কোটির নিলামে চড়েছে। কাজের সুবাদে ধীরে ধীরে আদর্শের স্বরূপগুলোর সামনে আসা। কোটি কোটি দেশি-বিদেশি টাকা ঘুরছে লোকের আদর্শগুলোকে নিজের সুবিধায় খেলাতে। আদর্শটাকে রিসাইকল বিনে ফেলে মাস মাইনের চাকরিটাকেই পাথেয় করে জীবন চালিয়ে দেওয়া!

এই আর কী!

কিছুই পালটাবে না। মাঝখানে খবরের হাইপের অংশীদার হয়ে কিছু কামিয়ে নাও! ফুলে ফেঁপে রমরমিয়ে টাকা ছড়ানো চাঁইদের গুণগানে শামিল হও, অথবা মূর্খ পাবলিককে বোকা বানিয়ে ঝড় তোলার চিত্রপট সাজাও। পাবলিকের থেকে গালেবেল বস্তু আর কে আছে?

এক সঙ্গে ঢকঢক করে বেশ কিছুটা হুইস্কি গিলে নিল। দরজার এপার-ওপারের সীমারেখাটাকে আবার দেখবার সময় হয়েছে। ফেরদৌস তার থেকে বছর তিন-চারেকের ছোট হলে কী হবে, কাজে যোগ দেওয়ার বেশ কিছুদিন পরেই তার জীবনে এসে পড়েছে। এসে পড়েছে বললে ভুল হবে, দরজার চৌকাঠে রেখে নন্দিনীই তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

একা শূন্য ফ্ল্যাটে হাঁপিয়ে উঠছিল নন্দিনী। কাজের পৃথিবীটাকে ধানমুন্ডির ফ্ল্যাটের বাইরে রেখে, চার দেওয়ালের মধ্যে কেবলই ছটফট করছিল।

“আসতে পারি নন্দিনীদি?”

“আমার বাড়িতে?”

“হ্যাঁ। ডিনার খেতে”

একাকিত্বের নির্জন উন্মাদনায় দেহের অংশবিশেষ তখন জ্বলছে। মুক্তি চাই! পরিত্রাণ চাই! বাঁচবার রসদ চাই! সারাদিনের গতে বাঁধা চক্করে ক্লান্ত মনটা বাঁধ ভাঙা প্লাবনে

উপচে পড়তে চাইছে। ভাসিয়ে দিতে চাইছে একাকিত্বে ঘেরা দেহমনের নিস্পন্দ আবেগকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফেরদৌসের ফোনটা এল।

"রান্না যে কিছুই নেই!"

"নিজের জন্য তো কিছু করেছ? তাতেই হবে..."

খালি হাতে আসেনি ফেরদৌস। জিঞ্জিয়ান থেকে একগাদা খাবার প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে এনেছিল। খাওয়া থেকে আড্ডা। আফটার ডিনার কফি।

রাত তখন ক'টা কে জানে? ফেরদৌস বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজার মুখে ফেরদৌসকে বিদায় জানাতে গিয়ে নন্দিনীই বলেছিল "যেতেই হবে?"

ফেরদৌস ফিরে বলেছিল "ফ্ল্যাটটা তো তোমার থাকার দিদি..."

নন্দিনী প্রভকেটিভ একটা হাসি ছুড়ে বলেছিল "আজকের দিনের জন্য তোমায় বিনে পয়সায় ভাড়া দিতে পারি"

ফেরদৌসের রোমশ বুকের ওপরে মাথা রেখে বহুদিনের নিঃসঙ্গতার পুঞ্জিভূত জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পরেছিল নায়াগ্রার ঝরনা হয়ে। বাঁধ ভাঙা জৈবিক চাওয়ায়। নায়েগ্রার জলোচ্ছ্বাস মিশে গেল ইন্দ্রিয়ের প্রতিটা কোষে। তৃপ্তির নিখাদ ঝালায়। জীবনের অনেক না-পাওয়ার মধ্যে একটুকরো পাওয়া। সাময়িক পূর্ণ হল নন্দিনী। শুরু হয়েছিল তার ফেলে আসা নারীত্বের দেবী বরণ।

কিন্তু সেই চৌকাঠে আজও থেকে গেছে ফেরদৌস। এত বছরেও তাকে চৌকাঠ পেরতে দেয়নি নন্দিনী। এই একার পৃথিবীতে বাকি সবকিছুই গৌণ। একমাত্র সে ছাড়া। তার কাজের পৃথিবী থেকে ফেসবুকের 'ভারচুয়াল' পৃথিবী - তার কাছে একটা মুখোশ পরা কেউ। জানতেও চায়নি, ফেরদৌস এর বাইরের লোক কি না।

তার দুনিয়ায় সে একা।

হাতে হুইস্কি। সামনে কম্পিউটার।

ফোনটা আবার বেজে উঠল। আবার ফেরদৌস?! মনে মনে একটু বিরক্তই হল। তার একাকী জীবনে কেন ভাগ বসাতে চাইছে সে? দেহ আর মনের তফাতটাও বুঝতে শেখেনি!

একটু বিরক্ত হয়েই মোবাইলটা নিয়ে বলল “হ্যালো”

“অসময়ে তোমায় বিরক্ত করলাম নন্দিনী?”

“না... না...”

এরশাদ সাহেব বলে কথা। তার চ্যানেলের মালিক। কিন্তু এত রাতে?!

“একটা গোপনীয় কথা তোমারে কমু বইলাই ফোন করসি”

“হ্যাঁ...হ্যাঁ... বলুন স্যর”

“আমাগো চ্যানেলের একটা পাবলিসিটি দরকার। মানে এইসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র কইর‍্যা”

‘কেন?’ বলতে গিয়েও কথাটা চেপে গেল। এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যা করা যায় না। এমন অনেক উত্তর আছে, যা এরশাদ সাহেব দিতে চাইবেন না।

“সিওরলি স্যর”

“একটা ভাল কইর‍্যা স্টোরি করতে কইসি। যেইটা লোকে খায়। তোমারে কিন্তু সামিমুলের সঙ্গে বইসসা সাজাইতে হইব...”

“নিশ্চয়ই স্যর। আপনি একটুও চিন্তা করবেন না স্যর”

“মনে রাইখ্য তুমি, আমি আর সামিমুল সারা ব্যাপারটা আর কেউ যাতে জানতে না পারে। প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড”

“আপনি একবার বলে দিয়েছেন। সেটাই বড় কথা”

এরশাদ সাহেব কথা না বাড়িয়ে লাইনটা ডিসকানেক্ট করে দিল। ঢকঢক করে আরও কিছুটা হুইস্কি গিলে ফেলল নন্দিনী। কী বোকাই না ছিল ছোটবেলায়! কতই না স্বপ্ন দেখত দেশের জন্য, বিশ্বাসের জন্য – আদর্শ, ইজম, ধর্ম, সংস্কার, রুচি, ভবিষ্যৎ সব তো ছোটবেলার শেখানো জোলো বুলি।

নেশায় মাথাটা আরও বেশি করে খুলছে।

এরশাদ সাহেবের অঙ্কটা কেমন পরিষ্কার ঠেকছে। ইন্টারন্যশনাল কোনো এজেন্সির কাছে টাকা খেয়ে, দেশে একটা আগুন জ্বালাতে চাইছে। যুদ্ধ চাই – কোথাও একটা। তা না হলে যে ইকনমি ফিরবে না! এই রিসেশন থেকে বাঁচার একমাত্র পথ।

শুধু ধানমুন্ডির ফ্ল্যাট নয়, গোটা বিশ্বটাই যেন একটা অদৃশ্য জেলখানায় বন্দি হয়ে পরিত্রাণ খুঁজছে। একটা অর্গ্যজম। ফেরদৌস যা দিতে পারবে না। এরশাদ সাহেব যা দিতে পারবে না। এক অদৃশ্য খাঁচায় বন্দি হয়ে নন্দিনীর মতো কিছু মানুষ পরিত্রাণ খুঁজছে। জীবনের বেঁচে থাকার মানে খুঁজছে। বাঁচতে চাইছে। এখনও স্বপ্ন দেখতে চাইছে। ওই মাটি, ওই আকাশ, ওই সমুদ্রের নীল পাথরবাটির মধ্যে।

নেশাটা কেমন গাঢ় হয়ে আসছে। রাতের অন্ধকার বাইরের আলোর রোশনাইকে ছাপিয়ে গেছে। ঘরের টেবিল ল্যাম্পের আলোটা নন্দিনীর মুখে একটা আবছায়া ছবি এঁকে দিয়ে যাচ্ছে। সেই আলো আঁধারির রঙেই অন্ধকারের ক্যানভাসে নন্দিনী কিছু আঁকতে চাইছে।

স্বপ্নটাকে?

বাস্তবকে? না, স্বপ্নে দেখা বাস্তবকে?

না কি, বাস্তব ছেড়ে নিজের স্বপ্নকে?

নন্দিনী জানে না কোনটা। শুধু জানে, মন কিছু একটা আঁকতে চাইছে বাইরের ম্রিয়মাণ আলো দিয়ে নতুন কোনও ক্যানভাসে।

ফেসবুকে ‘লগ ইন’ করতেই একটা স্ট্যাটাস চোখে পড়ল। ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ বলে কেউ একজন। লোকটির প্রোফাইল পিকচারে শুধুই নীল আকাশের ছবি।

স্ট্যাটাসে লেখা ‘আমরা সবাই স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’

নন্দিনী চুপ করে লেখাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। একবার ‘লাইক’ দিল, কয়েক সেকেন্ড বাদে ‘লাইক’-টা কেটে দিল ... আবার ‘লাইক’ দিল, কয়েক সেকেন্ড বাদে আবার ‘লাইক’-টা কেটে দিল ...

তারপর যেন একটা সম্মোহনের ঘোরের ভেতর কমেন্টের বক্সে লিখে ফেলল ‘বেচে কে, কেনে কে? স্বপ্নটা কার? ফিরিওয়ালা ঘুরে মরে মন ছারখার’

চতুর্থ নি. নী

এই প্রথম।

বুকটা কাঁপছে। দুরু দুরু। ছোটবেলা থেকে কত শিখেছে। তালিম নিয়েছে, রেওয়াজ করেছে। কিন্তু এই প্রথম স্টেজ পারফর্ম্যান্স। নিজের সাধনার আত্মপ্রকাশ। তাও আবার জি ডি বিড়লা সভাঘরে। ভাবতেও পারেনি কোনো দিন এখানে গাইবার সুযোগ পাবে।

কিছুটা শঙ্কিত হয়ে কল্লোলদাকে বলল "“আমার বড্ড ভয় করছে”

“ভয়ের কী আছে? সবাইকেই তো একদিন প্রথম পারফর্ম্যান্স দিতে হয়। দেখো, ঠিক উতরে যাবে”

সকালবেলায় রেওয়াজ বা মাঝে মাঝে নিজের একলা ঘরে বসে খালি গলায় সুর সাধা এক। আর হল ভর্তি লোকের সামনে পুরো তবলচি, এস্রাজ নিয়ে পারফর্ম্যান্স করার মধ্যে অনেক তফাত। মেট্রনম নিয়ে গলা সেধেছে মাত্র। সাউন্ড মনিটরিং-এর তো সে তেমন কিছুই জানে না।

একটু বিচলিত ভাবে তবলাবাদক পণ্ডিত তন্ময় মণ্ডলকে বলল “আমি তো কিছুই জানি না, পারব তো?”

“কিচ্ছু ভেব না। আমি সব সামলে নেব। তুমি একাগ্র মনে গান গেয়ে যাও। ঠিক যেমন ঘরে বসে গাও। ভুলে যাও সামনে অডিয়েন্স আছে” তন্ময়ের আশ্বাস।

জি ডি বিড়লা সভাঘরের অনেক সিট ভর্তি। নন্দিনী বুঝতে পারছে না, একজন অনামী নতুন গায়িকার ক্লাসিক্যল গান শুনতে, কী ভাবে এত লোকের ভিড় হল? সে তো কোনোদিন ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সেরও গায়নি। দূরদর্শনেও ধরে কয়ে একটা সুযোগ করে নেয়নি। যেটুকু শিখেছে নিজের সখের বশে।

কল্লোলদার জন্যই এই সুযোগ। ঘরে বসে বসে যখন হাঁপিয়ে উঠেছিল, তখন কল্লোলদা হঠাৎ একদিন বলল “ঘরে বসে বসে গলা সাধলেই হবে? একটা দুটো প্রোগ্রাম করলে ভাল লাগবে”

“আমাকে কে প্রোগ্রামে গাইতে দেবে?”

“সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি রাজি তো?”

ইতস্তত করছিল নন্দিনী। ভয়ও পাচ্ছিল। তারপর মনে হল, ক্ষতি কী? শখের বসে যেটা শিখেছে, তাতে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ যখন নিজে থেকেই এসেছে, তাকে হেলায় ফেলার কোনো মানেই হয় না। অন্তত ফেসবুক নিয়ে খেলার চেয়ে, বাইরে প্রোগ্রাম করলে মন্দ কী?

কল্লোলদার সঙ্গে সেই কবেকার পরিচয়। এত বছর ধরে দেখছে নন্দিনীকে। নন্দিনী যে ক্লাসিক্যল গান ভালবাসে আর নিয়মিত চর্চা করে সেটা ভাল করেই জানে। এর আগে তো কখনও বলেনি। এই প্রথম যখন বলল, ভবিতব্য সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। সারা জীবন ধরে তো ভবিতব্যের ক্যাসিনোতে বসে বাজি খেলছে। এটাও না হয় আরেকটা গ্যম্বল। দেখাই যাক না, কোথায় গিয়ে ঠেকে।

কল্লোলদা স্টেজের পাশে একজনের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। ছেলের আনন্দ আরও দ্বিগুণ। মায়ের গান এই প্রথম হলে বসে শুনবে। মা ফাংশানে গাইবে কখনও ভাবেনি। প্রথম সারিতে উদগ্রীব অপেক্ষায় বসে আছে মায়ের গান শোনার জন্য।

নন্দিনীর সুরের প্রথম আত্মপ্রকাশ। জি ডি বিড়লা সভাঘরের রিভার্ব সাউন্ড সিস্টেমে আরও দরদিয়া হয়ে জানান দেবে। নতুন কণ্ঠের উদাত্ত রাগে। সামনের অন্ধকারটা ভুলে গেছে। সেই দৃশ্য তো চিরকালই অন্ধকার। এক সময় দেখার চেষ্টাও করত। এখন আর করে না। কিংবা দেখতেই চায় না। সীমাহীন অন্ধকারের আঁকাবাঁকা পথের শেষে কী লেখা আছে, সেটাও জানে না। জানার আগ্রহটাও ক্রমশ কমে আসছে। ভবিষ্যৎটা যখন অজানা-অচেনা-অদেখা-অবোঝা, তখন আর ভেবে কী লাভ?

ঘণ্টা বেজে আলো আধারিতে মিশে গেল। সভাঘরের অন্ধকারের বুকে পর্দা খুলতেই আলোর ফোকাসটা গিয়ে পড়ল মাইক্রফোনের সামনে দাঁড়ানো ভাষ্যকার দেবাশিস বসুর মুখে। পরনে সাদা চুড়িদার, বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি।

দেবাশিসের চিরপরিচিত উদাত্ত কণ্ঠে ভেসে এল নন্দিনীর একক অনুষ্ঠানের সম্বোধনী আহ্বানঃ

“সুজন বন্ধু, চৈত্র সন্ধ্যায় ভাবগম্ভীর এই সংগীত সভায় আপনারা স্বাগত। বলতেই পারেন রোজনামচার বারমাস্যা পেরিয়ে এ যেন অনেক অপেক্ষার তের পার্বণের আনন্দ-

আস্বাদ। সত্যি তো, সুরের মতো বন্ধু আর আছে কী? সুখে সে হর্ষ, শোকে অশ্রু। এক বিনি সুতোর বাঁধন। নির্ভার নির্ভরতা।

আপনারা জানেন, আজেকের শিল্পী নন্দিনী। শুধুই নন্দিনী। না, পদবির ঘেরাটোপে বাঁধব না নন্দিনীকে। ওর অন্তরে সারাক্ষণ যে অনুরণিত হয় প্রাণের পদাবলি। অন্তর্যামীর সঙ্গে এ এক আন্তরিক যোগ সাধন। শাস্ত্রীয় সংগীতে সম্পূর্ণ সমর্পিত নন্দিনী প্রস্তুত। দুটো তানপুরা বেজে উঠবে আর কয়েক মুহূর্তে। মনে হয় বলিঃ

'অনন্ত ওই নীরবতার

শুভ্র বরণ সাজ...

সুর তুলুক সেই জমিতে

সূক্ষ্ম কারুকাজ'"

দেবাশিস বসুর উপস্থাপনা শেষ।

নমস্কারান্তে কারুকাজ শুরু হওয়ার আগেই বাসন্তী রং-এর স্বর্ণচুড়ি শাড়ি পরা নন্দিনী সবাইকে নমস্কার জানিয়ে ডায়াসে। তানপুরা বেজে উঠতেই নিজেকে গুছিয়ে নিল। সেই রেশে, তালে ভেসে এল দৃঢ় বলিষ্ঠ দরদি কণ্ঠে আলাপের সুর। রোজ সকালের রেওয়াজের জন্য শুরু থেকেই জড়তা নেই। সাবলীল সুরের আলাপ বন্দানায় ভেসে গেছে নন্দিনী। ভুলে গেছে দর্শকদের কথা। হারিয়ে গেছে তার নিভৃত প্রাণের সশব্দ পূজার আরতিতে। সভাঘরের অন্ধকার যেন মিশে গেছে তার নির্জন পথের একাকী নিভৃতে। ক্লিসে হয়ে যাওয়া নিষ্প্রদীপ জগতে শ্রোতাদের এক নিঃশব্দ উপভোগে।

কী এক ঘোরে গেয়ে চলেছে নন্দিনী। যেন কোনো জনহীন খোয়াইয়ে চাঁদনী রাতে আকাশের না-চেনা নক্ষত্রের খোঁজে। নিজের মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে আকাশের বুকে আজ জ্বালিয়ে দিচ্ছে সন্ধ্যাতারার বাতিগুলো। একটা... দুটো... তিনটে। ধীরে ধীরে বাতির আলোকিত রোশনাই-এর দেওয়ালি উৎসবে মেতে উঠেছে তার নিভৃত অন্তরের একক সন্ধ্যারতি। এতদিনের নিভৃত সাধনার প্রথম নৈবেদ্য - অন্তরের পূজার অর্ঘ্য। সুর সেখানে মিলে গেছে সুন্দরের উপাসনায়।

এখন আর সামনে কেউ নেই। কল্লোলদা নেই, ছেলে নেই, সামনে হলের দর্শকও নেই! শুধু দেখতে পাচ্ছে এক সীমাহীন গভীর অন্ধকারের মধ্যে পূর্ণতার ছবি। ক্যানভাসের সব

রং-এর একচ্ছত্র প্রকাশ। হয়ত ওখানেই শান্তি লুকিয়ে আছে। হয়ত ওখানেই ইহলোক কোন মায়াময় মধ্যলোকে প্রবেশ করছে মানব জীবনের ধ্রুবতারার পথটুকু দেখিয়ে। চিরশান্তির বাণী শোনাচ্ছে এক ঘোরের মায়াবী লোকে। সেই অন্ধকারটাকে এখন আর ভয় করছে না। তার থেকে পালাতেও চাইছে না। বরং তাকে বরণ করে নিতে চাইছে দু হাত ভরে।

এখানেই ইহকাল।

এখানেই পরকাল।

সব কালের সংমিশ্রণ।

রাগ ললিত গৌরী দিয়ে শুরু। আলাপ থেকে ঝালা। মিশে যাচ্ছে বাসন্তী কেদার থেকে রাগ ভূপনাথ থেকে রাগ শাওনি কল্যাণে। সপ্ত রং-এর ব্যঞ্জনায় আঁকতে চাইছে ধূসর ক্যানভাসের ওপর একটা ছবি। সেটা কী মুহূর্তের! না কি, জীবনের ছবি, না একান্তই তার নিজের! নিজেই জানে না। কেবল একটা শব্দছবি আঁকার চেষ্টা। বর্ণের গীতমালায়। মিশ্র রাগেই যা হয়ত ফুটে উঠবে আপন মাধুর্যে।

ছোটবেলা থেকেই রাগাশ্রয়ী গান ভালবাসত। যখন বয়স বছর ছয় মা তখনই ভর্তি করে দিয়েছিল নাড়া বেধে তালিম নিতে। নিয়মিত সকালে রেওয়াজ করত নন্দিনী। এক সময় শেখা পরিপূর্ণ হল। কিন্তু জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে ওটা অতীতের শখ হিসেবেই থেকে গিয়েছিল সীমিত চর্চার মধ্যে। তারপর কত ঝড় বয়ে গেছে জীবনে। গানটাও অতীতের পাতার মতোই ডুবে গেছে জীবনের চোরাবালিতে। ফিরে তাকানোর সময়ও পায়নি। এমনকী গতানুগতিক বিয়ে থেকে ছেলে হওয়া পর্যন্ত।

ইদানীং সিরিয়াল দেখেতে দেখতে একঘেয়েমি। আবার মনোনিবেশ করেছিল কম্পিউটারে। দুপুরবেলা ফেসবুক নিয়ে খেলা। সেটাও, সেরকম তার মধ্যে সেই স্পন্দন জাগাতে পারছিল না। কোথায় যেন একটা তার ছেঁড়া ব্যঞ্জনা। মুক্তি নেই। নিজের কাছ থেকে। অবসরে রেওয়াজটা আবার শুরু। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। শুধুমাত্র নিজের তৃপ্তি। কখনও মনে হয়নি তাকে বাইরে প্রকাশ করবে।

যেদিন কল্লোলদা এসে বলল ‘ঘরে বসে বসে সাধলেই হবে? একটা দুটো প্রোগ্রাম করলে ভাল লাগবে’ একটু অবাকই হয়েছিল। কল্লোলদা তার স্বামীর ছোটবেলার বন্ধু।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে পরিবারের খবরাখবর নিতে আসে। কিন্তু এর আগে তো কখনও বলেনি।

কল্লোলদার অনেক কন্ট্যাক্টস। তার ভিত্তিতেই এই প্রপোসালটা দিয়েছে। প্রথমে একটু দ্বিধা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সম্মতি। কল্লোলদা বেরিয়ে যেতেই যেন আবার নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেল। নতুন চিত্রপটে। নতুন তুলিতে আঁকা রামধনু থেকে রং কুড়ানো। এক নতুন সাজে। নিজের একঘেয়েমির মধ্যে এক আলোকিত পথের নতুন দিশা। অভিষেকের মন্ত্রটাও নতুন। নিজ মহিমায় দীক্ষিত হতে, নতুন করে মালা গাঁথতেই তাঁর পূজার অর্ঘ্যে। নৈবেদ্য সাজাতে, ইহলোকের মাটিতে বসে অচেনা–অজানা মর্ত্যলোককে নতুন করে পেতে...

গান চলেছে। বিভোর এক অচেনা ছন্দে। কোনো মন্ত্রের মধ্যে নয়। কোনো কল্পনার স্বপ্নেও নয়। মায়ার পৃথিবীটা যেন কায়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে জীবালোকের দীপালোকে। অন্ধকার আর আলো মিলেমিশে একাকার। এক নব অনুভূতির নব আলোকে। এই আলোক দর্শনই তো জীবাত্মার পরমাত্মাকে চেনার প্রথম অভিষেক। আজ যেন নিজের কাছেই নন্দিনীর নতুন করে অভিষেক হচ্ছে। মনের রানি হয়ে মর্ত্যলোকের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে। স্বর্গলোকের তুলসিতলায়... ঈশ্বরের দেওয়া নিজেরই পরা বরণমালায়...

গান শেষ। রেশ রয়ে গেছে...

দেবাশিস বসু এলেন, বললেন "শুভ্র বরণ এক অনন্ত নীরবতার বুকে সুরের সূক্ষ্ম কারুকাজ বুনছিল নন্দিনী। এই স্বর এই সুরে যেন প্রভাতের স্তোত্র, সন্ধ্যার দেবারতি। 'সেলিব্রিটি' হওয়ার দামাল দৌড়ে নেই নন্দিনী। সুরের আরাধনার সময়ও যেন সুরকেই বলেঃ

'তুমি আমার ভোরের বেলা
ঝিম দুপুরের দান
শেষ বিকেলে লালের ছোঁয়া
নীল তারাদের গান'

আপনাদের মতো গভীর মননের শ্রবণ শিল্পীদের নিত্য আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জীবনপথে এগিয়ে চলুক নন্দিনী। সস্তা জনপ্রিয়তা নয়, ও সার্থক হতে চায়, চায় পরিপূর্ণ হতে। ওর সব স্বপ্ন সত্যি হয়ে উঠুক একদিন, এই প্রার্থনা।

শুভ রাত্রি”

গান শেষ হয়ে গেছে।

নন্দিনীর আধুরা ছবিটা তখনও আঁকা হয়নি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো একে একে বেরিয়ে আসছে শ্রোতারা। সেও অনুভব করছে, তার যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। নিজের দিকে ফিরে মনে হচ্ছে, এই যুগ সন্ধিক্ষণে সে যেন অকুল সমুদ্রে ভাসছে একটা হাওয়ার আশায়, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে জীবনের এক নির্দিষ্ট মোহনায়। খালি মোহনার ঠিকানাটাই জানে না। তারার পূর্ণতার মধ্যে সে যেন নিজের শূন্যতার রাগ শুনতে পাচ্ছে। হাজারও লোকের ভিড়ে কোথায় যেন অন্তরের নির্জনতা তাকে গ্রাস করছে। সে যেন সহস্র কোটি গাছের বনাঞ্চলে, এক বেলাভূমির তেপান্তরে নির্জনে দাঁড়িয়ে। ক্যানভাসে রং চড়িয়েছে ঠিকই, তবু সেই ক্যানভাসটা এখনও শূন্য।

শূন্যতার মধ্যে পূর্ণতা।

না কি, পূর্ণতার মধ্যেও শূন্যতা?

অনীশ মাকে জড়িয়ে ধরে বলল “কী দারুণ গেয়েছ মামি”

কল্লোলদা এগিয়ে এসে বলল “ফ্যন্টাস্টিক”

লাজুক হাসল নন্দিনী। কল্লোলদা লক্ষ করল, এত প্রশংসার মাঝেও নন্দিনীর মধ্যে কোনো অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস নেই। যেমন সে এতদিন ধরে দেখে এসেছে। শান্ত, সংযত, ধীর, অবিচল। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, যদি নন্দিনীর কাছ থেকে জানতে পারত ওই মন্ত্রটা, হয়ত নিজের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের একটা সুরাহা হত।

নন্দিনী বলল “গানের কোনো অনুষ্ঠান করব ভাবিনি। তোমার জোরাজোরিতেই আজ প্রথমবার পাবলিক ফাংশনে গাইলাম”

“বেশ করেছ। না করলে কি এমনভাবে দুঘণ্টার ওপর তোমার গান শুনতে পারতাম?”

অনীশ পাশ থেকে বলল “মা খ...উ...ব ভালো গায়”

ছেলে তো বলবেই!

নন্দিনীর মনে হল পেশাদারিত্বে নিয়ে যেতে পারেনি বলেই হয়ত মাধুর্য খুলেছে। নেহাত শখের জন্য গাওয়া। নইলে বাজারের নিলামে গানের সত্তাটাই বিক্রি হয়ে যেত। শখগুলো একান্তই আপনার। তাকে বাজারে নিয়ে ফেললে তার গুরুত্ব বা মাহাত্ম্যটা মলিন হয়ে যায়। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির মধ্যে তো শখ আর সাধনা থাকে না। বাজারি নিলামেই ওটার কেনাবেচা হয়।

কল্লোলদা বলেছিল বলে নেহাত শখের বসে এই প্রোগ্রাম করা। যত সুখ্যাতিই হোক না কেন, সে পথে পা বাড়াবে না।

বাড়ি ফিরে কম্পিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ফেসবুকে দেখল বাজারি শিল্পীরা নিজেদের ফাংশনের ছবি আর খবরের কাগজের ক্লিপিং পোস্ট করছে। ওদের জন্য ভীষণ করুণা হল। প্রতিটা মুহূর্তে যেন অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে। যেন-তেন প্রকারে মুছে যাওয়া ক্যানভাসের ছবিটাকে বারবার বিভিন্ন রং-এর মাধুরী মিশিয়ে আঁকার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনো রং-ই যেন স্থায়ী নয়।

ছবিগুলো আজকে সবাই দেখবে। লাইকস পড়বে। কমেন্টস পড়বে। তারপর কাল সে সব ছবি মুছে যাবে। আবার পাত পেড়ে আদা-জল খেয়ে নেমে পড়বে, আরেকটা আসরের মত্ত বাসরসজ্জা সাজতে। সেই বাসরের আসরও একদিন শূন্য হয়ে যাবে।

এই 'শূন্যতা' আর 'পূর্ণতা'-র যুগলবন্দিতেই জীবনটা পার। মহাকালের পাতায় কিছুই পড়ে থাকবে না। শুধু ক্ষণকালের এক অস্পষ্ট অবয়ব। আর নিজের জন্য কিছু স্মৃতি।

নন্দিনী সেই শূন্যতা-পূর্ণতার গোলকধাঁধায় থাকতে চায় না। সেখানে কোন রং নেই, মাধুর্যও নেই। বিকশিত আমিত্ব। ফেসবুকের আমিত্বের মজলিস থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল নন্দিনী। কম্পিউটার বন্ধ করে উঠে পড়ল।

রংহীন রং-এর মধ্যেই তো রঙিন মাধুর্য। সেই না-ফোটা তুলির আঁচড়ের মধ্যেই সে বিচরণ করতে চায় একাকী।

নিজের ক্ষুদ্র পৃথিবীতে।

সেই ছবিটা অস্পষ্ট হলেও, মুছে যাওয়া ছবির থেকে তো অনেক ভাল। কালহীন যন্ত্রণার বেহাগের সুর না বাজিয়ে মিশে গেল জয়ন্ত শ্রীর মধ্যে। এই সংমিশ্রণেই হয়ত সব রাগ, সব সুর, সব রং বাঁধা। সেখানেই লুকিয়ে আছে সব রাগ। তাদের মিলনের

ক্যানভাসে। মিশ্রিত রাগের সমন্বয়েই হয়ত ব্ল্যাংক ক্যানভাসটা আবার নতুন করে প্রাণ পাবে।

সেই ছবির প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিকেই মন দিল নন্দিনী।

অন্যমনস্ক ভাবে সেতারটার গায় হাত বোলাতে বোলাতে দুচোখ ছাপিয়ে কান্নার একটা ঝলক। কেন, জানে না। দুঃখের না আনন্দের, তাও তার অজানা। বহুদিন আগে পড়া একটা শ্লোকের কয়েকটা লাইন হালকা কুয়াশার মতো তাকে আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে ...

যুজে ব্যাং ব্রহ্ম পূরব্যঃ নমভিরবীয় শ্লোক এতু অধ্যেব সুরেঃ।

শৃনন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আযেধীমানি দিব্যানি তস্থুঃ।।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদ্বিত্যাহতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেহনেয়ায়।। [1]

---

[1] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

পঞ্চম নন্দিনী

বৃহস্পতিবার, ৪ জুলাই।

আমেরিক্যান ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। দিনটা আজও ভুলতে পারে না নন্দিনী। যেন স্বাধীনতার একটা অধ্যায়। শুধু আমেরিকার নয়, নন্দিনীরও। তার জীবনের কালো রং-এ লেখা রয়ে গেছে স্বাধীনতার সেই দিন।

দিনটা শুধুই আমেরিকান স্বাধীনতা দিবস নয়। তারও...

বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরে। তখন অনীশের কতই বা বয়স? বছর ছয়-সাত হবে।

একদিন অর্ণব এসে বলল "শিকাগো"

"মানে?"

"ওখানে জাহাজ পৌঁছে দিতে হবে। ভাবছি নায়েগ্রা ফলসটা একবার ঘুরে দেখে আসব। এবারের ট্রিপে তুমি আর অনীশও চল-না আমার সঙ্গে"

"ক মাস?"

"বেশিদিনের জন্য নয়। জাহাজ পৌঁছেই ফ্লাই ব্যাক করে চলে আসতে হবে। চলে আসার আগে যতটা সম্ভব আমেরিকা ঘুরে দেখে নেব। বিশেষ করে নায়েগ্রা ফলসটা"

একা বাড়িতে ঘর সামলাতে আর ছবি আঁকতে আঁকতে ক্লান্ত। একটা ব্রেক চাই। নন্দিনী উচ্ছ্বসিত। আমেরিকার সব থেকে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে একটি। আনন্দে বুকটা কেঁপে উঠেছিল।

আগেও জাহাজে চড়েছে। তার মধ্যে আর নতুন আকর্ষণ নেই। প্রথম আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে একটা রোমাঞ্চ ছিল। অনীশের উৎসাহ দ্বিগুণ। জাহাজে চড়া থেকে বিদেশে ঘোরা -পাখিটা খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে খোলা আকাশে।

অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল "এই উইকেন্ডে তো সবাই ফুর্তি করছে। চল-না এই উইকেন্ডটাই আমরা নায়েগ্রা ফলস ঘুরে আসি। পুরো উইকেন্ডটাই ওখানে কাটাতে পারব"

নন্দিনীর যেমন ছবি আঁকার নেশা, অর্ণবেরও ছবি তোলার। নন্দিনী নায়েগ্রা ফলস-এর স্মৃতি ক্যানভাসে ধরে রাখতে চায়, আর অর্ণবও ক্যামেরা বন্দি করে ফেলতে পারবে ওই

মনোরম দৃশ্য।

মন্দ কী?

অনীশ বাপির দিকে তাকিয়ে বলেছিল "হাউ লাভলি! আই অ্যাম গেটিং এক্সাইটেড অ্যাট দ্য থট"

অনীশ কেন? মনে মনে ওরা তিনজনেই এক্সাইটেড। নায়াগ্রার কথা এত শুনেছে। আমেরিকাতে এসে আর কিছু দেখা না হোক, নায়েগ্রা ফলস না-দেখে গেলে, যাত্রা অসম্পূর্ণ।

বৃহস্পতিবার সকালে সবার আগে সাওয়ারে ঢুকে পড়ল নন্দিনী। যাওয়ার আগে অনেক কাজ বাকি। অর্ণব স্বাভাবিকভাবে সেগুলো ভুলে যায়। সেগুলো তো গুছিয়ে নিতে হবে। অনীশ তো স্বপ্নের আনন্দে আত্মহারা।

"ক্যামেরাটা নিয়েছ?" অর্ণব বাইরের ঘর থেকে হাঁকল "আমার হ্যন্ডব্যাগে ওটা নিয়ে নাও"। যাওয়ার আনন্দে ছবি তোলার নেশাটা আরও বেশি করে চাড়া দিয়ে উঠেছে।

নন্দিনীর তো সঙ্গে করে কিছু নিয়ে যাওয়ার নেই। শুধু মনের ক্যানভাসে ধরে রাখার জন্য একটা নির্মল মন নিয়ে গিয়ে দুচোখ ভরে দেখে আস্বাদন করতে হবে তার রূপ, রস, বর্ণ মুহূর্ত টুকুকে। পরে ইন্ডিয়াতে ফিরে যাতে স্মৃতির জলছবি আঁকতে পারে মনের ক্যানভাস থেকে।

"উফঃ! অত চিৎকার করার কিছু নেই। যাওয়ার আগে সবকিছু ঠিক করে নেব। লেট মি হ্যভ মাই বাথ ফার্স্ট" নন্দিনী অর্ণবের ফোপরদালালিতে একটু বিরক্তই হল।

"মম... ক্যন আই ক্যরি মাই আইপ্যড প্লিজ?"

নন্দিনী উত্তর দিল না। ততক্ষণে সে সাওয়ারে।

দু-ঘণ্টার ফ্লাইট। শিকাগো থেকে বাফেলো।

অর্ণব নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল "উই হ্যভ লস্ট টু আওয়ার্স" - নিউ ইয়র্ক শিকাগো থেকে এক ঘণ্টা আগে।

নন্দিনীর হাতে চাপ দিয়ে অর্ণব বলল "হাউ অ্যাম আই গোয়িং টু টেক কেয়ার অফ দ্য জেট ল্যগ নন্দিনী?"

ইন্ডিয়া থেকে এলে টাইমের গন্ডগোলে সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। শিকাগোতে কয়েকদিন কাটিয়েছে। এখনও ধাতস্থ হতে পারেনি।

যখন শিকাগোতে পৌঁছল, তখন দুপুর আড়াইটে। অর্ণব হার্টজ কার রেন্টাল থেকে গাড়ির চাবিটা নিতে যাচ্ছিল। পেছন থেকে নন্দিনী বলল "হওয়াই ডোন্ট ইউ গেট এ কার উইথ জিপিএস?"

"দে ডোন্ট হ্যভ ইট রাইট নাও নন্দিনী। বাচ্চার মতো করো না। হোটেলটা এখান থেকে বেশি দূর নয়"

অনীশ গাড়ির পেছনের সিটে বসে বলল "ড্যড আই অ্যাম হাংরি। ক্যন আই হ্যভ সাম নাট-নাগেটস প্লী...জ...?"

"ইয়েস... বাট নো সোডা" অর্ণব ড্রাইভিং হুইলে বসতে বসতে বলল।

একটু অস্বস্তি লাগছিল। ইন্টারন্যশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে এলেও জায়েগাটা তার অপরিচিত। ক'দিন শিকাগোতে চালিয়ে হাতটা একটু রপ্ত করে নিয়েছে। এদেশে ঘুরতে হলে নিজেকেই গাড়ি চালাতে হবে। এ তো আর ইন্ডিয়া নয়! যে সেফর ড্রিভেন কারে কেউ তাকে ঘোরাবে!

"অনীশ ডু ইউ রিমেম্বার হোয়াট ইউ হ্যভ প্রমিসড?"

"হোয়াট?"

"তোমার মাতৃভাষা কী?"

"বাংলা"

"আমরা বাংলায় কথা বলি। নয় কি?" নন্দিনী সিট বেল্ট লাগিয়ে অর্ণবের পাশের সিটে বসে বলল।

অনীশ এই কদিনেই গলগল করে ইংরেজি বলছে। শেষে দেশে ফেরত যাওয়ার আগেই না বাংলাটা ভুলে যায়! বয়েসটাকে তো বিশ্বাস নেই। এই বয়সে বাচ্চারা যা পারে তাই হজম করে নেয়। তাও আবার আমেরিকান সভ্যতা বলে কথা! নিজের দেশকেই পাঁচ মেশালি বিদেশ করে ছাড়ল। আর বিদেশে এলে তো কথাই নেই। দেশকে ভুলতে কতক্ষণ?

পরের দিন অনীশ আরও উৎফুল্ল। কাল রাতে ড্যড কথা দিয়েছে ওকে হেলিকপ্টারে চড়াবে নায়াগ্রা ফলস-এর ওপর। এর আগে কখনও হেলিকপ্টার চড়েনি অনীশ। মনে মনে একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছিল। নন্দিনীর খুব ইচ্ছে ছিল না। অমন উঁচুতে। একটু ভয় ভয় করে... কিন্তু সেকথা অনীশকে বোঝানো যাবে না।

তখন সকাল এগারোটা। ওরা তিনজনে হেলিপ্যাডের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আগে ওজন নিয়ে কপ্টারে ঢুকতে হবে যে! কিছুক্ষণের মধ্যে কমলা রঙের হেলিকপ্টারটা আকাশে হারিয়ে গেল। কোথায় যে হেলিপ্যডটা ফেলে এসেছে চারিদিক ঘুরে দেখতেও পেল না অনীশ।

অনীশ পেছনে মায়ের পাশে বসে ছিল। বাঁ হাতটা মুঠো করে, ডান হাতটা মায়ের হাতে জড়িয়ে দুরু দুরু বুকে সামনে তাকিয়েছিল। অর্ণব পাইলটের পাসে বসে মুচকি মুচকি হাসছিল।

"আমরা স্বর্গের কাছাকাছি!"

কপ্টারটা ফলস-এর ওপর ঘুরপাক খেতে অর্ণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অনেকদিনের স্বপ্ন। বহুদিনের স্বপ্নকে আজ কাছ থেকে পাওয়া। ছোটবেলা থেকে কত পড়েছে। সেই স্বপ্নের স্বর্গ আজ চোখের সামনে।

নীল আকাশের বর্ণচ্ছটায় জলপ্রপাতের ঘনঘটা। মুহূর্তটা যেন নির্বাক হয়ে থেমে। সেই চোখ জুড়ানো বর্ণ নন্দিনীর দুচোখে। হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিতে মহাশূন্যের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে অর্ণব বলল "জলের রংটা কী?"

অর্ণব-এর কথা টেনে নিয়ে নন্দিনী বলল "সাদা? না গ্রে? না কি নীল?"

দৃশ্যটা নিজের মনের ক্যানভাসে ছবি করে রাখতে চাইছে। পরে দেশে ফিরে সেই রং-এর অ্যাক্রিলিক ব্যবহার করতে পারবে। ছবিটাকে স্পষ্ট ধরে রাখতে চাইছে মনে। নিখুঁত রং। যাতে তার প্রকাশের মধ্যে কোনো খামতি না থাকে। রং-টা চিরপরিচিত না হয়ে বাস্তব হওয়াটাই আবশ্যক।

"নীল" অনীশ বাবা মায়ের কথায় যোগ দিয়ে সরবে বলল "দেখ দেখ, আমি কিন্তু বাংলাতেই বলছি"

অর্ণব জবাব দিল না। ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে কন্টিনিউয়াস মোড দিয়ে ধুপ-ধাপ ক্লিক করতে লাগল। এটুকু সময় যত ছবি তুলে রাখা যায়।

ছোটবেলা থেকেই অর্ণবের ফটোগ্রাফির অসম্ভব নেশা। কলকাতার ভিখিরি থেকে বর্ষাস্নাত এসপ্ল্যানেডের মেট্রো চত্বরের ছবি আজও বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে আছে কলকাতার বাড়িতে। তখন তো আর ডিজিট্যল ক্যামেরা ছিল না। অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে একটা নিকন এস এল আর কিনেছিল। এই মুহূর্তে সেকথা মনে করতে চায় না। যুগটা পালটে গেছে। নন্দিনী তখন জীবনে আসেনি। অনীশ তো নয়ই।

এখন আরেক পৃথিবী। তবুও ছেলেবেলার অভ্যসটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ব্যাপ্তির মধ্যে নতুন সুর খুঁজছিল। আনন্দের সুর। জীবনের ভাল লাগার সুর। বিদেশে নিজেকে আবার নতুন করে পাওয়ার সুর। কেবলই মনে হচ্ছিল ছবিই যথেষ্ট নয়...

...আরও... আরও কিছু...

এই ভাল লাগার পরিমাপটা যেন সরগম থেকে নিখাদে পেখম মেলে ভাসতে চাইছে। মুক্ত পাখির মতো। ধরা থেকে অধরাকে আঁকড়ে ধরার উন্মাদ নেশায়...

আরও... আরও... আরও...

বিবরণহীন সৌন্দর্যের নীলিমায় হারিয়ে যেতে যেতে অর্ণবের হঠাৎ মনে হল 'যদি এই মুহূর্তে আমি কপ্টার থেকে ঝাঁপ দিই, ও কি আমায় চুমু খাবে? যদি দুহাত মেলে ভেসে বেড়াই, তবে কি বাধাবন্ধনহীন মুক্ত পাখিদের মতোই শূন্যে উড়তে পারব? যদি আর ফেরত না যাই, তবে কী ও আমায় অ্যাকসেপ্ট করবে?"

"আর ইউ অল রাইট?" পাইলটের কথায় অর্ণব যেন স্বপ্ন থেকে ফিরে এল বাস্তব সৌন্দর্যের মখমলে।

"উই আর নাও গোয়িং ডাউন"

"ওক...কে, ওক...কে, থ্যঙ্কস!" অর্ণবের স্বর স্পষ্ট শোনা গেল।

অনীশ সারাক্ষণ ধরে যেন ভুলতেই পারছে না কপ্টার রাইডের কথা। কত প্রশ্ন। নন্দিনীর উত্তর দিতে দিতে নাভিশ্বাস উঠে আসছে। এবার একটু বিশ্রাম দরকার।

"চলো আমরা হোটেলে যাই" অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল "স্নান করে একটু ঘুমিয়ে নিই"

“তোমরা একটু রেস্ট নাও। আমি আরও কয়েকটা ছবি তুলে আসি। ফেরার পরে আমরা ইভিনিং-এ ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে যাব”

নন্দিনী মাথা নেড়ে গা এলিয়ে দিয়েছিল।

চারটে নাগাদ অর্ণব বেরিয়ে পড়েছিল। এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে কথা বলতে আর ভাল লাগছে না। ঘরে শুয়ে সময় নষ্ট করতেও মন চাইছিল না। ভেতরে ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা তাকে গ্রাস করেছিল। সেই অর্গ্যজমিক নীল তাকে হাতছানি দিচ্ছে...

বারবার!

অর্ণব ফলস-এর জলের দিকে এগিয়ে চলল। যতটা এগোনো যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত ফলস-এর রেইলস তরুণীর হাইমেনের মতো তাকে থামিয়ে না দেয়...

...মাথাটা ঘুরতে লাগল। পা দুটো কেঁপে উঠল। একটা অস্বস্তিতে যেন মাটিটা হারিয়ে যাচ্ছে ... এটা কী প্রকৃতির আমন্ত্রণ? না কী হৃদয়ের কম্পন? বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে গেছে প্রশস্ত কপালের আবরণ।

অর্ণব ক্যামেরার লেন্স ওয়াইপার দিয়ে কপালটা মুছল। সারা জীবনের স্বপ্নের ক্যানভাসটা এস ডি কার্ডে বন্দি করে রাখতে চায়। আঙুল কেঁপে কেঁপে উঠছে শাটারের মৃদুমন্দ তরঙ্গে। কানে ভেসে আসছে হাজার তবলার বিরামহীন লহরা। হৃদয় কেঁপে উঠছে এক নিঃশব্দ আলোড়নে।

মুহূর্তের জন্য...

কোথায় যেন মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দেহটা রেলিং-এর ওপর শূন্যে ভাসছে... যেন এপার-ওপারের মাঝে দাঁড়িয়ে শুনছে একটা চেনা পৃথিবীর না-চেনা আলো-আঁধারের মিশ্র রাগ। ক্যামেরাটা হাত থেকে কালো নুড়ির মতো ফসকে পড়ল।

...আর দেখা গেল না।

অর্ণবের কানে দূর থেকে ভেসে আসছে হাজার মানুষের কোলাহল!

নীল মিশে গেল ধূসর থেকে অন্ধকারে...

ছবিটা আঁকতে গিয়েও আঁকা হল না নন্দিনীর। সেই ইন্ডিয়া থেকে যাকে নানা বর্ণে সাজাতে চেয়েছে চেতনার অবগুণ্ঠনের বিভোরে। সেই চেতনাটা আবছায়া মনের একটা ক্যানভাস। যেখানে জীবনের রং বারবার বর্ণহীন হয়ে যাচ্ছে। জীবনের মহা ব্যাপ্তির

কালস্রোতের গতিপথ থেকে উদ্ধার করা একটুকরো মুছে যাওয়া রং। এই রং-এর রামধনুর মধ্যে কোথাও ছবিটা আছে। আছে ব্যথার একটা জলছবিও। অ্যাক্রিলিকে এঁকে লাভ নেই। কখন আবার মুছে যায়...

কিন্তু কোথায়?

ফেসবুকে নীল ধূসর থেকে অন্ধকারে মিশে যাওয়ার একটা ছবি কম্পিউটারে এঁকে পোস্ট করে দিল। যেন তার মধ্যেই জীবনের ঝংকার খুঁজছে।

ঝংকারটাই তো জীবন!

হয়ত তা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন আকারে। স্পন্দন জাগায় নানা রং-এর রামধনু ছড়ানো ব্ল্যাংক ক্যানভাসে। নন্দিনীর জীবনটা বোধহয় সেই চেনা ছবির অচেনা রূপ আঁকতে চাইছে এক বিশেষ লক্ষ্মণরেখার ঘেরাটোপের মধ্যেই। জাগতিক প্রাণোচ্ছল জীবনের প্রেক্ষাপটে একটা নিজস্ব বিউটি। বিউটি অ্যাট ইটস বেস্ট। আবরণে ঢাকা, ধোঁয়াশায় ঘেরা অস্পষ্ট এক স্বপ্ন!

এমন তো কোনো কথা নেই, যে সৌন্দর্যটা প্রকৃতির অ-দেখার মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে? জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যেও তো তাকে খুঁজে নেওয়া যায়? না-ই বা বাধা পড়ে রইল পঞ্চবটী বনের কুটিরের চারপাশে এঁকে দেওয়া লক্ষ্মণরেখায়! সে তো পুরাণের কথা। গণ্ডির বাইরে পা বাড়ালেই রাবণের হাতছানি! কিংবা মোহময় স্বপ্নের হনন।

একজন ফেসবুকে ছবিটা দেখে কমেন্ট করল "আচ্ছা, আপনি কী স্বপ্ন দেখেন?"

"কেন?"

"ছবিটা দেখে মনে হল, আপনি স্বপ্নের তুলি দিয়ে ছবিটা এঁকেছেন"

নায়েগ্রা ফলস-এর রং-এর সমন্বয় কী স্বপ্নের প্রতিবিম্ব?

নন্দিনী তো বাস্তবের রং-টাই এঁকেছে। তার জীবনের কঠিন বাস্তব। তার জীবনের একটা অধ্যায়।

"কেন বলুন তো?"

"রং-টা ঠিক কেমন জানি লাগছে"

কোন রং দিয়ে আঁকা হলে ক্যানভাসটা প্রাণ পাবে? বেগুনি, ঘন নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, না কি লাল?

ওই রংগুলোই খুঁজছে লোকটা। ধূসর আর অন্ধকারের কোনো রং তো আলাদা করে নেই। মানুষ শুধু চেনা রং-এই ছবিটা দেখতে চায়। অজানা রং নিয়ে ভাবে না। কিন্তু সেই অজানা রং দিয়েই তো জীবনের ছবি আঁকা হয়।

সে রংটা কী?

সেই রং খোঁজাই তো আসল কাজ। অথচ সবাই ভুলে যায় সে কথা। হয়তো বা ক্বচিৎ কখনো, মাঝে মাঝে কোনো নিঝুম দুপুর অথবা স্তব্ধ মাঝরাতে হঠাৎ সেই রংটা স্মৃতির মশারি সরিয়ে উঁকি মারে একটা ছোট্ট মৌটুসি পাখির মতো। ডাক দেয় কোথাও চলে যাওয়ার।

অন্য কোথাও। অন্য কোনোখানে ...

নন্দিনী স্মৃতির আলপথ ধরে জীবনের ধানখেতের মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করল, সেই অজানা অচেনা গন্তব্যের সন্ধানে।

ষ. নন্দিনী

“যুগটা পাল্টে গেছে। এখন আর কেউ পিওর ক্লাসিক্যাল নাচ দেখে না। কী হবে শিখে?” গীতাদি প্রশ্নটা ছুড়ে দিল নন্দিনীর দিকে।

নন্দিনীর অদ্ভুত লাগছে, সব কিছু যেন কিছুর জন্য করা। নিজের ভাল লাগার জন্য কিছু যেন করাটাই বৃথা। সবাই কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করতে চায়। নিছক আনন্দের জন্য কিছু শেখাটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যেতে বেশ লাগে। হোক না সে ক্ষণকালের স্ফূর্তি। তার মধ্যে যে অদৃশ্য তৃপ্তি লুকিয়ে আছে বোঝাবে কী করে?

“তবুও আমি শিখব”

“ভেবে দেখ। সেই পথটা কঠিন” গীতাদির অনীহাটা বেশ আঁচ করতে পারছে।

আশ্চর্য!

গন্তব্য না থাকলে বুঝি পথ চলার কোনো মানেই হয় না। মানে দিশা ছাড়া কোনো কিছু করাটাই নিছক পাগলামো। কত স্বার্থ কেন্দ্রিক বৈষয়িক আমাদের চিন্তাধারা! উদ্দেশ্য ছাড়াও ভাল লাগাটা যে জীবনের চলার পথে মানসিক ব্যাপ্তির জন্য অনেক শ্রেয়। কে বোঝাবে গীতাদিকে?

“তবুও...”

“আবারও বলছি ভেবে দেখ”

কিছুটা বিরক্ত হয়েই হাল ছেড়ে দিল নন্দিনী। শুধু গোঁড়ামি নয়, এই দিকপালদের মধ্যে একটা ঔদ্ধত্য, অহং আছে। নন্দিনীর অত তোষামোদি করা পোষাবে না। নাই বা পারদর্শী হল, তা বলে কি শেখা যায় না? এরা, সব কিছুই কুক্ষিগত করে রাখতে চায় নিজেদের মধ্যে। এটাই এদের অস্তিত্বের অহং, কিংবা বেঁচে থাকার অবলম্বন। ভাববার কী আছে? মন চেয়েছে... শিখবে... ব্যস। অত হিসেব নিকেশের কী আছে?

ছোটবেলায় পাড়ার ফাংশনে বেশ কিছু রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে প্রধান ভূমিকায় নেচেছিল। সে তো অনেকেই করে থাকে। সেটাকে নাচের পর্যায় ফেলতে চায় না নন্দিনী। নাচের তালিম

পরে নিতে শুরু করেছিল ভারতনাট্যমের শিক্ষিকা করুণাদির কাছে। আল্লারিপু দিয়ে শুরু। তারপর কৌটুভম থেকে গণপতি বন্দনা। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর পড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে, আর এগনো হয়নি। এতদিন পরে আবার মনে হল নাচের তালিম নিলে মন্দ হয় না। এবার সিরিয়সলি নাচটা শিখবে। মরুতাপ্পা পিল্লাই-এর সুযোগ্যা শিষ্যা গীতাদির কাছে তাই যাওয়া।

বেশ। না হয় না-ই শেখাল। তাতে কী তার চর্চা বাধা পড়ে থাকবে?

হুজুগের বশে দুম করে একদিন ইউনিভার্সিটি ক্লাসিক্যাল ডান্স কম্পিটিশনে নাম দিয়ে ফেলল। এক সময় কিছুটা ভারতনাট্যম শিখেছিল। সেটাকেই ঘষেমেজে কিছুটা ইম্প্রভাইসেশন করে নেমে পড়ল কম্পিটিশনের ঘোড়দৌড়ে। বাজিমাত করল প্রথম পুরস্কার জিতে। সেটা কোনো মেডেল বা আর্থিক সহায়তা নয়। খাজুরাহ ডান্স ফেস্টিভ্যালে নাচার সুযোগ।

আনন্দে শৃঙ্গার যেন পাদমের ঝংকার তুলল মুদ্রার ছন্দে। ওইটাই নাচবে সে। ইভেন উইদাউট গীতাদি।

খাজুরাহ!

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে, শীতের মিঠে আমেজটা উপভোগ করছিল নন্দিনী। গতকাল দুপুরে ঝাঁসি থেকে ট্রেনে খাজুরাহ পৌঁছেছে। কাল সারাদিন হোটেলের বিছানায় শুয়েই কেটেছে। ট্রেন জার্নির ধকলে বেশ ক্লান্ত লাগছিল। বিছানায় শুয়ে হোটেলের লবি থেকে পাওয়া ব্রশিওরগুলো উলটেপালটে দেখছিল। ৯৫০ থেকে ১০৫০, এই একশো বছরের মধ্যে, মধ্য ভারতের চান্ডেলা রাজপুত রাজারা নাকি ৮৫ খানা মন্দির তৈরি করে। এখন ২২ খানা অবশিষ্ট রয়েছে। চান্ডেলারা নাকি বিশ্বাস করত জৈবিক ক্ষুধার পূর্ণতায় তান্ত্রিক মতে অসীমের কাছাকাছি পৌঁছনো যায়। আবার অনেকের মতে, ব্রহ্মচর্য থেকে জাগতিক গৃহী হওয়ার পথ প্রদর্শক হিসেবে, এই মন্দিরগুলো নির্মাণ করা হয়।

"কাল থেকে তালিম শুরু" ভেজানো দরজাটায় টোকা না দিয়ে দুম করে ঘরে ঢুকেই বলল নাটুভানারস ঋতব্রত।

নন্দিনী ভাবেনি আচমকা এভাবে কেউ ঘরে ঢুকবে। তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে নিল। সুতির নাইটিটা ঠিক করে উপর হওয়া দেহটাকে ব্রশিওরগুলো থেকে সরিয়ে উঠে বসে

বলল "ঠিক আছে স্যার"

"ঠিক সকাল সাতটায়" ঋতব্রত বলল। তারপর ব্রশিওরগুলোর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল "কী দেখছিলে?"

"এই খাজুরাহর নো হাউ"

"ইরটিক। তাই না?"

"আমি ইতিহাসটা পড়ছিলাম"

"ইতিহাস জানতে এখানে কে আসে? সবাই তো ওই ইরটিক স্কাল্পচার দেখতেই আসে"

"আমি কিন্তু খাজুরাহ ডান্স ফেস্টিভ্যল অ্যাটেন্ড করতে এসেছি" নন্দিনীর একটুও ইচ্ছে ছিল না সদ্য পরিচিত ঋতব্রত ভাণ্ডারীর সঙ্গে গুলতানি করার।

"সে জন্যই তো আমাদের এখানে আসা" ঋতব্রত বসবার উদ্যোগ করতেই নন্দিনী উঠে পড়ল।

"সারাদিনের ট্রেন জার্নিতে বেশ ধকল গেছে। স্নান করতে যাব। ভাববেন না স্যার। পাক্কা সাতটায় কমন রুমে পৌঁছে যাব"

এর পরে ঘরে থাকলে অসৌজন্য প্রকাশ পায়। উপায় না দেখে ঋতব্রত ভাণ্ডারী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নন্দিনী। স্নান না ছাই। সন্ধেবেলা এক আধা পরিচিত লোকের সঙ্গে হোটেল রুমে বসে খাজুরাহর ইরটিক স্কাল্পচার নিয়ে গল্প করার কোনো ইচ্ছেই তার নেই।

উঠেই যখন পড়েছে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ যে ভাস্কর্যের ছবি দেখছিল, মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহলে, সেই ছবির সঙ্গে নিজের দেহের গঠনটাও মেলাবার চেষ্টা করছিল। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে নিজের মুখটা দেখল। মসৃণ গালে মেক আপ ছাড়া কোনো ব্রণর দাগ চোখে পড়ল না। চুলটা কাঁধ ছুঁয়ে যাচ্ছে। চোখের নীলচে আভায় যেন সমুদ্রের ঘোর লাগানো মাদকতা। উদাসীন চোখ দুটো যেন সাগরের ব্যাপ্তিকে স্নিগ্ধ শান্ত নিবিড় দৃপ্ত চাহনিতে ভেদ করতে চাইছে। ছোটবেলা থেকেই ডান দিকের নীচের চোখের পাতাটা একটু বেশি ঝোলা। যৌবনে পাড়ি দেওয়ার সময় এ নিয়ে একটু বিচলিত ছিল। এখন আর বড় একটা ভাবে না। মেদুর চোখের চাহনি যেন চোখের পাতার

অসংলগ্নতাকে আড়াল করে দিয়েছে। পাতলা ঠোঁটের ওপর নাকের টিপটা মুখ আন্দাজে একটু ভারী। এক সময় রাইনোপ্লাসটি করাবে বলে প্লাস্টিক সার্জেনের কাছেও গিয়েছিল। উনি করতে চাননি।

"সেবেসিয়াস স্কিনে রাইনোপ্লাসটির রেসাল্ট ভাল হবে না"

পয়সা বেঁচে গিয়েছিল বটে। কিন্তু নাকের আদল নিয়ে মনে একটা খুতখুতানি থেকেই গেছে। সৌন্দর্যের মধ্যে ওটাই যেন একটা বেসুরো রাগ। নিজেকে সান্ত্বনা দেয় - এমন তো কোনো মহিলা নেই, যে পিকচার পারফেক্ট। কাছ থেকে দেখলে প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু অসংলগ্নতা খুঁজে পাওয়া যাবে। মুখের সৌন্দর্য থেকে দৃষ্টিটা নেমে এল দৈহিক গঠনের দিকে। ব্রেস্টটা বরাবরই একটু শিথিল। আন্ডারওয়ার্ড ব্রা দিয়ে তাকে ওপরে টেনে ধরে রাখতে চাইলেও বাইরের দিকে আরমপিটের দিকটা বিশ্রী ভাবে ফুলে ওঠে। বিদ্রোহটা বহিরমুখি না হয়ে অন্তরমুখি হলে, ওই ব্রশিওরের ছবিগুলোর মতোই তা আরও পুষ্ট, পরিপূর্ণ ও ভরাট লাগত। প্রায়শেই মনে হয়, ব্রেস্ট অগমেন্টেশন করিয়ে নিলে হয়ত ওপরে ভরাট হলে আরও বেশি মাধুর্য আসবে। কিন্তু অত টাকা তো নন্দিনীর নেই! বাবা তো দেবেনই না বখে যাওয়া মেয়েকে।

"শেষ পর্যন্ত কোনটা করবে ঠিক করলে?" রিহার্সাল রুমে ঋতব্রত নন্দিনীকে প্রশ্ন করল।

"ভরনম" সারা রাস্তা এই নিয়ে ভেবেছে নন্দিনী।

"তাহলে তো পাদ ভরনম করতে হয়। পাদ ভরনমে গায়কিটা অনেক প্রাধান্য পায়"

"আপনি যা বলেন স্যার" লাল সালওয়ার কামিজটা ঠিক করতে করতে নন্দিনী বলল।

"সেটা তো অনেকক্ষণের। আধ ঘণ্টা দম রাখতে পারবে?"

"পারব স্যার" নন্দিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"তাহলে আদি তাল, যা আট বোলের, আর আট তাল, যা চৌদ্দটা বোলের, তফাতটা আগে বোঝার চেষ্টা কর"

"নিশ্চয়ই স্যার। আমি পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ সম্বন্ধে একটু একটু জানি"

"কী জান?"

"স্যার পূর্বাঙ্গ প্রথম ভাগটা। পল্লবী, মুক্ত পল্লবী আর চিত্ত সরস দিয়ে তৈরি"

মনে মনে খুশি হল ঋতব্রত। মেয়েটা বেশ কিছু জানে। লক্ষ করছে ভেতরে একটা জেদও আছে।

“আর উত্তরাঙ্গ?”

“চরণম আর চরণ সরস”

“মন দিয়ে শোন। যে অর্ডারে আমি নাচটা তালিম দেব তা হচ্ছে, পল্লবী কিংবা অনুপল্লবী, মুক্তাই স্বরনম, এরপর পল্লবীটাকে ডবল স্পিড আর ট্রিপল স্পিডে নাচতে হবে, তারপর আমরা চলে যাব চরণম-এর আটটা গ্রুপে। পারবে?”

“আপনি শিখিয়ে দিলে নিশ্চয়ই পারব স্যার”

সকাল থেকে লাঞ্চটাইম। এক নাগাড়ে তালিম নিয়ে চলেছে। ভুল হলে ঋতব্রত থামিয়ে দিয়ে আবার রিপিট করাচ্ছে। গীতাদি তাকে রিফিউস করেছে। তাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে, সে কোনো অংশে কম নয়।

ঋতব্রত শুধুই বোলের সঙ্গে নন্দিনীর হাত ও পায়ের মুভমেন্টস দেখছে না, নন্দিনীকেও দেখছে। খাজুরাহ ডান্স ফেস্টিভ্যলে আগেও বহুবার এসেছে অনেক ছাত্রী নিয়ে। কিন্তু এর আগে নন্দিনীর মতো জীবন্ত খাজুরাহ কখনও পায়নি। যখন সামনে জীবন্ত খাজুরাহ, বাইরের ভাস্কর্য দেখে কী হবে?

খাওয়ার পর ঋতব্রত বলল “এখন কী করবে?”

“একটু ঘুমিয়ে নিই স্যার”

“তাহলে আমরা পাঁচটা থেকে আবার রিহারসল শুরু করব”

“চারটে থেকে করলে অসুবিধা হবে? আরেকটু বেশি সময় পাওয়া যাবে। আমি তো রিসেন্টলি তেমন ফর্মাল ট্রেনিং-এর মধ্যে নেই। একটু বেশি তালিম দিলে যদি আরেকটু ভাল করতে পারি”

“বেশ। চারটের সময় রিহারসল রুমে চলে এস”

খাজুরাহর চিত্রগুপ্ত মন্দির আর বিশ্বনাথ মন্দির চত্বর সেজে উঠেছে বছরের নৃত্য মধুর নেশায় বিভোর হতে। চিত্রগুপ্ত মন্দিরের সামনে যে পাথর বসানো বিশাল জায়গাটায় চেয়ার পাতা রয়েছে, সেখানে ঋতব্রত স্যারকে বসতে বলে নন্দিনী বলল “স্যার, আপনি একটু বসুন। আমি একটু ঘুরে দেখে আসছি”

“আমি যাব তোমার সঙ্গে? তুমি তো এই মন্দিরের সব দিক চেনো না”

ঋতব্রত স্যার সঙ্গে থাকলে আবার ইরটিক আর্ট সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুরু করবে। রিহার্সালের সময় স্যারের চোখের চাহনি দৃষ্টি এড়ায়নি নন্দিনীর। স্যারকে ভাস্কর্যের মাধুর্য বর্ণনা করার অবকাশ না দিয়েই বলল “না স্যার। আমি একাই দেখে আসি”

কী যে ভাল লাগছে! ভাবতেও পারেনি এখানে কোনোদিন নাচবার সুযোগ পাবে। জেতা কিংবা হারাটা বড় কথা নয়। নন্দিনীর মতো নভিস-এর এই প্রেস্টিজিয়াস ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাওয়াটাই বড় কথা।

কী সুন্দর এই চিত্রগুপ্ত মন্দিরের ভাস্কর্যের কারুকাজ। মন্দিরের আসল অংশ কিঞ্চিত উঁচুতে। দুটো ধাপে সিঁড়িগুলো সাজানো। প্রথম তেরো ধাপ পেরিয়ে একটু সমতল। সেক্ষণে পিংক-গ্রে-হলদে মেশানো পাথরগুলো, তার এই যাত্রার তপস্যাভূমি। সেখানে এখন এই বর্ণাঢ্য নৃত্য সমারোহের আয়োজন চলেছে। এরপর আরও তেরোটা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। তেরোটা সিঁড়ি কেন? প্রশ্নটা বারবার উঁকি দিলেও এ প্রশ্নের উত্তর ক’জন দিতে পারবে বলা মুশকিল। পরে কাউকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাবে। এখন তো ভেতরে যাওয়া যাবে না।

আসল মন্দিরটা অন্যান্য মন্দিরের মতোই। অনেকটা স্পুটনিকের আদলে। নন্দিনীর মনে হল, প্রতিটা মন্দিরের চূড়া হয়ত কোনো উপগ্রহ থেকে আসা উৎকৃষ্ট জীবদের নিদর্শন। একবার মনে হল, হয়ত এই মন্দিরের চূড়াগুলো ঠিক শিবলিঙ্গের মতো। পৌরুষের বহিঃপ্রকাশ। পৌরুষকে পূজা করাই আমাদের সব ধর্মে শিখিয়েছে। অবলা নারী চিরকালই অবদমিত থেকে গেছে এই পৌরুষের অহং-এ, যতই নারী স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন করুক না কেন।

একের পর এক নাচ হয়ে যাচ্ছে। ভরতনাট্যম, কত্থক, কথাকলি, মণিপুরি, কুচিপুরি, ওড়িসি, মহিনাট্যম। এদের দেখে নন্দিনীর ভয় করতে লাগল। পারবে তো? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল প্রাইজ পাক চাই না-পাক, এই আসরে নিজেকে মলিন হতে দেবে না।

ঋতব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল “স্যার কাল থেকে আর সকালে আসব না। আরও বেশি করে তালিম নেব”

“আমাদের প্রোগ্রাম তো আরও দুদিন পরে”

“হ্যাঁ স্যার। দুদিন আরও বেশি করে তালিম”

নন্দিনীর একাগ্রতা দেখে খুশি হল ঋতব্রত। মেয়েটার দম আছে বটে। শুধু দম-ই নয়, চেষ্টার কোনো খামতিও নেই। সবাই সব কিছুতে মাস্টার নাও হতে পারে। চেষ্টা করতে বাধা কোথায়? নন্দিনীর প্রতি আকর্ষণটা আরও গাঢ় হচ্ছে। এতদিন শুধু ওর দৈহিক ভাস্কর্যের প্রতি সীমিত ছিল। এখন নিতম্ব থেকে স্তনভাণ্ডের সম্ভার ছাড়িয়ে, ক্রমশ ওর অন্তরে প্রবেশ করতে চাইছে। ঋতব্রত বেশ বুঝতে পারছে, মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুটা সামগ্রিক। জৈবিক আকাঙ্ক্ষা সংযত করা গেলেও, সামগ্রিক আকর্ষণকে থামানো বড়ই কঠিন।

পড়ন্ত শীতের ঝরন্ত বিকেলের মৃদুমন্দ বাতাস রিফ্রেশড নন্দিনীকে মাতিয়ে দিয়েছে বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে। আজকেই তার দিন। তাকে শ্রেষ্ঠ পারফর্ম্যান্স দিতে হবে। নাউ অর নেভার। গীতাদিকে দেখিয়ে দেবে সে কোনও অংশে কম নয়। ঘোরে নেচে চলেছে নন্দিনী। পল্লবী থেকে অনুপল্লবী থেকে মুক্তাই স্বরনম থেকে চরণম। একটা মাদকতা। একটা সতেজতা। সারা দেহের প্রতিটা অনুষ্টুপ দিয়ে আঁকতে চাইছে বোল-সংগম-মৃদঙ্গমের চৌদ্দ তালের অর্ঘ্য। যেন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছে শিবের বন্দনায়। এ যেন বিশ্বনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ নয়, দেবরাজ ইন্দ্রের মেহফিল। সে আর নন্দিনী নেই। হয়ত সে মেনকা, উর্বশী কিংবা রম্ভা। যার প্রতিটা শৈলী ছড়িয়ে পড়ছে রঙিন আলোর বর্ণচ্ছটায়। সুর-তাল-ছন্দ মিশে গেছে দেহের ভঙ্গিমার পরিপূর্ণ জৌলুসের পরিস্ফুটনে, বোলের বৃন্দে নৃত্যের তালে তালে।

নতুন ক্যানভাসে আঁকতে চাইছে এক অচেনা ছবি। নন্দিনীর না-দেখা নতুন ছবি। চিত্রকর সে। আবার চিত্রপটও সে। চিত্রকর আর চিত্রপট যেন এক হয়ে গেছে নতুন তুলির টানে। রূপ, রস, শব্দ, ছন্দ, বর্ণ - সব যেন মিলেমিশে একাকার, এক নতুন রং-এর জাদুর মায়াজালে।

“খুব ভাল নেচেছ” আচমকা হোটেলের ঘরের দরজা খুলে ঋতব্রত ঢুকল।

নন্দিনী সবে মেক আপটা তুলে নিজেকে রিফ্রেসড করতে বাথরুমে ঢুকছিল এই ধকলের পর। এখনও ঘোর কাটেনি। কিছুটা আবগ, কিছুটা উন্মাদনা, কিছুটা পর্যালোচনা,

সব রং-এর সমন্বয় যেন একটা মোহময় আবেগ সৃষ্টি করেছে তার ক্ষুদ্র অনুভূতির সংগমে।

আচমকা ঋতব্রতকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়েছিল নন্দিনী। এর আগেও তাই করেছে। লোকটা কী অচেনা মহিলার ঘরে ঢোকার আগের শিষ্টাচারগুলো শেখেনি?

তবু ভদ্রতা বজায় রেখে বলল "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার"

"স্যার নয়... ঋতব্রত দা"

"ওই একই হল"

নন্দিনী একটু একা থাকতে চাইছিল। কিন্তু এখন বোধহয় তা আর সম্ভব নয়। কিছুটা কৃতজ্ঞতা বোধে ঋতব্রতকে এখন অবহেলা করা সমীচীন নয়। আফটার অল ঋতব্রতর জন্যই সে মনোমতো পারফরমেন্স দিতে পেরেছে।

ঋতব্রত ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসে। নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল "মাসেণ্ট উই সেলিব্রেট?"

নন্দিনী চুপ করে তাকিয়ে আছে ঋতব্রতর দিকে। ঘোর থেকে বেঘোরে আসবার সময় নিচ্ছে। নন্দিনী এখনও জানে না সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। জিতেছে না হেরেছে?

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে যখন সে দোদুল্যমান, ঠিক সেই মুহূর্তে ঋতব্রত নন্দিনীর ঘরের ফোনটা তুলে বলল "হুইস্কি মিলেগা? টিচার্স? এক বোতল ভেজ দো ঔর বেয়ারা কো... মেনু কার্ড লেকে..." তারপর নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল "আজকে এখানে আমরা সেলিব্রেট করব। টু ইওর গুড লাক" একটু থেমে বলল "চিন্তা করো না। বিল টা আমিই পে করব"

মেনে নেওয়া ছাড়া নন্দিনীর আর বিশেষ কিছুই করার ছিল না। আজকের দিনে যদি স্যার তাকে ট্রিট দিতে চায়, না বলার তো কোনো অবকাশ নেই! আর বলবেই বা কেন? আজকে তো আনন্দের দিন। আজকে তো স্বপ্ন পূরণের একটা মুহূর্ত। আজ গুরু বন্দনার দিন। তার ক্ষুদ্র শখের মজলিসের পূর্ণতার স্বাক্ষর।

হুইস্কি এল। বেয়ারা এল। খাবার অর্ডার হল। নন্দিনী নিজেকে রিফ্রেসড না করেই গুরুর তালে ছন্দ মেলাল। আফটার অল পূজার দিনে কী পূজারিকে অবহেলা করা যায়!

কখনওই নয়। সূর্যের বন্দনা গানে উচ্ছ্বসিত হলে এই দিনটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত। কিন্তু শিবের উপাসনা যেন ফেলে আসা বিশ্বনাথ মন্দিরের রেশ টানতে চাইছে।

নন্দিনী গুরুর ছন্দে পা মিলিয়েছে। আজকের উৎকর্ষ, পারফরমেন্স, ঋতব্রত স্যারের সাহায্য না পেলে কখনই হত না।

“বুঝলে নন্দিনী, এই খাজুরাহ ডান্স ফেস্টিভ্যলে এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি। কিন্তু এবার তোমার আসাতে এটা অন্য মাত্রা পেয়েছে”

নন্দিনী চুপ করে বসে আছে।

ঋতব্রত বলে চলছে “মন্দিরের ভাস্কর্য দেখে কি আর মন ভরে? কতগুলো প্রিমিটিভ মূর্তির ইরটিক লীলাখেলা। বোধহয় এখান থেকেই গ্রুপ সেক্স-এর কনসেপ্টটা শুরু। শ্রী কৃষ্ণের গোপিনীদের নিয়ে লীলা মাহাত্ম্য। এখানে তো আর গোপিনী নেই। কেবল তুমি ছাড়া” একটু থেমে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বলল “আমি সুন্দরের পূজারি... তোমার সৌন্দর্যের পূজারি”

অস্বস্তিতে নড়ে বসল নন্দিনী। ঋতব্রতর কথাগুলো যেভাবে মোড় নিচ্ছে, একটুও ভাল লাগছে না। ঠিক কী করবে, বুঝতে পারছে না। সৌজন্য বজায় রেখে খাওয়ার মাঝখানে স্যারকে চলে যেতে বলতে পারে না।

কথাটা ঘোরাবার জন্য বলল “স্যার আপনার কী মনে হয় আমার কোনও চান্স আছে? আমার নাচটা তো দেখলেন”

“কী করে বলি বল? আমি তো আর জাজ নই। আমি জাজ হলে তোমাকে ফার্স্ট করে দিতাম। এমন ভরাট চেহারা, এমন দৃপ্ত ভঙ্গিমা, এমন শার্প চোখের চাহনি, যেন বিশ্বনাথ মন্দিরে শিব আরাধনার কথা মনে করিয়ে দেয়। তোমারা উপোস করে শিব লিঙ্গে দুধ ঢাল। কখনও ইচ্ছে হয় না জীবন্ত শিবলিঙ্গে দুধ ঢালতে?”

“কী সব যা তা বলছেন স্যার। জীবন্ত শিবলিঙ্গে দুধ ঢালতে যাব কেন?”

“কেন নয়? পাথরের মধ্যে কী দেব বন্দনা সম্পূর্ণ হয়? মানুষই তো ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। সব আরাধনার শেষ আরাধনা এই মানুষ। সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। বিশ্বনাথ মন্দিরে তোমার আজকের শিবের পূজা এখন সম্পূর্ণ করবে না?” বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে এসে, খাটে বসা নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল।

“কী করছেন স্যার!” নন্দিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য বিছানায় রোল করে অন্য প্রান্তে যাওয়ার চেষ্টা করল। তখনই ঋতব্রত স্যার নন্দিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পরল। দুহাত দিয়ে চেপে ধরেছে নন্দিনীকে। সারা দেহ নন্দিনীর দেহের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে। নন্দিনী সমস্ত শক্তি দিয়েও তাকে সরাতে পারছে না।

আর তো দেরি করা যায় না। ঋতব্রতর হাত দুটো নন্দিনীর দেহে খেলে বেড়াচ্ছে। নন্দিনীর হঠাৎ গা টা রি রি করে গুলিয়ে উঠল। ঋতব্রতর ঘন ঘন শ্বাসে বমি পাচ্ছে। মানুষের পশুটাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাটা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। দেহের সব শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। শিথিল হয়ে যাচ্ছে দেহখানা। ঋতব্রতর নেশা মাথা থেকে নীচের দিকে ঘনীভূত হয়ে পতাকার উত্তরণ ঘটাচ্ছে দৃপ্ত বলিষ্ঠ মুক্ত স্বাধীনতায়। যেন মন্দিরের চূড়া তার নিম্নভাগে সদর্পে ইহলোকের জীবন্ত পূজা চাইছে। অনুরোধ নয় - চিরায়িত ধর্মের মতো দৃপ্ত অহংকারে। ঠিক যুগ-যুগান্তরের রক্ষকের আছিলায় ভক্ষকের বেশে।

আর সবুর করা নয়।

দেহের মধ্যে উচ্ছ্বাসের কম্পন, লালসার জাগরণ - টিচার্স হুইস্কি মাথায় এক ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সুনামি ছড়াচ্ছে। সেই উড়িয়ে দেওয়া ঝড়ের উদ্দাম স্রোতে হারিয়ে যেতে যেতে নন্দিনী হঠাৎ অনুভব করল, হাল-দাঁড়-হীন ভেসে যাওয়া নৌকোর মতো, তারও আর কোনো ক্ষমতা নেই। সে এক ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তে দিশাহারা। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল তার হারিয়ে যাওয়া ক্ষমতাকে ফিরিয়ে আনার। শেষ বারের মতো।

আরেকবার আজকের দিনে। শুধু এই মুহূর্তটুকু...

খাজুরাহর মন্দিরের ভাস্কর্যের তৃপ্তি, তার নিজের প্রতিটা কোষে নতুন চিহ্ন এঁকে দিতে চাইছে, বর্তমানের ঔদ্ধত্যে। যদি ঋতব্রত পূজারি হয়, নন্দিনী তবে দেবদাসী। মুক্তি চাই! মুক্তি চাই! নিজের শিবকে ভাসিয়ে দিতে চাইছে নন্দিনীর দুধ সাগরে। নন্দিনী হারিয়ে যাচ্ছে... অতল সমুদ্রের গভীরে... শিথিল যন্ত্রণার সীমাহীন গহ্বরে... সব বাধা ভেঙে ঋতব্রতর পৌরুষ যেন সেই আকাঙ্ক্ষিত গহ্বরে মহা সমারোহে শিবরাত্রি উদযাপন করতে চাইছে গুরু বন্দনার সপ্তম নিখাদে।

প্রবল ঝড়ের মধ্যে বিশাল নদীতে ছোট্ট নৌকা যেমন দিশেহারা, ওলটপালট হয়ে যায়, ঋতব্রতর বলিষ্ঠ দাপটে, নন্দিনীর পালছেঁড়া নৌকো তেমনি দিশাহারা। ঋতব্রত নন্দিনীকে আঁকড়ে ধরে উচ্ছ্বাসের অন্য মার্গে ভেসে যেতে চাইছে। শুধু প্রবেশ দ্বারের ছিটকিনি খোলাটাই বাকি! সে আর নন্দিনীকে দেখতে পারছে না। তার কাছে নন্দিনীর সুতিহীন দেহটাই যেন সূর্য মন্দিরের আরাধনার বন্দনা গান। জীবন্ত খাজুরাহ।

বৃথাই...

তার কানের কাছে হিসহিসিয়ে বয়ে চলেছে ঋতব্রতর দ্রুত শ্বাসের বিষধর কেউটের ফণা। কিছুই করার নেই। এলোমেলো ঝড়ে তার দেহের নৌকা টালমাটাল। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সে আর দাঁড় বাওয়ার শক্তি খুঁজে পেল না। নিথর দাঁড়হীন নৌকাটাকে সঁপে দিল ঋতব্রতর লোলুপ দেহের কাছে। ঋতব্রতর দুরন্ত শরীরী বানের কাছে সে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল ঘূর্ণিস্রোতে। নিজের করে নিতে না পেরে, সঁপে দিল নিজেকে সেই সর্বক্ষম আসুরিক শক্তির অবাঞ্ছিত মিলনযজ্ঞে।

ভোরের আকাশটা আর ভৈরবী গাইছে না। কনসোলেশন প্রাইজটাও যেন নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপ করছে। খাজুরাহ ফেস্টিভ্যালটা ম্লান হয়ে গেছে, দুরন্ত ঝড়ের অশান্ত দাপটে। কলা-সঙ্গম মিশে তছনছ হয়ে গেছে, দেবী বন্দনার শপথ থেকে নারীত্বের অবলুণ্ঠনে। সুপ্ত প্রতিভাকে, কে যেন পদলুণ্ঠিত করে সদর্পে এগিয়ে চলেছে কালহীন সময়ের খরস্রোতে। গীতাদির কাছে জিতেও, সে হেরে গেছে জীবন জোয়ারের চোরাবালিতে।

অসহায় নারীত্ব যেন প্রার্থনা জানাচ্ছে আগামী দিনের সূর্যের কাছে ‘দোহাই তোমার... আর কেউ যেন খাজুরাহর মতো আরেকটা ভাস্কর্য না করে!’

স. ম নন্দিনী

টনি নন্দিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল "ওয়েলকাম টু চেক ল্যপ কোক এয়ারপোর্ট"

নন্দিনী হেসে বলল "তোমার গলাটা ফ্লাইটের এয়ার হস্টেস-এর মতো শোনাচ্ছে"

টনি তার সাবেকি হাসি ছড়িয়ে বলল "হয়ত তোমার ফ্লাইটের সুন্দরী এয়ার হস্টেস নই, কিন্তু তবু হোস্ট তো! তোমাকে সারম্বরে এই গরিবের অতিথিশালায় বরণ করার জন্য। এটা আমার ডিউটি" একটু থেমে বলল "নট এ ফরম্যলিটি"

"একটুও পালটাওনি" নন্দিনী সানগ্লাসটা খুলে মুচকি হেসে টনির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

পরিচয়টা কী আজকের? সেই কত বছর আগের!

টনি কিন্তু একটুও পালটায়নি। শুধু চুলের রংটা সময়ের সঙ্গে কালো থেকে সাদায় পরিবর্তিত হওয়া ছাড়া। তার পঞ্চাশোর্ধ্ব চেহারার মধ্যস্থলে একটু মেধ জমেছে বটে, তবে পরিচ্ছন্ন ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা একটা বয়সোচিত মাধুর্য এনে দিয়েছে। তার আবাহনী হাসি এই বয়েসেও বহু নারীর হৃদয়ে সুনামি তুলতে পারে, সেটা নন্দিনীর থেকে আর কে ভাল জানে? টনির নাভির মেদ সম্ভোগের সময় হয়ত কিঞ্চিত বিড়ম্বনা করলেও, সে ব্যাপারে নন্দিনীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বরং সেটা তার কার্ডিয়াক ফাংশনের কতখানি পরিপন্থী হবে, সেটা নিয়েই চিন্তা বেশি।

সাদা স্যুট লাল টাই পরা টনি, তার লিমুজিনের পেছনের দরজাটা খুলে "আপনার সেবায় জাঁহাপনা..."

লাল টপস-এর ওপর সাদা স্ল্যক্স আর সাদা জ্যাকেট মোড়া নন্দিনী সম্রাজ্ঞীর মতো পেছনের সিটে দেহটা এলিয়ে দিল। টনি লিমুজিনের দরজাটা বন্ধ করে উলটো দিকের সিটে বসে বলল "নিশ্চয়ই নতুন করে আর তোমাকে হংকং-এ অভ্যর্থনা করতে হবে না। বিশেষ করে যে নন্দিনীকে আমি কোলে করে ঢাকুরিয়া লেকে সন্ধেবেলা বেড়াতে নিয়ে যেতাম। সে তো এখন নিজেই নিজের স্বপ্নের বিক্রেতা!"

"এখনও ভোলনি?"

“আমি অতীতকে ভুলি না। তোমাকে ভুলব কী করে?”

সত্যি! অতীতকে কি ভোলা যায়?

নন্দিনী যখন কোলে, টনির বয়স তখন পঁচিশ। নন্দিনীর বাড়িতে কিছুতেই মন টিকত না। বিকেল হতেই কেঁদে কেঁদে কাকুলিয়া রোডের বাড়ি মাথায় তুলত। বাবা তো কাজের জন্য সব সময়ই বাইরে। মা-ই বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী। কোথায় ঘর সামলাবে, না নন্দিনীর আবদার রাখবে? অগতির গতি পাশের সাউথ সিটি কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র, পাড়ার টনি, নন্দিনীর আবদার পূর্ণ করার জন্য হাজির। গোলপার্ক থেকে রবীন্দ্র সরবার।

সেই খুদে বয়সের সাথী।

সে তো বহু বছর আগের কথা। এর মধ্যে অনেক বছর পার হয়ে গেছে। টনি এখন আর পাড়ার অল টাইম সোশাল ওয়ার্কার নয়, যার হাতে অফুরন্ত সময় পাড়ায় জনসেবা করে বেড়ানোর। টনি এখন আর যে সে লোক নয়! এখন সে হংকং-এর একগুচ্ছ নাইট ক্লাবের একছত্র অধিপতি। নন্দিনী এখন আর সেই কাকুলিয়া রোডের ছোট্ট খুকিটি নেই। সে এখন খবরের নাট্যকার।

যেখানেই থাকুক না কেন, নন্দিনীর মনে হয়, কলকাতাই তার প্রিয়। সেই আবেগ, সেই ঘনিষ্ঠতা, সেই সংবেদনশীলতা সে তো আর কোথাও পায়নি। অনেক দেশে বিচরণের মধ্যে এই সাবেকি শহরের হাতছানি সে উপেক্ষা করতে পারে না। তার মনে হয় বিদেশে থাকলেও, ওই পুরনো পলিউটেড সিটির মধ্যেই সে যেন নিজেকে খুঁজে পায়। পৃথিবীর এই একমাত্র জায়গা, যেখানে প্রতিটা মুহূর্ত মেপে পা ফেলতে হয় না।

নন্দিনী লিমুজিনের টিন্টেড গ্লাসের ভেতর থেকে বাইরে তাকাল। তারপর টনির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল “আমিও ভুলিনি। তোমার এই হংকং-এ অ্যাচিভমেন্টটা কেমন লাগে জানি না। তোমার সেই ছোটবেলার ওয়ার্মথটা আজও আমি অনুভব করি টনিদা। জানি না কেন, অনেক জায়গা তো দেখলাম – কোথাও কিন্তু সেই উষ্ণতা নেই। এভরিথিং ইজ সো ব্লাডি মেকানিক্যাল”

“শুনতেও ভালো লাগে” টনি স্যুটটা ঠিক করতে করতে নন্দিনীর দিকে কথাটা ছুড়ে দিল। লিমুজিনের পেছনের সিট আর ড্রাইভারের মাঝের কাচটা টেনে বলল “আমার ডেরায় ডেকে আনলাম আমার নতুন দুনিয়াটাকে দেখাতে। আজকে তোমার হনারে একটা

পার্টি ডেকেছি। দেয়ার উইল বি লট অফ এমিনেন্ট পিপল ফ্রম অল ওভার হংকং। জাস্ট টু কমেমরেট আওয়ার গুড ওল্ড ডেইজ...”

নন্দিনী নিঃশব্দে বাইরে তাকিয়ে রইল। সেই ছেলেবেলার টনিদার উষ্ণতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। জীবনের অনেক চোরাবালি পেরিয়ে টনিদার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। জীবনের উত্তাল ঝঞ্ঝায়, আবেগের প্রকাশটা এখন অনেক সংযত। এখন আর কথার আবেগে অনুভূতি ভাসে না। তার শব্দহীন নিস্তব্ধতা যেন নিঃশব্দে অনেক কিছু বলে যাচ্ছে ভাষাহীন মৌনতায়। যা হয়ত শব্দ দিয়ে ব্যঞ্জনা করতে গেলে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়বে।

সকালের সূর্য তখন মধ্যগগনে তার উষ্ণ রং-এর সংমিশ্রণ এঁকে দিচ্ছে। সেই রং-এর প্রতিটা যেন তার অন্তরের গভীরের উষ্ণতার ক্যানভাসে অস্পষ্ট একটা ছবি। তার শ্যামলা অবয়বটা যেন রামধনুর সপ্ত রং-এর মাধুর্য আত্মসাৎ করে, তার আত্মার এক নতুন বিকিরণ ঘটাতে চাইছে। শুধু নিজের প্রতি নয়, চেতনার নতুন আলোকে। পৃথিবীর রং সময়ের ব্যাপ্তিতে প্রতি মুহূর্তে পালটে যাচ্ছে। তার শ্যামলা মাধুর্য যেন সেই অবক্ষয়ই কয়েক শতকের অ্যাংলো-স্যাক্সন সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্যের মধ্যে, একটা রং-শূন্য নতুন উষ্ণতা ছড়াতে চাইছে নতুন চেতনার রঙে।

টনির প্লাঙ্কেত রোড ভিলার বিশাল প্রাসাদে লিমুজিনটা ঢোকার আগে নন্দিনী তার চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ থেকে লিপস্টিকটা বার করে, গাড়ির আয়নায় দেখে আলতো করে ঠোঁটে বুলিয়ে নিল।

ওপাশের দরজাটা খোলার আতিথেয়তায় টনি গাড়ি থেকে নেমে নন্দিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল “মার্জনা করে এই গড়িবের কুঁড়েঘরে যদি আসেন জাহাপনাহ...”

কোনো জবাব না দিয়ে, মুচকি হেসে গাড়ি থেকে নামল। নন্দিনী কিন্তু টনির বেশভূষা বা তার বিশাল প্রাসাদ সম ক্যাসেলের দিকে দেখছিল না। সে ফিরে যাচ্ছিল তার বালিগঞ্জের অতীতে।

এন্থনি মিত্র বরাবরই বলত ‘ইচ্ছে থাকলে পৃথিবী জয় করা যায়।’ সে পৃথিবীটা যে কত বৃহৎ হতে পারে, তা নন্দিনীর চিন্তারও অতীত। অন্তত এত বছরে সে একটা জিনিসই শিখেছে। ভেতরে একটা তীব্র জেদ থাকলে বিশল্যকরণীকেও ঘাড়ে তুলে নেওয়া যায়।

টনি হয়ত অন্তরের সেই অনুচ্চারিত সঙ্কল্পের বহিঃপ্রকাশ। সেও তো তার মতো একটা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চাইছে।

বছর কুড়ি বয়সের এক স্বাস্থ্যবতী যুবতী নন্দিনীর দিকে এগিয়ে এলো। টনি পরিচয় করিয়ে দিল "সিসিলি প্যাং। এখন থেকে তোমার দেখভাল করবে। ঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে রিল্যাক্স কর। আধঘণ্টা পরে আমরা টেরেসে লাঞ্চ খাব"

সিসিলির দিকে তাকিয়ে বলল "শি ইজ মাই হনারড গেস্ট। আই অ্যাম শিওর ইউ উইল মেক হার স্টে ইন হংকং অ্যাস কমফোর্টেবল অ্যাস পসিবল"

ভিলার অন্দরে যেতে যেতে গাঢ় নীল টেলারড সুট পরা সিসিলি নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল "আই হোপ ইওর জার্নি ওয়াজ কমফোর্টেবল"

"পুরনো দিনের স্মৃতিতে কী এই পার্টির আয়োজন, না অন্য কিছু?" ভিলার টেরেসে নন্দিনী মিডিয়াম কুকড স্টেকটা কাটতে কাটতে প্রশ্ন করল।

নন্দিনী এখন তার ফর্মাল পোশাক ছেড়ে ফেলেছে। এমব্রয়ডারি করা বুটিকের নীল সালওয়ার কামিজ পরা ক্যসুয়াল ড্রেসের ক্রিস্টালগুলো মধ্যদিনের সূর্যের প্রখর আলোকে জ্বলজ্বল করছে। টনি ভাবছিল এমব্রয়ডারিটা সত্যি সত্যি হিরের নয় তো?

টনির দ্বন্দ্ব বুঝতে পেরে নন্দিনী বলল "অমন করে কী দেখছ? আমার ডিজাইনার ড্রেস? ওগুলো হিরে নয়, স্বরোভস্কি ক্রিস্টাল"

এন্থনি মিত্র কিন্তু নন্দিনীর চেয়েও ক্যসুয়াল জামা পরেছিল। সেই কোহিনুরের পাজামা-পাঞ্জাবি। নিশ্চয়ই ঢাকুরিয়া ব্রিজের তলার দোকানটা থেকে বানানো। স্যুটের চেয়ে এই বাঙালি পোশাক যেন তাকে আরও হ্যন্ডসম করে তুলেছে। নন্দিনীর সঙ্গে সেও নিশ্চয়ই ফিরে যেতে চাইছে তার অতীতের ফেলে আসা বালিগঞ্জের ছোটবেলার স্মৃতিতে। নন্দিনীর মনে হল এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে টনি কিন্তু এখনও সেই সাবেকি বাঙালিটাই রয়ে গেছে। না হলেও, অন্তত এই মুহূর্তে নন্দিনীকে সেই পরিচয়টাই দিতে চাইছে।

টনি স্টেকে কামড় দিতে দিতে নন্দিনীর দিকে মুচকি হেসে বলল "আমাকে এতদিনে চেননি? অফ কোর্স দ্য পার্টি ইস এ সেলিব্রেশন ফর ইওর ভিজিট টু হংকং অ্যান্ড ইফ ইট হেল্পস ইন ইওর ড্রিমস কাম ট্রু"

"ড্রিমটাই তো হারিয়ে ফেলেছি টনিদা"

টনির প্রতিটা শব্দের মধ্যে একটা আন্তরিকতার ছোঁয়া লক্ষ করছিল নন্দিনী। টনির কী তার প্রতি কখনও আসক্তি ছিল? টনি যখন দেশ ছাড়ে, নন্দিনীর বয়স খুবই কম। টনি যে প্রায় কুড়ি বছরের বেশি বড়। তার প্রতি, নন্দিনীর অন্য কোনো অনুভব জন্মানোর বয়সই হয়নি। তরুণ যুবকদের দিকে দৃষ্টি যাওয়াটাই স্বাভাবিক। হয়েছিলও তাই। টনিকে অনেকটা অভিভাবকের মতোই দেখত।

কয়েকদিন পরে কাকুলিয়া রোডের সেই তরুণ টনি কর্পূরের মতো মিশে গেল। হারিয়ে গেল তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে স্মৃতির এক কোণে। হঠাৎই ভাগ্যক্রমে আবার দেখা হয়ে গেল।

একবার হংকং-এ চ্যানেলের একটা স্টোরি করতে এসে সারাদিনের খাটুনির পরে সে যখন সামিমুলকে নিয়ে ডিসকোতে রিল্যাক্স করছিল, হঠাৎ ওয়েটার এসে বলল "আওয়ার ওনার ওয়ান্টস টু মিট ইউ"

"আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড" নন্দিনী প্রতিবাদ করেছিল।

এই এক রাতের ইঙ্গিত তার কাছে নতুন নয়। রংটা নয় শ্যামলা – তাতে কী? ক'জনই বা তার মানুষটাকে নিয়ে মাথা ঘামায়। তার দৈহিক মাধুর্যই যেন তার মানসিক গর্বের থেকে বেশি আকর্ষণীয়। না হওয়ারও কোনো কারণ নেই। তার ঢেউ খেলানো দৈহিক প্রাচুর্য আর মনমোহিনী হাসি যে কোনো পুরুষকে ধরাশায়ী করে দিতে পারে। অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই, তার সুঠাম বলিষ্ঠ দেহের উজ্জ্বল শ্যামলা দমকা হাওয়া বাড়িয়ে দিতে পারে যে কোনো পুরুষের উষ্ণতার পারদকে। যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে, নির্জনতা শান্তি ও সম্পূর্ণতার একটা ঘূর্ণি ঝড়ের দমকা স্তব্ধতা। তার সাড়ে পাঁচ ফিট দেহের উপস্থিতি যেন সেই জৈবিক পূর্ণতা থেকে অলৌকিক সমর্পণের একটা বাণী উচ্চারণ করছে। ঠিক যেমন প্রতিটা মানুষ তাদের বাহ্যিক পৌরুষকে অবদমিত করে নিজদের নিভৃতে সমর্পণ করতে চায়। নন্দিনী যেন তাদের দুঃখের আলো-অন্ধকার মেশানো নীরব নিভৃত একাকীর, এক না-আঁকা ক্যানভাস, পাওয়া না-পাওয়ার এক স্তব্ধ গোধূলি।

ওয়েটার চলে গিয়েও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসেছিল। হাতে একটা ছোট স্লিপ। ডিসকোর মালিকের হাতে স্পষ্ট বাংলায় লেখা "তুমি নন্দিনী না? আমায় ভুলে গেছ?

তোমার টনিদাকে?”

তখনই স্বচ্ছ হয়েছিল যে, ডিসকোর মালিক তাকে এক রাতের মেহমান হওয়ার জন্য ডাকেনি। সে এমনই একজন, যার সঙ্গে তার শৈশব জড়িয়ে রয়েছে।

এন্থনি মিত্রর ঘরে ঢুকতেই, সে যেন তার শৈশব থেকে বিচ্ছিন্ন আরেক টনিদাকে দেখল। সারা ঘরটাই মেহগনি টিকের দেওয়ালে মোড়া। তার এক প্রান্তে একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেবিলের ও-প্রান্তে কালো স্যুট আর লাল টাই পরা ডিসকোর মালিক, একটা রিক্লাইনিং চেয়ারে বসে আছে। নন্দিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে উলটো দিকের চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করল।

নন্দিনী বসতেই হেসে বলল “নন্দিনী না? কত বড় হয়ে গেছ!”

“টনিদা! ভাবতেই পারছি না তুমি!”

“আমি ছাড়া আর কে হবে? ভিড়ের মধ্যে তোমাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি” একটু থেমে বলল “তোমাকে কি ভুলতে পারি!”

“কিন্তু এই ডিসকোতে তুমি আমায় দেখলে কী করে?”

এন্থনি মিত্র একটা বোতাম টিপল। কাঠের প্যানেলের একাংশ পর্দার মতো সরে গেল। ওপাশে এক বিশাল এল সি ডি টিভি। স্ক্রিনের এক-একটা অংশে ডিসকোর এবং নাইট ক্লাবের এক একটি অংশের ছবি। যেন ক্যানভাসের মধ্যে বিভিন্ন ছবির কোলাজ। কাঠের প্যানেল দিয়ে ঢাকা ছিল বলে আগে দেখতে পায়নি।

“আমি তো এই ডিসকোর মালিক। কীভাবে চলছে সে খেয়াল রাখতে হয় বৈকি” একটু থেমে পাইপটায় আগুন জ্বেলে বলল “যাক সে কথা। কতদিন পর! ভাবা যায় এখানে এভাবে!”

“হ্যাঁ। অনেকদিন পর”

“অনেক সময় লাগবে টু ক্যচ আপ” পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে মুচকি হেসে বলল “হ্যভ আই লেফট ইওর ফ্রেন্ড অ্যাট লারজ এমিডস্ট এ ম্যাড ক্রাউড ইন ডিসকো?”

“হি ইজ নো ফ্রেন্ড অফ মাইন। উই হ্যভ কাম অন অ্যান অফিসিয়াল ওয়ার্ক ফর এ চ্যনেল আই ওয়ার্ক। কুড ইউ গিভ মি এ মোমেন্ট সো দ্যট আই ক্যান সে গুড বাই টু হিম বিফোর আই জয়েন ইউ?”

“শিওর”এন্থনি মিত্র মুচকি হেসে বলল “আই বেট হি ওন্ট বি প্লিজড...”

“হু কেয়ারস? উই হ্যভ ফিনিসড আওয়ার ওয়ার্ক ফর টুডে। নাউ ইটস মাই ফ্রি টাইম” নন্দিনী সামিমুলকে বিদায় জানাল।

এন্থনি মিত্র পরখ করার চেষ্টা করছিল, এত বছরে নন্দিনীর কতটা পরিবর্তন হয়েছে। দেশ ছাড়ার আগে স্কারট ব্লাউজ বা সালওয়ার – অতীতের স্মৃতিগুলো মনের ক্যানভাসে নানা রং-এর ক্যলিওডস্কপিক জলছবি এঁকে যাচ্ছিল। বহু বছরের হারিয়ে যাওয়া নন্দিনীকে সে আবার নতুন রূপে দেখছিল। নন্দিনীর বার স্টুলে বসে ড্রিঙ্ক করা, একদিকে স্প্লিট করা, হাঁটু পর্যন্ত কালো গড়ানো, ডিজাইনার ড্রেসে ঢাকা অবয়বটা যেন তার বর্তমান মড জীবনযাত্রার স্বাক্ষর বহন করছে।

সত্যিই নন্দিনী কত পালটে গেছে। কিন্তু কতটা? কোন পথে?

কিছুক্ষণ পর নন্দিনী যখন ফিরে এল, ওর দিকে স্মিত হাসি হেসে বলল “কলিগকে না হয় পরিত্যাগ করলে, ড্রিঙ্কটাকে পরিত্যাগ করতে হবে এমন কেউ বলেনি”

ইন্টারকমের বোতাম টিপে হুকুম করেছিল “কুড ইউ প্লিজ সেন্ড দ্য ড্রিঙ্ক অফ দিস লেডি টু মাই রুম অ্যালং উইথ এ বটল অফ ডম পেরিগনন ফ্রম মাই সাইড” চোখ টিপে নন্দিনীকে সোফায় বসার ইঙ্গিত করে বলেছিল “নিশ্চয়ই ও খুব মর্মাহত”

নন্দিনী সোফায় এলিয়ে ডিজাইনার ড্রেসেটা ঠিক করতে করতে বলেছিল “কী আর করা যাবে? এতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। প্রফেশনের বাইরে কলিগের সঙ্গে সময় কাটানোর কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। নেহাৎ কিছু করার ছিল না। তাই...”

উলটো দিকের সোফায় বসে টনি মিত্র বলেছিল “হ্যাঁ। অনেক বছরের অনেক কথা পড়ে আছে”

“সত্যি। কত বছর পার হয়ে গেল, তাই না? তুমি কিন্তু বুড়িয়ে গেছ। তোমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু আগের মতোই হ্যন্ডসম”একটু থেমে আন্তরিক ভাবে বলেছিল “কেমন আছ টনিদা?”

নন্দিনীর কথা উপেক্ষা করে টনি বলেছিল “খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। বলো, কী খাবে?”

“যা কিছু...” একটু থেমে বলেছিল “তোমাদের হংকং-এর স্পেশাল কিছু একটা”

“স্নেক সুপ এখানকার ডেলিকেসি”

“ওয়্যাক” নন্দিনী আঁতকে উঠল “তুমি কি চাও সারা সন্ধে আমি এখানে বসে বমি করি?”

“তাই হংকং-এর অথেনটিক ডেলিকেসির দিকে না ঘেঁষাই ভাল। বারবিকিউ পর্ক বরং বেটার হবে। আরেকটা ড্রিঙ্ক-এর অর্ডার দেব?”

“মন্দ হয় না”

অর্ধ সমাপ্ত ড্রিঙ্কটায় এক চুমুক দিয়ে নন্দিনী তার চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ হাতড়াতে হাতড়াতে বলেছিল “স্মোক করলে মাইন্ড করবে না তো?”

“একদম না। প্লিজ মেক ইয়োরসেলফ অ্যাট হোম”

“তুমি কি এই ডিসকোর মালিক?”

“আনফরচুনেটলি” সম্মতি দিয়ে টনিদা বলেছিল “অনেক ক’টার মধ্যে এই একটা। এটাই চেইনের সব থেকে বড়”আবার পাইপে টান দিয়ে বলেছিল “উড ইট বি ইমপ্রুডেন্ট ইন ইনভেডিং অন ইওর প্রাইভেসি ইফ আই আস্কড ইউ, হোয়াট স্টোরি ইউ আর আফটার ফ্রম দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড?”

“ওয়ান অফ দ্য রুটিন মিডিয়া কভারেজ” সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ড্রিঙ্ক-এ চুমুক দিয়ে আসল কথাটা এড়িয়ে গেল নন্দিনী।

“তোমার স্বামী সংসার?”

“বিয়েই করিনি... তুমি?”

“আমি বিয়ে করেছিলাম বটে, কিন্তু হোয়াট ম্যন প্রপোসেস গড ডিসপোসেস। যখন আমি ওয়াশিংটন থেকে রিচমন্ডে ড্রাইভ করছিলাম, একটা মর্মান্তিক কার অ্যাক্সিডেন্টে ন্যান্সি মারা যায়। বরাতজোরে আমি বেঁচে যাই। আমার দুটি ফুটফুটে মেয়ে আছে। দুজনেই এখন স্টেটস-এ থাকে”

“মানে তুমি একা। একদম একা?”

টনি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তখনই ওয়েটার বারবিকিউড পর্ক নিয়ে ঢুকল “ট্রাই দিস। ইট ইজ টিপিক্যলি কুকড ইন ক্যন্টনিস ডিম সাম স্টাইল। ইট ইজ সেমি ফ্যাট পর্ক”

নন্দিনী পর্কে কামড় দিয়ে বলল “বেশ ভাল খেতে তো। এর আগে কখনও খাইনি”

টনি হেসে বলল “সেই নন্দিনী, যে আমাকে মৌচাক থেকে মিষ্টি কিনে আনার জন্য পাগল করে দিত। এখনো মিষ্টি ভালো লাগে?”

“ভুঁড়ি বাড়ার ভয়ে এখন টেইস্টটা একটু পালটে নিয়েছি। সুইট টু সল্টি। ইটস অল টু ডু উইথ ক্যালরিস”

টনি নন্দিনীর কথার গভীর অর্থ খোঁজার চেষ্টা করছিল। কিছু কি বোঝাতে চাইছে নন্দিনী? না কি, কথার পৃষ্ঠে কথা? সময় লাগবে নন্দিনীকে চিনতে। সারা রাত পড়ে আছে অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে যতক্ষণ না ভোরের ঊষা তাদের ফিরিয়ে আনে বর্তমানে।

নন্দিনী পর্কে আরেকটা কামড় বসিয়ে বলেছিল “এক সময় তোমার এই নাইট ক্লাবও বন্ধ হবে। কিন্তু আমাদের এত বছরের কথা শেষ হতে রাত পার হয়ে যাবে”

টনি মধ্য গগনের সূর্যের দিকে তাকিয়ে স্টেকে কামড় দিয়ে বলল “তোমার মনে আছে নাইট ক্লাবে এত বছর পরে দেখার কথা? আগেরবারের মতো এবার কিন্তু পর্ক নয়, স্টেক। টুডে ইভনিং ইজ টু এ সেলিব্রেশন অফ আওয়ার গুড ওল্ড মেমরিস”

“ইফ ওনলি আই নিউ দ্য এভিনিউস অফ সেলিব্রেশন” নন্দিনী স্টেকে কামড় দিয়ে এড়াতে চাইলেও, অন্তর্নিহিত দীর্ঘশ্বাসটা চোখ এড়ায়নি টনির।

“একটু তফাত। ইট ওয়াজ অল সল্টি হোয়েন দ্য ফার্স্ট টাইম উই মেট। নাউ ইট উইল বি সুগার কোটেড সল্ট”

নন্দিনীর বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না, টনিদা একটা টক-ঝাল-মিষ্টি সংমিশ্রণে পুরনো সুরকে নতুন রূপে ফেরাতে চাইছে।

জীবনটা কীভাবে পালটায়!

ক্যানভাসে ছবি আঁকা হয়, মোছা হয়, আবার আঁকা, আবার মোছা। এই রং-তুলির খেলার মধ্যেই জীবন এগিয়ে যায়। ফিরে দেখা হয় না, এতগুলো আঁকা মোছা ছবির মধ্যে কোনো ছবিটা ক্যানভাসে এখনও আছে।

নন্দিনীর থেকে সে কথা আর কে ভালো জানে?

“কী ভাবছ নন্দিনী ?”

টনিদার কথায় তাকাল নন্দিনী। টনিদার চোখ কি কিছু বলতে চাইছে?

নন্দিনী মোনালিসার মতো এক ঝলক হাসল। তারপর টনিদার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কাটা কাটা গলায় মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলঃ

জীবনের ঝরে পড়া ধানগুলো
খুঁটে খুঁটে খেয়ে চলে স্মৃতির পাখিরা
ওগো ব্যাধ তুলো না গাণ্ডীব
তার চেয়ে হও তুমি নীল বাতিঘর
দেখাও দিশার আলো নিশার আঁধারে ...[1]

---

[1] কবিতাটি আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা

ক্যানভাসে তুলি নিয়ে...

.দখা, না-দেখা নন্দিনী

ক্যানভাসটা এখনও শূন্য। কিছুই আঁকা হয়নি। কোনো ছবিই নয়। পাশে পড়ে আছে সাতটা বাটিতে সাতটা রং। যে কোনো রং দিয়ে ছবি আঁকা যেতে পারে। পূর্ণ ছবি। কিংবা আরও সাতটি বাটিতে নতুন রং তৈরি করা যেতে পারে। সেই রং-এর কোনো একটি বা একাধিক রং দিয়েও ছবি আঁকা যেতে পারে। সুন্দর ছবি। কল্পনার ছবি। বাস্তবের আঁধারে ফুটিয়ে তোলা একগুচ্ছ গল্পের মালা। ছবি দিয়ে রঙে আঁকা স্বপ্নের ডালা। হাওয়া থেকে কুড়িয়ে আনা শিশিরের ফোঁটার মালা। ক্যানভাসে জুড়ে দিতে পারে সূক্ষ্মতার মোহময় স্নিগ্ধ আমেজ।

বাঃ!

কেউ বলবে 'অসাধারণ লেখা'। কেউ বা বলবে 'হল না তো। গতের বাইরে বেরিয়ে এটা কী উপন্যাস হল?' কেউ বা প্রশ্ন করবে 'এ কোনো মহিলার ছবি? টুকরো টুকরো ফুল দিয়ে কী গাঁথা হয় পূর্ণতার প্রতিমূর্তি?' পূর্ণতা তো সম্পূর্ণ এক গোলক। সেই গোলকের বৃত্তে কতগুলো রং-এর মধ্যেই কি তার বিকাশ? কেনই বা করতে হবে আধ-খেঁচড়া প্রকাশ? কেনই বা দিতে হবে তাকে নতুন সংজ্ঞা? যেখানে হয়ত নামটা হবে আজকের দিনের ভিঙ্গির 'অনন্যা?'

নন্দিনী বলবে "এ তো আমার ছবি নয়। তোমার শূন্য ক্যানভাস পাশে নিয়ে কিছু রং-এর ডালি"

আমি বলব "এই শূন্যতার মধ্যেই তো জ্বলছে পূর্ণতার আসল রবি"

"আমি তো কিছুই দেখতে পারছি না"

"দেখার জন্যে যে চোখ চাই"

"আমি কী তবে অন্ধ?"

“মোটেই নয়। বাইরের ছবি সে তো সবাই দেখতে পারে। ভেতরে খুঁজে দেখ যদি একবার। তোমাকে খুঁজে পাবে নতুন রং-এর নতুন সম্ভারে প্রতিনিয়ত বারবার, যেখানে সব রং মিশে ধূসরে অনিবার”

“কোথায় খুঁজব আমি আমাকে?”

“যেখানে কেউ পৌঁছতে পারেনি, নিজের না-দেখা অন্ধকারের নতুন আলোকে। অতি বেগুনি বা লাল উজানি রং-এর আলো-আঁধারের দেশে”

“ছবিটা কী ওখানেই আছে?”

“পরখ করে একবার দেখো নিজের মনের ক্যানভাসে”

“খুবই কঠিন বুঝলে হে দোসর”

“যদি কখনও পাও একটুকরো অবসর”

“আমি চেয়েছিলাম একটা সাদামাটা লেখা”

“কী করে লিখব? শুধুই তোমার ছবি দেখে, না পেয়ে তোমার দেখা”

“তোমার কল্পনা দিয়ে তাকে তুমি আঁকো”

“যা দেখা যায় সবার চোখে, সেটাই কী একমাত্র সাঁকো?”

“কী আছে তবে না-দেখা আলোকে?”

“পরখ করে দেখ নিজের চিত্তের পুলকে”

“তাতে কী ঘুচবে আমার বাসনার ডালা?”

“চেনা রং-এর পাঁচ মিশালিতে নয় খেললে না-চেনা হোলি খেলা”

“তোমার কাছে তো সেটুকুই চেয়েছি চেনা-জানা কল্পনার ছোঁয়ায়”

“দেখি কী আঁকতে পারি, তোমার সুপ্ত বাসনার প্রত্যক্ষ কায়ায়”

বুঝলাম ছবিটা হয়নি গতের স্রোতে।

ও শুনতে চায় একটা চেনা কাহিনি নতুন আঙ্গিকে। আজকের দিনে কী সব নাম আছে ‘রিমিক্স ‘রিথিঙ্ক’ ‘রিমার্জড’‘রিভিসুয়ালাইজড’’ইম্প্রভাইজড’ – নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকতে গালভরা কত নাম! তাই যদি শুনতে চায় সাতটা উপাখ্যানের যে কোনো একটাকে নিয়েই তো নভেল লেখা যায়। সাত সাতটা নভেল। রাইটিং ইন্ডাস্ট্রিতে এক বছরে সাত

সাতটা কাহিনি বেরোবে। বছরে সাত থেকে চৌদ্দ খানা নভেল। নামী-দামি লেখক হওয়ার একমাত্র মূলধন।

শুধু ক্যানভাসটা খালি পড়ে থাকবে।

পূর্ণ হবে না শূন্য পূরণ।

খালি ক্যানভাসের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম, এই সাতটা গল্পের মধ্যে যে কোনো একটাই নন্দিনীর কাহিনি হতে পারে। আবার কোনোটাও নয়। আরও সাতটা লিখলে?

লেগে যেতেও পারে। আবার, নাও লাগতে পারে। নন্দিনীর মনঃপুত হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। এই খেলার পারমুটেশন-কম্বিনেশনে একটা দুটো হিটও করে যেতে পারে পাবলিসিটির ব্যন্ডওয়াগনে ঢুকতে পারলে।

কী আসে যায় তাতে? অপূর্ণ ছবিটা বুকে আঁকড়ে ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাসটা নিয়ে বসে থাকব অন্ধকারে...

ছবি আঁকা হল না।

হয়নি কী?

সাদা ক্যানভাস এখনও সাদাই রয়ে গেছে। হয়নি রঙিন তুলির স্পর্শে। ছবিটা আমি হারিয়ে ফেলেছি, আলোর মুখ দেখানো অন্ধকারে। ক্যানভাস যেখানে মেঘের বুকে হারায়, সেই না-দেখা অলিতে-গলিতে। ছবিটা আজও বিকোয়েনি কোটি টাকার বাজারে। ফুটে উঠছে নিজ সৌরভে, পাঁকের মধ্যে পদ্ম হয়ে। যেখানে মনের গভীরে নতুন ছবিটা আজও জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে মণিকাঞ্চন হয়ে। সেখানে ওই ছবিটা ওঙ্কার তোলে মহাপ্রলয়ের ঔরসে। নগ্নচেতা নন্দিনীকে দেখছি খোলসহীন বেশে। স্বপ্ন মধুর ত্রাসে, উল্লাসে, হরষে, বিমর্ষে। নিজেকে দেখা, না-চেনার পরশে।

না-চেনা নন্দিনী আবার নতুন ভাবে দেখা দিয়েছে নিজের সৌরভে। ছবিটা যেন স্বপ্ন মাখা, আমার কবিতায় আঁকা, বলিষ্ঠ সুদৃঢ় একটা জীবন্ত আত্মা। সেখানেই আছে আসল নন্দিনী, তার আত্মার জীবন্ত প্রকাশ। যা এখনও হয়নি চেনা হাজার লোকের ভিড়ে। সেই ছবিটা তোলা থাক না-চেনার অলিন্দে, না-দেখা অন্ধকারের শিখরে, আমার না-লেখা গল্পের অশ্রুত বিন্যাসে।

হয়ত ক্যানভাসটা ব্ল্যাঙ্ক নয়। নন্দিনীই হয়ত তাকে ধূসর দেখছে। কিংবা তোমরা। যারা এই উপাখ্যান এতক্ষণ ধরে পড়ছিলে, নন্দিনীর মতো তারাও বলবেন 'এটা কী হল? গল্প তো হল না। ক্যানভাসের পাশে রং নিয়ে নাড়াচাড়া করে অর্থহীন সময় কেটে গেল'

বেশ। মানলাম কিছুই হয়নি। ক্যানভাসটা আজও শূন্য। আমার দেখা ছবিটা তোলা থাক শেষের জন্য। তখন নয় ক্যানভাসে আমার রং-এর তুলিতে ছবিটা আঁকব। আপাতত তোমাদের নন্দিনীর কাহিনিগুলো এক রং-এর মালায় গাঁথি একটি কাহিনি করে।

শুধু তোমাদের জন্য।

সব রং দিয়েই আঁকা যায় একটি ছবি...

.ক এই নন্দিনী?

ফেসবুকের এক অজ্ঞাত নাম। হয়ত অজানা, কিন্তু অচেনা তো নয়। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নিজ রূপে, নিজ মহিমায়, আমাদের চেতনার না-আঁকা ক্যানভাসে। জীবনের নীল আকাশে ভেসে বেড়ায়, মুক্ত বিহঙ্গের মতো, চেনা গণ্ডির পরিব্যাপ্তি থেকে না-চেনা দিগন্তপারের সীমাহীন আলোকে। যেখানে সদ্য প্রস্ফুটিত এক নতুন জীবন, হেঁটে চলে পঙ্কিল আঁশ গন্ধে ভরপুর, ক্লেদাক্ত বিষাক্ত স্বপ্ন রং ছড়ানো, মায়াবী নির্মম পৃথিবীর আভরণে ঢাকা, আবরণহীন উলঙ্গ সত্তা হয়ে, বিষধর সাপের লেলিহান ফণার মুখ থেকে নিজেকে বারবার বাঁচিয়ে, স্বপ্ন ভরা জীবনের হাতছানিতে।

কে এই নন্দিনী?

হয়ত এরা সবাই নন্দিনী। হয়ত এরা কেউই নয়। আবার হয়ত এদের জীবনের গতিপথই না-আকা ক্যানভাসে না-দেখা নন্দিনীদের আসল রূপ।

কেমন কাব্যিক হয়ে যাচ্ছে, তাই না?

বাস্তবের নন্দিনী তো কবিতা হতে পারে না। বাস্তবের নন্দিনী তো আমার কাহিনির এক না-চেনা স্বরূপ। দেশ থেকে দেশান্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন আকারে তার বিচরণ, যার প্রকাশ চলার চোরাবালিতে, তার লাস্যময়ী পদক্ষেপের না-চেনা রঙে।

তোমাদের নন্দিনী সমাজের নগ্ন স্বরূপ। জীবিকার তাগিদে যাকে ছুটতে হয় দেশ থেকে দেশান্তরে। কখনও আলো, কখনও গভীর অন্ধকারে। স্মৃতির আমিগডালা থেকে হারিয়ে যাওয়া একটা অধ্যায়। তোমাদের চেনা নন্দিনী কোনোদিন সেখান থেকে মুছে যায়। আরেক চেনা নন্দিনী জায়গা করে নেয়। জীবন এগিয়ে চলে, সেই অচেনা নন্দিনীকে উপেক্ষা করে, চেনা নন্দিনীর হাত ধরে, নিজের সংকীর্ণ পসরার হিসেব গুছিয়ে নিতে।

থাক। অনেক হয়েছে জীবনতত্ত্ব।

এবার তোমাকে শোনাব এই সব নন্দিনীর আসল সত্য।

ক্যানভাসে আঁকা নন্দিনীর ছবি

এক

গর্ভের ঔরস .থকে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর মাদল।

প্রেসিডেন্সি নার্সিংহোমের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ডাক্তার নার্সদের ছোটাছুটির জেরে নন্দিনীর বাবার ত্রাহি অবস্থা। অঘটনের আঁচ করতে পারছে, কিন্তু কারও যেন ব্যাখ্যা করার সময় নেই। মেকনিয়াম স্টেইনড লাইকার। ফিটাল ডিস্ট্রেস। সিজারিয়ানের তোড়জোড় নিয়ে নার্সিং হোমে ব্যস্ততা।

মরতে মরতেও শেষ পর্যন্ত সুরক্ষা হল। নন্দিনী ভূমিষ্ঠ হল। জ্যোতিষেরা পরে বলেছিল চন্দ্র-মঙ্গল বিভ্রাটে এ গোলযোগ। গোলযোগ যখন মিটেই গেছে, গ্রহ চক্রের বিচার করে কী হবে? তবুও হাজরা রোডের প্রেসিডেন্সি নার্সিংহোমের দেওয়া সময় মেনে একটা ঠিকুজি করা হয়েছিল।

সে ঠিকুজি আজ কোথায় নন্দিনী জানে না। জানতেও চায়নি। ঠিকুজিটা হয়ত ঠিক ছিল। গণনা আজ অবধি কেউ করে উঠতে পারেনি। কিংবা করলেও মেলাতে পারেনি।

নন্দিনীকে বুকে আগলে মা ফিরে এসেছিল কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে। স্নিগ্ধ, শান্ত, নিবিড় ঘরের কোণে। গোলপার্কের হৈ-হট্টগোল থেকে কিঞ্চিত দূরে। আপন বলয়ের ঘেরাটোপে।

তখনও কি শিশুটি জানত সীতাকে বারবার অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে সারা জীবন ধরে?

সেই ছোট্ট শিশুটি জানত না পৃথিবীর আলোটা কতটা ভয়াবহ, নির্মম, নিষ্ঠুর এই জীবনের নামে। পূর্ণতা থেকে শূন্যতার স্ট্রবস্ফিয়ারে। জানতই না, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, মায়ের আঁচলের বাইরে প্রাক কর্মের মাশুল গুনতে হবে সারাজীবন ধরে। জীবনের নগ্ন রূপ বারবার অত্মপ্রকাশ করবে নিজের স্বরূপে।

হরি ঘরে ঢুকে বলল “মহা মুশকিল তো। দিদিমণি কইলেন লেকে বেড়াইতে যাইবেন। কী করি বলেন তো? আমার কি দু হাত খালি আসে? বিকালের বাজার, রাতের রান্না, কত কিসু পোইরা আসে। কন তো কী করুম?”

মা জানত না কী ভাবে মেয়েকে ভোলাবে।

"এবার একটু বেশি দিতে হবে। কুড়ি টাকা লিখি?" হঠাৎ সরস্বতী পূজার চাঁদা নিতে হাজির পাড়ার রকের টনি বিল বইটা খুলে বলল।

মেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। মা আর কথা না বাড়িয়ে তড়িঘড়ি কুড়ি টাকার নোটটা টনির হাতে গুঁজে বলল "নাও... নাও... নাও... আমি গিয়ে মেয়েটাকে সামলাই। আর কত যে একহাতে সামলাব? মেয়েটা কান্নাকাটি শুরু করেছে। হরি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমার হয়েছে যত্ত জ্বালা। কী যে করি?"

টনি চাঁদার বিলটা বন্ধ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মায়ের কথায় ফিরে দাঁড়িয়ে বলল "আমি কি কিছু সাহায্য করতে পারি?"

"এই মেয়েটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেল"

"কী হয়েছে?"

"দেখ না আমার একটা হাতও খালি নেই। ওনাকে এখন ঢাকুরিয়া লেকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে"

টনি হঠাৎ বলল "আমার তো কোনো কাজ নেই। আমিই নয় ওকে ঘুরিয়ে আনছি"

টনির কথায় ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল। পাড়ার ছেলে। শুধু মুখটাই চেনা। রকে বসে আড্ডা মারে আর সিগারেট খায়। পুজোর সময় লাফিয়ে নেমে পড়ে। এ হেন বাউন্ডুলে ছেলের হাতে মেয়েকে একা তুলে দেবে? তারপর যদি কিছু হয়ে যায়? উনি শুনলে আর রক্ষা রাখবেন না।

মনোভাবটা বুঝতে পেরে টনি বলল "বিশ্বাস করতে পারছেন না তো? আপনার মেয়ে আমার কাছে ঠিক থাকবে। কোনো চিন্তা করবেন না। কিছুই তো করি না। নয় ওকে একটু ঘুরিয়েই আনলাম"

টনির দিকে আরেকবার তাকাল। হয়ত ঠাওর করতে চাইছিল ওকে ভরসা করা যায় কি না? বুঝতে পেরে টনি বলল "একটুও ভাববেন না। নিশ্চিন্তে থাকুন" ঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁকল "নন্দিনী... নন্দিনী... এখানে আয়"

ততক্ষণে নন্দিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। নন্দিনীর সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে বলল "আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি? ঢাকুরিয়া লেকে?"

কয়েক পলক। নন্দিনী ঠাহর করার চেষ্টা করছিল টনির সঙ্গে যাবে কি না! তারপর হাতটা বাড়িয়ে এগিয়ে এল। টনি ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলল "চল... চল... আমারা বেরু বেরু যাই" নন্দিনীকে কোলে তুলে নিয়ে বেরতে বেরতে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল "কিচ্ছু ভাববেন না। আপানাদের কাজ সেরে নিন। দেখবেন ততক্ষণে আমারা বেরু বেরু করে আবার ফিরে এসেছি"

সেই প্রথম নন্দিনীর সঙ্গে পরিচয়। তারপর যেন প্রতি বিকেলে নন্দিনীকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়াটা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল, খালি পুজোর কয়েকটা দিন আর ইলেকশনের কয়েকটা দিন ছাড়া। সারা বছরের সিগারেট, চা আর গুলতানির খরচা ওই ক'টা দিন থেকেই তো উঠে আসে। সারা বছরের রোজগার। বাদ দেবে কী করে?

একবার ইলেকশনের রেসাল্ট বেরনোর পর টনির আর দেখা নেই। বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। টনিকে আর পাড়াতে দেখা যাচ্ছে না। নন্দিনীর মা বুঝতে পারছিল না, লোকটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেল কী করে? জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ও যে পার্টির হয়ে প্রচার করছিল, তার বিপরীত পার্টি ক্ষমতায় আসায় ওকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে। এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। টনি আর পাড়ায় ফেরত আসেনি।

আর পাঁচ জনের মতো ধীরে ধীরে টনিও হারিয়ে গেল কাকুলিয়া রোডের জীবন থেকে। সব সম্পর্কই মুহূর্তের। চলে গেলে বা হারিয়ে গেলে, কেউ তো আর মনে রাখে না। হয়ত কোনো প্রসঙ্গ উঠলে স্মৃতির পাতা উল্টে পুরনো মুহূর্তকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। জীবন তার নিজ প্রবাহে এগিয়ে যায়। কে রইল আর কে রইল না, কে তার খবর রাখে? একমাত্র প্রিয়জন ছাড়া।

শুধু নন্দিনীই ভুলতে পারেনি তার বিকেল বেলার সাথী টনিদাকে। তার ঘরের গুমোট অন্ধকারের মাঝে সাঁঝের একটুকরো দিয়া। যে দিয়া নিজের অজান্তে জ্বলতে থাকে অবচেতনে। অলক্ষ্যে, মনের নিভৃত কোণে, তার ছোটবেলার সাথীটি যেন আজও কোলে তুলে 'বেরু বেরু' করছে ছোট্ট পৃথিবীর চিলতে ঘর থেকে বিশ্বের মুক্ত বাতাসে।

হারিয়ে গেছে টনিদা।

এখন আর 'বেরু বেরু' করতে যায় না নন্দিনী। একটু বয়স বাড়তেই, অনুভব করছে তার ক্রিয়েটিভ দিকের প্রতি আসক্তি। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার নেশা ছিল। অবসরে একলা ঘরে বসে কাগজ-ক্রেয়ন নিয়ে ছবি এঁকে যাচ্ছে আপন মনে। কিছুটা অস্বভাবিক হলেও রবীন্দ্রসংগীত বা আধুনিক গান নয় - ক্লাসিক্যাল গানের প্রতি ওর একটা টান অনুভব করেছিল মা, তাই তালিম নেওয়ার জন্য স্কুলে ভর্তিও করে দিয়েছিল।

"কী যে সারাদিন ঘরে পড়ে ছবি আঁকিস? অন্যদের মতো একটু বেড়াতে গেলেও তো পারিস" মা ঘরে ঢুকে আক্ষেপের সুরে নন্দিনীকে বলল।

"কে বলল বেড়াতে যাই না? যাই তো। সারাক্ষণ ওই এক চর্বিত চর্বণ আর কাঁহাতক ভাল লাগে? স্ট্যগনেশন আমার ভাল লাগে না। ওই আকাশে ওড়া পাখিদের মতো, ভেসে বেড়াতে আমার ভাল লাগে"

পাগল মেয়েটা। কীসের ছবি আঁকতে চায়? কে জানে?

তার দেখা ক্যানভাসটা তো পূর্ণ। সেটাকে মুছে, শূন্যতার মধ্যে থেকে আবার শুরু করতে চায় না মা। কিছুতেই বুঝতে পারে না সাজান পৃথিবীটা আবার কেন নতুন করে সাজাতে চায় নন্দিনী? বড্ড চিন্তা মেয়েটাকে নিয়ে। আর পাঁচজন যা করে, মেয়ে তা করে না। আর মেয়ে যা করে, আর পাঁচজন তা করে না। তুই কী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য জগতের কোনো এক প্রাণী?

নন্দিনী যেন প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়ি মেলে ধরেছে অচেনা শিশিরের ফোঁটা পড়ার অপেক্ষায়... ভোরের সূর্যে কী কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে, মুক্তর মতো শিশিরবিন্দু হয়ে ঝরে পড়বে? তবু মেয়েটা সেই বিন্দু দিয়েই সিন্ধু তৈরি করতে চায় নিজের স্বপ্নের মায়ায়।

"নে নে ওঠ... আমরা আইনক্সে সিনেমা দেখতে যাব। তারপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে ফুচকা খাব"

ইন্দ্রনীল যেন অচেনা ছন্দকে চেনা সুরে বাধতে চায়। রবিবারের ছুটির দিন। প্রেসিডেন্সির ক্লাস নেই। বন্ধুরা মিলে সিনেমা দেখে হই-হুল্লোড় করবে না তো কখন করবে? কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকে ইন্দ্রনীল। শুধু এক ক্লাসেই পড়ে বলে নয়, মাঝে মাঝে একসঙ্গে বসে হোম ওয়ার্কও সেরে নেয়। কলেজের ফাঁকি দেওয়া পড়াটুকু।

তা বলে রবিবারের বিকেলে ঘরে বসে থাকা! ভাবতেই পারে না।

নন্দিনী উঠে পড়ল। একবার যখন ইন্দ্রনীলের আগমন হয়েছে, ঘর থেকে না বার করে ছাড়বে না। ওর সঙ্গে তর্কে জড়ানোটাই বৃথা।

"তুই বোস। আমি চেঞ্জ করে আসি"

কিছুক্ষণ পরে নন্দিনী যখন সেজেগুজে এল, এ অন্য আরেক নন্দিনী। কালো জিন্স-এর ওপর লাল টপস। ওপরের ঠোঁটটা নীচের থেকে অনেক পাতলা। তার ওপর হাল্কা লিপস্টিকের প্রলেপ। চুল ছুঁয়ে যাচ্ছে কাঁধ পর্যন্ত। ডান হাতের ঘড়িটার সঙ্গে ঝুলছে আরেকটা চেন। চটিটা পায়ে গলিয়ে বলল "চল... চল... অন্যরা কোথায়?"

"রামকৃষ্ণ মিশনের গেটের সামনে অপেক্ষা করছে"

এই নন্দিনীকে ওরা চেনে। এই নন্দিনীকে নন্দিনী নিজেও চেনে। সিনেমাটা বোর। কিছু করার নেই। সবার সঙ্গে এসেছে। এত দাম দিয়ে টিকিট কেটেছে। দেখতেই হবে। হল থেকে বেরিয়ে এলগিন রোড ধরে ওরা চৌরঙ্গির দিকে হাঁটতে লাগল।

সৃজা নন্দিনীর দিকে ফিরে বলল "কেমন লাগল রে?"

"হোয়াট এ বোর। রিভিউ না পড়ে দুম করে সিনেমা দেখতে চলে এলি?"

"রিভিউতে তো ভালই লিখেছিল"

"টাকা খাইয়েছে। এই সিনেমাটাকে তুই ভাল বলবি?"

"আমি ভাল বলছি না। পেপার বলছে"

"গোলি মার পেপারের কথা। এই ভয়েই সিনেমা দেখতে আসি না। একবার বোর সিনেমায় ফেঁসে গেলে কিছুই করার নেই যতক্ষণ না সিনেমাটা শেষ হয়"

"এবার তো শেষ হয়েছে। চল ফুচকা খাই"

ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটু এগিয়ে। ছেলেরা সঙ্গে নেই। পেছন ফিরে তাকাল। দেখল ইন্দ্রনীল আর কয়েকজন পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। সবে কলেজে ঢুকল। এর মধ্যেই সিগারেট। ফুক ফুক করে টান দিচ্ছে।

নন্দিনী দাঁড়িয়ে ওদের দিকে ফিরে বলল "নে... নে... চল চল আর বিড়ি ফুঁকতে হবে না। একটু ফাস্ট হাঁট তো। এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়া যায়!"

ইন্দ্রনীল ও অন্যান্য ছেলেরা এগিয়ে এসে বলল "ছুটির দিনে বিড়ি ফুঁকব না তো কি তোদের থোবরা দেখব?"

নন্দিনী কিছু বলতে যাচ্ছিল। সৃজা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল "নো আরগুমেন্টস প্লিজ। উই আর হিয়ার ফর ফান। নট কম্প্যারিসনস"

নন্দিনীও কম্প্যারিসন একেবারেই পছন্দ করে না। থোবরাটা ভাল না খারাপ সেটা ওর থেকে আর কেউ ভাল জানে না। লক্ষ্য কী করেনি ইন্দ্রনীল কেমন ড্যব ড্যব করে চেয়ে থাকে ওর দিকে। বোঝে না বুঝি - ন্যাকা। এখন দশচক্রে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে হিরোইজম দেখাচ্ছে। পড়াশোনায় ভাল হলে কী হবে? ওই পড়াশোনা আর গুলতানি ছাড়া ও আর কিছুই বোঝে না। আসানসোল থেকে এসেছে। কয়লা ব্যসবসায়ীর ছেলে। ওর কাছে এর বেশি রুচি আশা করাটাই ভুল। তার ওপর মফসসলের লোকেদের কাছে, মায়াবী কলকাতার উপঢৌকন একটা উপরি পাওয়া। নন্দিনীর ছবি আঁকাটা ওর কাছে টোটাল ওয়স্টেজ অফ টাইম ছাড়া আর কিছু নয়। বেশ কয়েকবার সেই নিয়ে কটাক্ষও করেছে।

গরমে ঘেমে নেয়ে যখন বাড়ি ফিরল, মনে হল সারা বিকেলটাই ওয়েস্টেড। অথচ এটাকেই মা বলে স্বাভাবিক জীবন! স্নান সেরে পড়তে বসা। যতই ফুর্তি করুক না কেন, দিনের পড়াটা সেরে ফেলা চাই। নো ব্যাক লগস।

ওর মধ্যেই ভবিষ্যতের স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। অনেক বড় স্বপ্ন দেখে নন্দিনী। জীবনের স্বপ্ন। রেস্টেলনের ইটালিয়ান লেদারে মোরা নরম কাউচে শুয়ে জীবনটাকে এয়ার কন্ডিশন-এর মন জুড়ানো ঠান্ডা হাওয়ায় নিজেকে মুড়ে রাখার স্বপ্ন।

কেউকেটা হতে চায় না। কিন্তু জীবনের সব রং, রস, গন্ধ, ছন্দ, বর্ণ নিংড়ে বাঁচতে চায়। হয়ত নন্দিনীর মতো আর সব মেয়েই চায়। সারাটি জীবন ধরে ফাগুয়ার হোলি খেলে যেতে। সেই হোলির রঙে রামধনুর সাত রং আঁকা হবে আকাশের ক্যানভাসে।

জীবনের তুলি দিয়ে...

কিন্তু আঁকা হয় কী?

দুই

খাজুরাহ .থকে ফেরার পরই গুম মেরে গেছে নন্দিনী।

কথাটা কাউকে বলতে পারছে না বলে বুক ফেটে যাচ্ছে। মা-বাবাকে তো বলা যায় না। এমনকী ইন্দ্রনীলকেও বলা যায় না। এই ক'বছরে, বিশেষ করে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে প্রেসিডেন্সিতে ঢোকার পর থেকেই ইন্দ্রনীলের প্রতি হৃদ্যতাটা অন্য মাত্রা নিতে শুরু করেছে। বুঝতেও পারেনি কবে, কখন, কী ভাবে, বন্ধুত্বটা আন্ডারকারেন্টের মতো কখন মেটামরফসিস হয়ে গেছে। রঙিন মখমলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ইন্দ্রনীলকে নিয়ে।

"কী হয়েছে তোর?"

"কিছু না তো"

"সারাক্ষণ গোমড়া মুখে থাকিস"

"কে বলল?"

"আমি কী দেখতে পাই না?"

ঋতব্রতর দৈহিক লালসার কথা জানলে ইন্দ্রনীল ওই নাচের মাস্টারটাকে যে রাম ঠ্যাঙানি দিত, সে ব্যাপারে নন্দিনীর একটুও সন্দেহ নেই। প্রেগনেন্সির চিন্তাটাও মাথায় ঘোরাফেরা করছে। নেক্সট পিড়িয়ড না হওয়া পর্যন্ত দুরু দুরু বুকে ভয় ভয় আছে। লুকিয়ে একটা প্রেগনেন্সি কিটও কিনে রেখেছে। প্রেগনেন্সি হলে তো জানাতেই হবে। তার আগে কাউকে বিশেষ জানাতে চায় না। তাছাড়া ইন্দ্রনীল জানতে পারলে সম্পর্কে একটা চিড় ধরতে পারে, সে ভয়ও আছে।

"প্রাইজ পেলি বললি, দেখালি না তো"

"এমন আর কী! ওটা তো কনসলেশন প্রাইজ। জিতিনি তো" নন্দিনী খাজুরাহ আর ডান্স ফেস্টিভ্যলের কথা ডিসকাস করতে চায় না।

একবার ভেবেছিল কলেজ ফেস্টের অরগ্যানাইজারদের কথাটা জানায়। তা না হলে, আর কত মেয়ে যে ভিক্টিম হবে, তার ইয়ত্তা নেই। পরে ভাবল, না থাক। জানালেই,

জানাজানি হয়ে যাবে। তার থেকে খাজুরাহর কলুষিত রাতের স্মৃতি, খাজুরাহর হোটেলের বিছানায় মিশে থাক। তাকে কলকাতায় এনে কোনো লাভ নেই। বরং ক্ষতি। একটা কালো অতীতকে বয়ে বেড়াতে চায় না। কালোটা পরে থাক অন্ধকারের গহ্বরে। তাকে আলোয় এনে, আলোর মধ্যে, অন্ধকারের কালো লেপটে দিতে চায় না।

কালিমাখা ক্যানভাসটা মুছে আবার সাদা ক্যানভাসে নতুন ছবি আঁকতে চায়।

"অমন হাঁড়ির মতো মুখ করে থাকিস না তো। কাম অন... লেটস এনজয়" ইন্দ্রনীলের কথায় খেপে উঠল নন্দিনী।

"তোরা ছেলেরা ফুর্তি ছাড়া আর কিছু বুঝিস না" নন্দিনীর কণ্ঠে ঝাঁঝ।

ইন্দ্রনীল বুঝে উঠতে পারল না নন্দিনী এভাবে খেপে উঠল কেন? সে তো তেমন কিছু অশালীন কথা বলেনি। বুঝতে পারল না, এমন অনেক কিছু থাকতে পারে, যা বাইরের লোকের অজানা অথচ নন্দিনীর জানা। জানা তথ্যকে সর্বসমক্ষে আনতে পারছে না বলেই ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে। তার কলা বন্দনা, শিব সূর্যের আরাধনা মাটি করে দিয়েছে ঋতব্রত। তাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতি একটা ঘৃণা ভেতরে ভেতরে জলীয় বাষ্পের মতো, হৃদয় নামক একটা কন্টেনারে বন্দি হয়ে আছে।

মুক্তির অপেক্ষায়...

এটা নন্দিনীর ডিফ্লরেশন নয়। এর আগেও সে ইন্দ্রনীলের সঙ্গে বেশ কয়েকবার জৈবিক মধু চেখেছে। কিন্তু সেখানে একটা পারস্পরিক আবেগ ছিল, চাওয়া ছিল, ভাল লাগা ছিল, ভালবাসা ছিল। কোনো জোর জবরদস্তি নয়। তরুণ প্রাণের নতুন চাহিদার বন্দনা গান। নন্দিনীর কখনও মনে হয়নি, দৈনন্দিন নিত্য চাওয়ার মতো সেক্সটাকে বৈবাহিক বন্ধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখবে। খাওয়া, পড়া, বাসস্থানের মতো, এটাও মানুষের জন্মগত অধিকার।

কিন্তু এভাবে নয়!

প্রথমবারের কথা এখনও ভুলতে পারে না। তখন সবে প্রেসিডেন্সিতে ঢুকেছে। বর্ষাকাল, আকাশটা সকাল থেকেই মেঘলা। মা ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেহালায় মামার বাড়িতে গেছে। বাবা সারাদিনের জন্য অফিসে। ইন্দ্রনীলও কলকাতায় পড়তে তার বাবার কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে পাকাপাকি ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। কলেজের নতুন বন্ধুকে

পাড়ার চত্বরে পেয়ে, ঘনিষ্ঠতাও আরও বেড়েছে। মনটা সব দিক দিয়েই তাই ময়ূরের মতো পেখম তুলে নাচতে চাইছে।

জানলার গ্রিলের পাশে দাঁড়িয়ে, বহুদিন পর বৃষ্টিটা তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মেঘের দৌড় গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হারিয়ে গেছে অচেনার দেশে। নন্দিনীর স্বপ্নের ওয়ান্ডারল্যান্ডে। যেখানে পরিরা পেখম মেলে উড়ে বেড়ায়। যেখানে অনন্ত মেঘমল্লার বাজে স্থান, কাল, সময়ের ঊর্ধ্বে। হাজারটা ছন্দ যেন সারা দেহে শীতল স্পর্শের জলতরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। বুকে এঁকে দিচ্ছে সপ্ত সুরের রামধনুর রং সরগম থেকে নিখাদে। ছোটবেলায় বৃষ্টিতে ভেজা শাড়ির রেখাগুলো যেন ধুয়ে যাচ্ছে শনিবারের দুপুরের ঝিরঝিরে বৃষ্টির জলে। একা বাড়িতে, সেই ছন্দটাকেই ক্যানভাসে বন্দি করতে চাইছে, আকাশে ফুটে ওঠা রামধনুর সাতটা রং-এর বাহারে।

এমন সময় ইন্দ্রনীল হঠাৎ এল। জিনস সার্টটা জলে ভিজে গেছে। বৃষ্টির জলে চুলগুলো লেপটে আছে সারা মুখ জুড়ে।

“এই বৃষ্টিতে?”

“ঘরে বসে একা একা বৃষ্টির দিকে তাকিয়েছিলাম। ভাবলাম একা কেন? তুই তো ছবি আঁকতে ভালবাসিস। তোর সঙ্গে বসে জলছবি আঁকি”

“ছবি পরে আঁকবি। ভেতরে আয়... আগে জামাটা খুলে তোয়ালে দিয়ে গা হাত পা মুছে নে। নইলে ঠান্ডা লেগে যাবে” নন্দিনী তোয়ালেটা ইন্দ্রনীলের দিকে এগিয়ে বলল “নে। বেশি বকবক করতে হবে না। বাথরুমে গিয়ে জামাকাপড় চেঞ্জ করে গা টা পুছে নে”

“আমার জিনসটাও ভিজে গেছে। কী যে করি?”

নন্দিনী তার একটা নাইটি এগিয়ে দিয়ে বলল “এটা পরে বসে থাক। আমি জামাকাপড়গুলো ফ্যানের হাওয়ায় দিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণেই শুকিয়ে যাবে। পাগলা কোথাকার...”

ইন্দ্রনীল বাথরুম থেকে বেরতে, ওকে দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল নন্দিনী। সার্কাসের ক্লাউনের চেয়েও কিম্ভুতকিমাকার লাগছে। ইন্দ্রনীলের জিনস সার্ট ফ্যানের তলায় শুকতে দিয়ে বলল “থোবরাটা একবার আয়নায় দেখেছিস? একেবারে ট্রান্সভেস্টাইট”

'ট্রানভেস্টাইট' শব্দটা শুনে ইন্দ্রনীলের পৌরুষে ঘা লাগল। ওর বাবার পাজামা-পাঞ্জাবিটা দিলে কি এমন কথা বলতে পারত? নিজের নাইটিটা পড়িয়ে ওকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা শুরু করেছে নন্দিনী। সদ্য স্কুলের গণ্ডি পার করেছে। এখন পৌরুষের প্রতিটা ব্যঞ্জনা সরব। সেই পৌরুষকে আঘাত করলে কী মেনে নেওয়া যায়?

"তবে রে..." আচমকা নন্দিনীকে হ্যাঁচকা টান মেরে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে, ঠোঁটে ঠোঁট বসিয়ে দিল। কিছু বোঝবার আগেই অনেকটা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মতো, একটা শিরেশিরে আবেগ সারা দেহে ঝিলিক মেরে উঠল।

বাইরের গর্জনের আগের ঝিলিকটা যেন রামধনুর নতুন রং আঁকতে চাইছে নন্দিনীর সমস্ত দেহে। একটা স্পার্ক। আচমকা ইলেকট্রিক শকের মতো। যার শিহরণ স্পর্শের জায়গা থেকে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। এমন দিনে, পুরুষের আকর্ষণী ছোঁয়া, ঝিলিক মারছে দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায়। এর আগে তো কখনও অনুভব করেনি! এই প্রথমবার, এত কাছ থেকে এমনভাবে ইন্দ্রনীলের দেহের স্পর্শটা অনুভব করছে। প্রতিবাদ! করতে গিয়েও কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছে দেহটা। একটা অচেনা সুখের স্পর্শ যেন স্ফিংসের ট্রেসার চেস্ট থেকে বার করে এনেছে কোনো অজানা পরিকে। কিংবদন্তি ভেনাস যেন নতুন স্তবগানে মুখরিত করেছে তার সমস্ত সত্ত্বাকে।

ঠোঁটটা ওর ঠোঁটে চেপে আঁকড়ে ধরল ইন্দ্রনীলকে। সমস্ত শরীরটা দিয়ে ছুঁতে চাইছে। বুকটা থরথর। সমুদ্রগর্ভে এক বিরল ঘূর্ণি শুরু হয়ে গেছে। এই বুঝি আত্মপ্রকাশ করবে সুনামির আকারে।

করলও!

একবার যখন শিরায় ভলক্যানোর তাপ লেগেছে, সেই তাপ ঝর্নার জলে ভিজিয়ে দিতে না পারলে মুক্তি নেই। পরিত্রাণ নেই। ইন্দ্রনীল শুধুই তার পৌরুষ প্রমাণ করতে চেয়েছিল। নন্দিনী তার বিবস্ত্র দেহ দিয়ে, সেই পৌরুষের ওপর তার নারীত্বের স্ট্যাম্প এঁকে দিল সশব্দ জলপ্রপাতে।

ব্যথা লেগেছিল। কষ্ট হয়েছিল। তাতে কী?

কোনো অপরিমিত সুখ কী ব্যথা ছাড়া আসে?

বাইরে বৃষ্টিটা কিছু ধরেছে। ঝড়ের শেষে স্তব্ধ পরিপূর্ণ তৃপ্তির আবেশ কাটিয়ে অগোছালো জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমের দিকে নন্দিনী। নিজেকে শুদ্ধ করে যখন ফেরত এল, ততক্ষণে ইন্দ্রনীল চলে গেছে।

কিন্তু রেখে গেছে প্রথম পুরুষ স্পর্শের অচেনা রেশ। যেখানে সহস্র সুরে পাখিরা গান গায়, যেখানে হাজার রং-এর মুক্ত-মাণিক্য বেরিয়ে এসেছে, যুগ-যুগান্তরের সযত্নে গোপনে লুকিয়ে রাখা ট্রেসার চেস্ট থেকে প্রকাশ্যে, দিবালোকে। নন্দিনীকে সাজাচ্ছে নারীত্বে অভিষিক্ত করে নতুন আভরণে।

এবার সেই অদেখা নারীরূপ আঁকার পালা।

ক্যানভাসটা টেনে নিয়ে বসল। নতুন করে পূর্ণ নারীর ছবি আঁকতে।

সেদিনের বর্ষার ঘনঘটায় ঝর্নার প্লাবন নিয়ে এলেও আজকের খাজুরাহর বন্যা বেঘর করে দিয়েছে তার শুদ্ধ পবিত্র আত্মাকে। ওইদিন যদি তার পূর্ণ নারীত্বের বিকাশ হয়ে থাকে, আজ সর্বনাশ।

"খেপছিস কেন?" ইন্দ্রনীল বুঝে উঠতে পারছে না, নন্দিনী হঠাৎ এত সেনসিটিভ হয়ে পড়েছে কেন? "এমন কী বললাম?"

"সব সময় ঠাট্টা ইয়ার্কি ভাল লাগে না রে" নন্দিনী ফের ঝাঁঝিয়ে উঠল।

"কী হল রে তোর? এমন খেপে যাচ্ছিস কেন?"

"মন মেজাজ ভাল নেই"

"কেন?"

"সব কথা কী তোকে বলা যাবে?"

"বেশ নয় নাই-ই বললি। তোর যা প্রাণে চায় কর। আমরা আনন্দ-ফুর্তি করব না" নন্দিনীর মুড অফ দেখে, ওকে আর না ঘাঁটিয়ে ইন্দ্রনীল বিদায় নিল।

নেক্সট মাসে নিয়ম মেনে পিরিয়ড হল। এ যাত্রায় বেঁচে গেল নন্দিনী। খাজুরাহর স্মৃতিকে অতীতে ফেলে কিছুদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল। কলেজ পেরিয়ে প্রবেশ করল ইউনিভার্সিটিতে।

"কাম ইমিডিয়েটলি টু এ এম আর আই হসপিট্যাল"

ফোনটা হাসপাতাল থেকেই এসেছিল। কে করেছিল মনে নেই।

রক্তাক্ত দেহগুলো দেখে শিউরে উঠল নন্দিনী। চেনাই যাচ্ছে না। কেমন করে হল? প্রশ্ন করার আগেই ডাক্তারদের মুখ দেখে বুঝতে পারছে ব্যাপারটা সিরিয়স। নিজেকে সরিয়ে আনল রক্তাক্ত দেহগুলি থেকে। উদগ্রীব ভাবে চেয়ে আছে ডাক্তারদের দিকে। ওরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ওদের মধ্যে বয়জ্যেষ্ঠ লোকটি নন্দিনীকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

খুব ধীর, স্থির, শান্ত গলায় বলল "আপনি ওদের মেয়ে?"

মাথা নাড়ল নন্দিনী "হ্যাঁ"

"আপনার সঙ্গে আর কে আছে?"

"কেউ নেই, আমি একা। আমিই ওদের একমাত্র মেয়ে"

নার্সের দিকে ইঙ্গিত করতে, নার্স নন্দিনীর পাশে বসে ওর হাতটা নিজের হাতে নিল।

"আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, দে আর নো লঙ্গার অ্যালাইভ। দে ওয়ার ব্রট ডেড"

ইন্দ্রনীলের সঙ্গে সেদিন যদি বর্ষার ছন্দে ভেসেছিল, আজকে সেই বর্ষাই নিয়ে এল হঠাৎ বজ্রপাত। আচমকা যেন সাজানো পৃথিবীটা ভেঙে পড়ল। নন্দিনীর মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছে না। গা-হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। নার্স হাতে চাপ দিয়ে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিল।

ইনিশিয়াল আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে নন্দিনী আস্তে আস্তে বলল "কী হয়েছিল? আমি তো কলেজ থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম"

ডাক্তার ধীর শান্ত গলায় বলল "যদ্দুর শুনেছি ওরা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে রাস্তা পার হচ্ছিল। হঠাৎই গোলপার্ক থেকে বাঁ দিকে ঘোরা একটা লরি ওদের ধাক্কা মারে। বোধহয় অ্যাটলান্টও-অ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট, মানে ঘাড়ে, সিভিয়ার ভাবে লাগে। ইনস্ট্যান্ট ডেথ। হাসপাতালে যখন নিয়ে এসেছে আমাদের কিছুই করার ছিল না"

একা বসে সে ধাক্কা হজম করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না নন্দিনীর। পরে অবশ্য কান্নাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো লোকের অভাব হয়নি। কেওড়াতলায় শেষকৃত্যের সময়ও অনেকে এসেছিল। ক্রিয়াকর্ম মিটে যেতে, শূন্য ঘরে একা বসে নন্দিনী অনুভব করল, কুমিরের মায়া কান্নার সান্ত্বনাগুলো এক এক করে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। রেখে গেল প্রাণহীন ঘরে একটা শূন্যতার বাতাবরণ।

সেখানে সে একা। সম্পূর্ণ একা। অনাথের নাথের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

বাবার পাওনাগণ্ডা ঠিক করার পর নন্দিনী বুঝতে পারছে, আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এবার তাকে কাজের সন্ধানে বেরতে হবে। কোথায় কাজ? সারা শহরে ভূরি ভূরি গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট একটা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'ক্যচ' থাকা সত্ত্বেও সুরাহা করতে পারছে না। সেখানে তো সে সহায় সম্বলহীন সামান্য গ্র্যাজুয়েট। দেহ বিক্রি ছাড়া তার কাছে আর কোনো পথ নেই। খাজুরাহর রাতের অভিষেক যেন তাকে বারবার হাতছানি দিচ্ছে এক অচেনা পৃথিবীর এন্ট্রেন্সে। এতে ইন্দ্রনীলের দুপুরের সঙ্গমের শান্ত স্নিগ্ধতা নেই। আছে খাজুরাহর রুঢ় বাস্তবের কঠিন ঝলক। ভাস্কর্যের মতোই প্রাণহীন, নিথর।

"এবার কী করবা গো দিদিমণি?" হরিদা জিজ্ঞেস করতে, উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না নন্দিনী।

তিন মাস বিনা ভাড়ায় থাকতে দিয়ে, বাড়িওয়ালা উঠেপড়ে লেগেছে, বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। যেন মানুষের সব প্রেম পিরিত অর্থে সংলগ্ন। অর্থ আর ভবিষ্যৎ না থাকলে যে আবেগ-বিবেক-উচ্ছ্বাস সব কোথায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়! কঠিন বাস্তবের প্রখর রৌদ্রের তাপে মনুষ্যত্বের সূক্ষ্ম দিকগুলো শুকনো পাতার মতো ঝরঝরে হয়ে শুকিয়ে যায়। পড়ে থাকে একটা কঙ্কাল, যে জীবনকে বৃথাই আঁকড়ে ধরে জীবনের স্বপ্ন আঁকতে চায়, কালকের কথা না-জেনে।

"বাড়িটা তো ছেড়ে দিতে হবে হারুদা। তুমি কোথায় যাবে?"

"আমার কি যাওনের জায়গার অভাব আসে? আমি গাঁয়ে গিয়া দিন মজুর করুম। তুমি কী করবা এখন?"

কী করবে বুঝতে পারছিল না নন্দিনী। কলেজে নাম লেখানো আছে বটে, তবে কোনো ক্লাস অ্যাটেন্ড করা হচ্ছে না। আত্মীয় পরিচিতরা সান্ত্বনার পসরা বিলিয়ে, কাজের অজুহাত দেখিয়ে ডুব দিয়েছে। সহায়-সম্বলহীন একটি যুবতিকে করুণা দেখানো যেতে পারে, প্রয়োজন হলে ভোগও করা যেতে পারে, যদি সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু তার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করা অর্থের অপব্যয় মাত্র। সামাজিক প্রগতি বলে কথা! মুখে হিউম্যনিটি

মরালিটির যতই বুলি কপচানো যাক না কেন, কাজে-কম্মে করতে গেলে অনেক ঝক্কি। অতএব সময় মতো মানে মানে কেটে পড়ো।

"ঠিক বুঝতে পারছি না হারুদা"

"আমার সঙ্গে যাবা? আমাগো গেরামে?"

"আমি তো গ্রামে গিয়ে কিছু করতে পারব না। ওখানে থাকিও নি কোনোদিন..."

"দিদিমণি তোমারে দেইখ্যা বড় মায়া লাগে। কোলে-পিঠে কইরা মানুষ করসি। এখন তোমারে ছাইরা যামু কোথায়? কিন্তু তোমার লগে লগে থাকলে যে আমিও তোমার বোঝা হইয়া দারামু"

ফাইনাল ডিসিশন নেওয়ার আগে নন্দিনী ভাবছে। মন বলছে এ শহর ছেড়ে দূরে বহুদূরে কোথাও চলে যায়। যেখানে সে একটা রংহীন অস্তিত্ব - একটা ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাস। যখন ফিরে তাকাবার আর কিছু নেই, সেখানে অতীতকে পেছনে ফেলে একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে আবার নতুন করে জীবন শুরু করে, যেখানে কেউ তাকে চেনে না। নিটোল শূন্য ক্যানভাসে একটা নতুন ছবি আঁকতে। পুরনো নন্দিনীকে পেছনে ফেলে আরেক নতুন নন্দিনী।

"ঠিক বুঝতে পারছি না হারুদা। একটু ভেবে নিই"

দমকা হাওয়াটা নোঙর উপড়ে ভাসিয়ে দিয়েছে জীবন সমুদ্রের মাঝ দরিয়ায়। কোনো মাঝি আর বৈঠা নেই অকুল দরিয়ায় হাল ধরার। সেই অকুল সমুদ্রের ভেঙে পড়া জলরাশির মধ্যে, নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে প্রবহমান স্রোতের গতিপথে।

ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আজকাল বড় একটা দেখা হয় না। ও-ই আর দেখা করে না। নন্দিনী বুঝতে পারছে, ইন্দ্রনীল ক্রমশ দূরে সরে গেছে। হয়ত আগের মতো সে সচ্ছলতা নেই বলেই। পকেটে পয়সা না থাকলে প্রেম-পিরিত সব উবে যায়। ক্ষণিকের উন্মাদনার মোহ, বাস্তবের তপ্ত কঠিন মাটিতে ঝলসে পুড়ে যেতে কতক্ষণ? দুনিয়ার যদি এটা রীতি হয়, ইন্দ্রনীল কোন ছাড়?

তবুও সাহস সঞ্চয় করে একদিন ফোন করল "কী রে? তোর খবর নেই। আমাকে ভুলে গেছিস?"

"নাঃ... ভুলব কেন? পড়াশোনার চাপে সময় করে উঠতে পারছি না। কেমন আছিস?"

“আমি ফোন করলাম বলে প্রশ্ন করছিস। এতদিন তো করিসনি?”

“তুই শোকে ছিলি বলে তোকে আর বিরক্ত করিনি”

“একদিন দেখা করতে চাই”

“কেন?”

“তুই এ প্রশ্ন করছিস! আমাদের সম্পর্কটা কী আজকের?”

“এক সময় সম্পর্কটা ছিল, অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেটা তো তুই-ই নষ্ট করে দিলি”

“আমি আবার কী ভাবে নষ্ট করলাম?”

“নিজেকে বাজারে চড়িয়ে। ভাবছিস আমি কিছু জানি না। তোদের খাজুরাহর লীলাখেলা!”

এতদিন পর, ইন্দ্রনীল জীবনের একটা ফেলে আসা পুরনো চ্যাপ্টারের খোঁজ পেল কী করে?

হোয়েন ইট রেইন্স, ইট পোরস

এখন আর মাঝ দুপুরের নির্মল সুখের বৃষ্টি নয়। এখন দিনে রাতে বাঁধভাঙা প্লাবনের জোয়ারের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে নন্দিনী।

খাজুরাহর মূর্তিগুলো যেন পাষাণের মতোই বিদ্রুপ করছে, তাদের লীলা মাহাত্ম্য নিয়ে বিকৃত পরিহাসে। অতীত কখনও পিছু ছাড়ে না। সে খাজুরাহ থেকে শতাব্দী প্রাচীন চান্ডেলা সাম্রাজ্য। নাই বা হল আরেকটা খাজুরাহ। নাই বা সে গেল খেলাচ্ছলে আর কোনো ডান্স ফেস্টিভ্যাল অ্যাটেন্ড করতে। এক রাতের পৈশাচিক তাণ্ডব তার ক্যানভাসে রামধনু রং দিয়ে আঁকা, প্রাণোজ্জ্বল ছবিটার ওপর ঢেলে দিয়েছে অনন্ত রাত্রির কালি। মুছে দিয়েছে জীবনের রং। কালির প্রলেপ দিয়ে রংহীন অন্ধকারে। যেখানে হয়ত দিয়া জ্বলে। নন্দিনী-ই বুঝি পূজার আরতির নৈবেদ্য ঠিক মতো সাজাতে পারেনি। হাজার চেষ্টা করেও সে কালি মুছতে পারছে না।

ফোনটা নামিয়ে রাখল। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে কথা বলে আর লাভ নেই। চেষ্টা করেও কিছুতেই সে দাগ আর মোছা যাবে না। অনেকটা ভাঙা কাচের মতো। একবার ভাঙলে আর জোড়া লাগে না। এক সহায় সম্বলহীন, একলা মেয়ের সামনে এখন একটাই ধ্রুবতারা - বাঁচার স্বপ্ন।

তার একমাত্র উপায় পুরনো ক্যানভাসটা ছিঁড়ে ফেলে, আবার নতুন ক্যানভাস নিয়ে বসতে হবে। নতুন শহরে। নতুন রং দিয়ে আবার তাকে সাজাতে হবে নতুন আলোকে।

হাজার হোক, সে এক রাডার-শূন্য এরোপ্লেন। তাকে ভেসে থাকতে হবে মাঝ আকাশে, আসল নক্ষত্রের সন্ধানে। ধ্রুবতারাকে সাক্ষী করে। সেই তার জীবনযানের পাইলট। তার বোয়িংকে নিয়ে ফ্লাই করতে হবে ওই দূর আকাশের সীমাহীনতার মধ্যে পূর্ণতার দেবালোকে। যেখানে ব্যথার প্রদীপটাও নিভে গেছে গাঢ় অন্ধকারে। দমকা হাওয়ার ঝাপটে। যেখানে অতীত পৌঁছতে পারে না বর্তমানের সাজানো নতুন ছবির উপঢৌকনে। যেখানে ভবিষ্যৎটাও পাওয়ার অরবিটের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যেখানে এক সূত্রে বাঁধা এক অনন্ত সময়ের ব্যাপ্তির মধ্যে।

আকাশের তারারা যেখানে মিটমিট করে অবিরাম হেসে চলেছে, অবান্তর দিনরাতের খেলা ভুলে। হাসতে হাসতে সহস্র কোটি রং দিয়ে ছবিটা এঁকে ফেলেছে। যা কখনও কেউ মুছতে পারবে না, আর কালি মাখাতে পারবে না, মলিন করে দিতে পারবে না - যুগ থেকে যুগান্তরে।

সেই ইহলোক-পরলোকের মিশ্রণে নিশ্চিন্ত আলো-আঁধারে ছবিটা অম্লান হয়ে থাকবে এক পার্মানেন্ট ক্যানভাসে...

তিন

অনেক . তীক্ষার পর একটা পসিটিভ ই-মেল এল ব্যাঙ্গালুরু থেকে।

বেশ কয়েকদিন ধরেই কম্পিউটারে গুগল সার্চ করছিল। সাহস হয়নি ফোন তুলে কথা বলে। এই জগৎটা এমনিতেই অচেনা। তাও আবার, কলকাতার লোকের কাছে তো বটেই, আরও বেশি করে। ছোটবেলায় স্কুলের মিস্ট্রেস বলেছিলেন 'হোয়েন অল ডোরস ক্লোজ, ওয়ান ডোর ওপেন্স। দ্যট ইজ ইওর ওয়ে' বন্ধ দরজাগুলোতে বারবার করাঘাত করে একটা সত্য উপলব্ধি করেছিল, তার গ্র্যজুয়েসন শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাকে এই কম্পিটিশনের বাজারে বেশি কিছু দেবে না। নিদেনপক্ষে, মামা-কাকার জোর না থাকলে, একটা সাধারণ চাকরি পাওয়াও মুস্কিল।

আর কী কী অ্যাসেট আছে, খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যার ভিত্তিতে সে যে কোনো একটা কাজ পেতে পারে। একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল চোখের নীচে কতটা কালি পড়ে গেছে। নিজেকে দেখতে দেখতে আবার নতুন করে আবিষ্কার করল। খাজুরাহর ভাস্কর্যের কথা এখনও ভোলেনি। ওই বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর্যের থেকে তার দৈহিক মাধুর্য কী কোনো অংশে কম? ওই স্থাপত্য যদি বিশ্বের নজর কাড়তে পারে, সে পারবে না কেন?

জন্মাবার পর জ্যোতিষ বলছিল "শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ভোর চারটে চুয়াল্লিশ মিনিটে জন্ম। এ মেয়ের জীবন আলোয় আলোয় ভরে উঠবে"

নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে কেন এক কোণে পড়ে আছে? বুড়ো ভিখিরির মতো, সারা দুনিয়াটাকে দেখছে ঘসা কাচের একচোখো চশমা দিয়ে - আবছা, ধোঁয়াটে! ঠিক যেমন, বুড়ো ভিখিরিরা সুতো দিয়ে বাঁধা একটা ঘসা কাচের চশমা পরে দেখার চেষ্টা করে। সবাই যেন তাকে ভিখিরির মতোই একলা ফেলে দিয়েছে জীবনের জলসাঘরের বাইরে।

তার মনে হল জীবনের রঙ্গমঞ্চে বেজে চলেছে মহাকালের বৃন্দসঙ্গীত। সেই আসরে মৃদঙ্গের বোল তুলছে নিয়তির অট্টহাস। মন্দিরার ঝংকার তুলছে, সহস্র কোটি সাকসেসফুল মানুষ। অ্যান্ড্রোমিডার বীণার তারে বেজে চলছে তার ফেলে আসা জীবনের

মিষ্টি ধুন। এরপর হয়ত শুরু হতে চলেছে, আগামী দিনের কালপুরুষের মুখনিঃসৃত এক মহাসঙ্গীতের তান। সেই আসরে সবাই আমন্ত্রিত, একমাত্র সে ছাড়া।

মনে হতেই তার দুচোখ জলে ভরে এল। নিজের অসহায়তার দুঃখটা যেন নিশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে গেল শরীরে। তীব্র বেগে ছুটতে লাগল প্রতিটি শিরা-উপশিরায়, তন্ত্রীতে। ছুটতে ছুটতে সেই দুঃখ ক্রমশ বদলে গেল রাগে। এক ভয়ংকর অনির্দিষ্ট রাগ।

কার উপর, ঠিক বুঝতে পারল না।

সমাজের ওপর?

জানে না।

নিয়তির ওপর?

মানতে পারে না।

নাকি অনির্দিষ্ট দিশাহীন ভবিষ্যতের ওপর?

বিশ্বাস করা কঠিন।

"প্লিজ সেন্ড ইওর প্রোফাইল উইথ পিকচারস" ই-মেলটা নতুন পৃথিবীর ডাক।

অজানা জগৎ। অন্ধকারের মধ্যে একটা আশ্রয়ের হাতছানি। যদি লেগে যায়... একটা আশ্রয় জুটলেও জুটতে পারে। কে জানে?

পাঠিয়ে দিল ছবি সহ বায়ডাটা ই-মেলে। একটাই প্রতিজ্ঞা - ইফ হোরডম ইজ হার ডেস্টিনি, সি উড বি দ্য বেস্ট ইন টাউন। ইফ অ্যাস্ট্রলজি হ্যস এনি লজিস্টিকস, সি উড এমিট লাইট ইভেন ইন হার কারসড জব।

কয়েকদিন পর একেবারে সাহেবি কায়দায় উত্তর "উই আর প্লিজড টু ইনফর্ম ইউ দ্যট ইউ হ্যভ বিন সিলেক্টড টু বি এ পার্ট অফ আওয়ার প্রেস্টিজিয়াস অরগ্যনাইজেশন। প্লিজ মেক ইওরসেলফ অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার অফিস ইন ব্যঙ্গালুরু অ্যাস আর্লি অ্যাস পসিবল। ডিস্প্যাচিং ইয়োর ফ্লাইট টিকেটস বাই কুরিয়ার"

ব্যঙ্গালুরুতে পস অফিসে অধীর প্রতিক্ষায়, দুরু দুরু বুকে। ভাগ্যে কী আছে জানে না। শেষ পর্যন্ত হবে তো? একটু পরেই ডাকবে সেই মহান অস্তিত্ব। তার ভাগ্যের নিয়ামক।

যথারীতি ডাক পড়ল। নিয়ে যাওয়া হল তাকে। রহস্যময় এক আলো-আঁধারি বিশাল ঘরে। ঢুকেই কোনায় একটা বড় ডেস্ক। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। ফাঁকা। আগে লক্ষ করেনি, ঘরের এক কোণের সোফা থেকে হেঁটে এল গেরুয়া-হলুদ আলখাল্লায় সর্বশরীর ঢাকা একটা অবয়ব। ঠিক বুঝতে পারল না, পুরুষ বা নারী। যেন কাষায়বস্ত্র পরিহীত পরম কারুণিক বুদ্ধদেব স্বয়ং আজ এই আলখাল্লা পরে তার জীবন-শ্রাবস্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। বেদনার আগুনে ধিকিধিকি জ্বলা তার অস্তিত্বকে দুঃখের বিষ পান করে অমৃতের স্রোতে তাকে ভাসিয়ে দিতে।

নন্দিনীকে আপাদমস্তক দেখে, দৃপ্ত পুরুষ কণ্ঠে, চোস্ত ইংরেজিতে "আই গ্যদার ইউ আর ফ্রম ক্যলকাটা"

লাজুক হলেও, ওর চোখে চোখ রেখেই নন্দিনী জবাব দিল "ইয়েস"

"হোয়াই ইন দিস প্রফেশন?"

"ফর মানি" একটু থেমে, কোনো ভণিতা না করেই "ফর সারভাইভ্যল"

"হু এলস ইজ দেয়ার ইন দ্য ফ্যমিলি?"

"নোবডি। মাই ড্যড অ্যান্ড মাম ওয়াজ কিল্ড ইন এন অ্যাক্সিডেন্ট। আই নিড এ জব উইথ ডিসেন্ট ইনকাম ফর সারভাইভ্যল"

"এনি ডিস্ক্রিসন্স?"

"নো অ্যাকসেপ্ট ওয়ান"

"হোয়াট?"

"আই ওয়ান্ট টু কেটার ফর অ্যান এক্সক্লুসিভ কমিউনিটি। অ্যান্ড নট বি ইনফেক্টেড উইথ এইডস"

ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নন্দিনীর চোখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজার চেষ্টা করছে আসল নন্দিনীকে।

নন্দিনী ভেবেছিল, হয়ত তাকে বিবস্ত্র হয়ে নিজের ঠিকরে পড়া যৌবনের প্রত্যক্ষ ডিসপ্লে দিতে হবে। সেই রকমই গল্পে পড়েছে, ব্লু-ফিল্মে দেখেছে। কিন্তু না। ওই আলখাল্লা পরিহিত মুক্তিদাতা বুদ্ধ সেদিকে গেলই না। ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল "ফাইন। ডিস্ক্রিশন ইজ দ্য এমব্লেম অফ আওয়ার অরগ্যনাইজেশন। আই বিলিভ ইট

ওয়াজ ক্লিয়ারলি মেনশনড ইন আওয়ার টারমস অ্যান্ড কন্ডিশনস” একটু থেমে, দৃপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে “অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই রেসপেক্ট অ্যান্ড হন্যার ইওর উইসেস, ইউ হ্যভ টু রেসপেক্ট আওয়ারস টু”

জিজ্ঞাসু নন্দিনী তাকাল ওর চোখে। ডেস্কের উলটো দিকের চেয়ারে বসে ইন্টারকমটা টিপে অর্ডার দিল “টু কফিস প্লিজ” তারপর নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল “ইউ হ্যভ টু মেইন্টেন এ ডিসক্রিট লাইফস্টাইল হুইচ মিন্স ইউ কান্ট ইন্টারমিঙ্গল উইথ দ্য মাস। ইউ কান্ট বি স্পটেড আউট উইথ দ্য ক্রাউড। আওয়ার ক্লায়েন্টস প্রেফার দ্যট এক্সক্লুসিভনেস”

“অ্যাজ ইউ সে স্যর” সায় দিল নন্দিনী।

একটা মনমোহিনী হাসি, “ইউ ক্যন কল মি স্যর ওর ম্যডাম। মাই নেম ইজ জ্যোতিকিরণ। ইট হার্ডলি মেকস এ ডিফারেন্স। জেন্ডার বায়াস ইস ফর দোস, হু ফাইট ফর দেয়ার রাইটস। আই এঅ্যান্ড মাই অরগ্যানাইজেশন রিপ্রেসেন্ট দ্য আল্টিমেট ডিসায়ার অফ হিউম্যনিটি। অ্যান্ড অল দ্য পিপল হু আর এ পার্ট অফ দিস অরগ্যানাইজেশন, ইজ দেয়ার ফর দ্য সার্ভিস অফ হিউম্যনিটি ইন দেয়ার ওউন ডিসক্রিট ওয়ে। আওয়ার ক্লায়েন্টস আর এক্সক্লুসিভ। সো দোস কেটারিং টু দেম মাস্ট বি এক্সক্লুসিভ টু”

এবার কিছুটা বুঝতে পারছে এই অরগ্যানাইশেনের কর্তাকে। রেজিস্টার্ড এসকর্ট সার্ভিস - আগেই দেখেছিল ওয়েবসাইটে। এখন সাক্ষাতে বুঝতে পারছে তার উভয়লিঙ্গ মালিকের এক্সক্লুসিভনেস অ্যান্ড অথেন্টিসিটি। আদিম প্রফেশনটার সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে সময় সময় ওঠা ঝড়টাকে একটা সামাজিক জায়গায় আনার চেষ্টা এই আপাত-বুদ্ধের কথায় প্রকট। যেমন বলিষ্ঠ তার কণ্ঠ, তেমনই চিন্তাধারা।

ততক্ষণে কফি এসে গেছে।

“সুগার?”

“ওয়ান”

নিজের হাতেই সুগার কিউবটা মিশিয়ে এগিয়ে দিল। কফিটা হাতে নিয়ে সবে চুমুক দিয়েছে, কতগুলো লিগ্যল পেপার ছুড়ে বলল “হিয়ার ইজ দ্য কন্ট্র্যাক্ট। প্লিজ গো থ্রু দেম

অ্যাট ইওর লেসার। সাইন বোথ কপিস অফ দ্য কন্ট্র্যক্ট অ্যান্ড রিটার্ন ওয়ান টু মাই সেক্রেটারি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন”

নন্দিনী লক্ষ করল ওর ভাবলেশহীন মুখটা। কোনো জোরজবরদস্তি নেই। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অফিসিয়াল চুক্তি। নিলে নাও নয়ত নয়। মুক্ত পৃথিবীতে স্ব-ইচ্ছায় এই সংস্থায় জয়েন করো। যে কোনো প্রফেশনল অরগ্যনাইজেশনের মতো।

কফিতে চুমুক দিয়ে “ইফ ইউ এগ্রি, মাই সেক্রেটারি উইল গাইড ইউ অফ দ্য প্রোটকলস অফ দ্য মেডিক্যল এক্সামিনেশন অ্যান্ড আদার নেসেসারি ফরম্যলিটিস”

কফি শেষ। উঠে হাতটা এগিয়ে “হ্যভ এ নাইস ডে”

বেরিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা প্রশ্ন। নন্দিনী জিজ্ঞেস করল “আই ফরগট টু আস্ক ইউ অ্যাবাউট মাই একমডেশন...”

অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে শোনা গেল “ডোন্ট ইউ ওয়ারি। মাই স্টাফ উইল টেক কেয়ার অফ দ্যট। উই হ্যভ আওয়ার ওউন অ্যাপার্টমেন্টস”

যে অন্ধকার কর্নার থেকে এসেছিল, সেই সোফার ওপাশে একটা কাঠের প্যনেল ঠেলে হারিয়ে গেল তার পরিত্রাতা, তার এই মুহূর্তের নতুন জগতের দীক্ষাগুরু, তার আজকের বুদ্ধ।

নন্দিনী জেগে উঠল এক নতুন ভোরে, নতুন সূর্যের রং দিয়ে, এক নতুন ছবি আঁকতে। এ ছবি তো এর আগে কখনও আঁকেনি। এ যেন ফ্রেস ক্যানভাসে নতুন ছবি। ছবিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, জানা নেই। তবু জীবন তাকে সেই ছবিই আঁকতে বলছে। যদি তাই হয়, সে ছবি সে আঁকবে তার সর্বস্ব দিয়ে। নন্দিনী যা কিছু করে, সব কিছুতেই একশো ভাগ উজাড় করে দেয়, কোনো ফাঁকি না দিয়ে। হয়ত সাকসেসটা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। একাগ্রতার মধ্যেই পূর্ণতা। নন্দিনী সেই পূর্ণতার খোঁজে ডুব দিল।

শুধু মেডিক্যল এক্সামিনেশন নয়, এজেন্সির নিয়ম অনুযায়ী অনেক ফটো সেশন সুট করে তার নতুন একটা প্রোফাইল তৈরি করা হল। এই ফটোসুটের মধ্যে অবশ্য পোশাক পরিবর্তন করে কোনো অশালীন কিংবা অর্ধনগ্ন ছবি কিন্তু তোলা হয়নি। প্রত্যেক ছবি রুচিশীল ডিসাইনার ড্রেস পরিহিত। যদিও এই ডিসাইনার ড্রেসের আড়ালে তার ভাইটাল স্ট্যটিস্টিক্স বুঝে নিতে সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের কোনো অসুবিধাই হবে না। সেই সঙ্গে শিক্ষাগত

যোগ্যতা থেকে তার বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার কথা, নৃত্যশৈলী থেকে ক্লাসিক্যল শিখে বড় হয়ে ওঠা, কোনো কিছুই বাদ গেল না।

নন্দিনী বুঝতে পারছিল এই এক্সক্লুসিভ এজেন্সিতে, এক্সক্লুসিভ ক্লায়েন্টদের জন্যই তাকে তৈরি করা হচ্ছে। যে এক্সক্লুসিভ ক্লায়েন্টদের সে কেটার করবে, তাদের বায়ডাটা যাতে গুগল সার্চ করে আগে জেনে নিয়ে, তবেই ক্লায়েন্টের কাছে যাবে।

কিন্তু তার প্রথম ক্লায়েন্ট কুলদীপের সম্বন্ধে গুগল সার্চ করে তেমন কিছুই পেল না। খালি একটা লিঙ্কডিন প্রোফাইল - সেখানে নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখাই নেই। খালি ফিল্ম-ডিরেক্টর ছাড়া। মনে করার চেষ্টা করল, এর আগে কোথাও নামটা শুনেছে কি না! মনে করতে পারল না। প্রথম ক্লায়েন্ট তেমন হোমরাচোমরা কেউ নয়। হয়ত ইচ্ছে করেই, ফিল্টার করে, ওরা নন্দিনীকে তেমন কোনো হোমরাচোমরার কাছে পাঠায়নি।

এজেন্সির নিয়মটা খুব স্বচ্ছ। ওয়েবসাইটে কাউকে দেখে পছন্দ হলে ক্লায়েন্টদের অন-লাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার সময় ক্রেডিট কার্ডে পুরো পেমেন্ট করে দিতে হয়। তাই নন্দিনীর অন্তত টাকা পয়সা কালেক্ট করার বালাই নেই। যেহেতু সে নতুন এবং এখনও কোনো স্টার রেটিং নেই, তার রেটও সবার থেকে কম। পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরো সন্ধের জন্য। সিনিয়র লোকেদের রেট অনেক বেশি। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা, ওভারনাইট হিসেবে। তার আয়ের ফিফটি পার্সেন্ট এজেন্সি রেখে, তাকে ফিফটি পার্সেন্ট দেবে।

পঁচিশ হাজার দিয়ে বউনি, মন্দ কী?

প্রথম ক্লায়েন্ট। ভয় বুকটা দুরু দুরু করছে। সেদিনের ইন্টারভিউটা আসল পরীক্ষা ছিল না। আজকেই তার আসল অভিষেক।

তাজ ওয়েস্ট এন্ড। সিটি সেন্টারের কাছে ওল্ড রেস কোর্স রোডে অফিসারস কলোনির ভিক্টোরিয়া লে আউটে গলফ ক্লাবের পাশে। বিশাল গার্ডেনের ওপর দিয়ে গাড়িটা ২২ নম্বর সুইটের দিকে এগিয়ে চলেছে। নন্দিনী লক্ষ করল একটা প্রাচীন বটগাছ।

ঢোকার সময়ই, এন্ট্রেন্স রিসেপসন থেকে ক্লায়েন্টের কাছে খবর পৌঁছেছিল। গাড়ি থেকে নামবার আগে নন্দিনী নিজের বেশভূষা আরেকবার ঠিক করে নিল। একটা সাদা ফুল লেংথ র‍্য সিল্কের গাউন। ঝলমল করছে স্বরাভস্কি ক্রিস্টাল বসানো কাজ। মুক্তোর হার। পড়ন্ত আলোর ফেলে আসা রোশনাই ঠিকরোচ্ছে। তার ঔজ্জ্বল্য জাগাতে পারে

শিহরণ। প্রথম ক্লায়েন্টের কামনার বাসরে নন্দিনীকে দেখলে মনে হবে, সে যেন এক স্বতন্ত্র নক্ষত্র। নিজ মহিমায় হাজির হয়েছে হাজার তারার দরবারে।

বেল বাজাতেই দরজা খুলে এক মধ্যবয়সি। ফরটিস-এর ওপারে। জুলফির কোণে কয়েকটা পাকা চুল। উঁকি দিচ্ছে। চুলগুলো ভেজা। ফরসা শরীর। খাকি হাফ প্যান্ট আর সাদা সার্টের ওপর তোয়ালে। সদ্য স্নান সেরে দাঁড়িয়েছে।

একটা আন্তরিক স্মাইল দিয়ে কুলদীপ সিং বলল "প্লিজ কাম ইন। আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং ইউ"

এক্সিকিউটিভ সুইটটা একটা ফ্ল্যাটের সমান। অন্তত তার কাকুলিয়া রোডের বাড়ি থেকে খুব ছোট নয়। নন্দিনী চেয়ে আছে অনেক এলোমেলো ভাবনা নিয়ে। ড্রয়িং রুমে সোফা ছাড়াও বিশাল এইচ ডি কালার টিভি। ওপাশের খোলা বারান্দায় কয়েকটা বেতের চেয়ার আর সোফা। কুলদীপ বলল "মেক ইওরসেলফ কমফরটেবল ইন দ্য ভারান্ডা, হোয়াইল আই জাস্ট ফ্রেশেন আপ"

বেডরুমে হারিয়ে গেল কুলদীপ।

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে গার্ডেনের একাংশ দেখা যায়। শহরের মধ্যে এই প্রকৃতির ছোঁয়া যেন একটা অন্য মাত্রা এঁকে দিচ্ছে। ইফ ইউ নিড টু রিল্যাক্স আফটার এ হেভি ডে, হোয়াট বেটার প্লেস ক্যন দেয়ার বি, দ্যন দিস ওয়ান?

স্বপ্নের পৃথিবী। আগে নন্দিনী দেখেনি।

একদিন এমনিভাবে হারিয়ে যেতে চেয়েছিল ইন্দ্রনীলকে নিয়ে স্বপ্নের জগতে। যেখানে প্রকৃতির মধ্যে সে নিবিড় আবেগে আঁকড়ে ধরতে পারবে তাকে। উষ্ণ আবেগে কথা থেমে যাবে। দেহের স্পর্শ রোমাঞ্চের শিহরণ জাগাবে প্রতিটা কোষে। এই ঘাস, এই গাছ, এই ফুল, এই রিল্যাক্সিং সবুজের মধ্যে। একটা স্বপ্ন দিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকতে চেয়েছিল। স্বপ্নের ছবি।

কিন্তু না...

স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে বিরাট ফারাক। আজকেও সেই ঘাস, গাছ, ফুল সবই আছে। শুধু ইন্দ্রনীল নেই। স্বপ্নটা হারিয়ে গেছে।

"হোয়াট ড্রিঙ্ক উড ইউ প্রেফার?" গলার শব্দে ফিরে তাকাল।

কুলদীপ ড্রেস কিছুই পাল্টায়নি, খালি চুলটা আঁচড়ানো ছাড়া। ভেসে আসছে একটা মিষ্টি সুবাস। শ্যনেল? না রোসাস? না ডিওর? নন্দিনীর ঘ্রাণে সেই তীক্ষ্ণতা নেই, যে পার্থক্যটা বিচার করবে।

কুলদীপ ঘরের ছোট্ট বারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রথমবার। কোনো অঘটন ঘটাতে চায় না। মিষ্টি হেসে বলল "বিয়ার"

"অ্যান্ড সামথিং টু গো উইথ..." একটু থেমে "এনিথিং দ্যট ইউ ডোন্ট ইট?"

"আই হ্যভ নো ফ্যডস"

"লেটস স্টার্ট দ্য ইভিনিং উইথ সাম মোমোস অ্যান্ড প্রন ককটেল স্যালাড"

মাথা নাড়ল নন্দিনী। কুলদীপ উলটো দিকের চেয়ারটা টেনে বসে বলল "আই লিভ ইন দেলহি। হোয়েনেভার আই অ্যাম ইন ব্যঙ্গালুরু আই প্রেফার দিস হোটেল। ইটস নিয়ার দ্য সিটি সেন্টার অ্যান্ড ইয়েট সো শিরিন। দ্য গ্রিনারি ইন ফ্রন্ট হ্যস ইটস ওউন চার্ম। আফটার দ্য হোল ডেইস ওয়ার্ক, আই লাভ মাই ড্রিঙ্ক গেজিং অ্যাট দ্য গ্রিনারি"

নন্দিনীকে চুপ দেখে, ওর দিকে তাকিয়ে বলল "হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? আই গ্যদার ফ্রম দ্য এজেন্সি দ্যট ইউ আর এ ফ্রেসার। আই লাভ ফ্রেসারস" তখনও নন্দিনী চুপ করে আছে। আবার প্রশ্ন করল "আই হোপ ইউ আর নট এ ভার্জিন?"

মনে বোধহয় একটা সংশয়। নন্দিনী বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলল "রিল্যক্স। ইউ উইল লেটার রিয়েলাইজ আই এম নট এ ভার্জিন। আই ওয়াজ জাস্ট লিসনিং টু ইউ। দ্যট ডাসন্ট মিন আই অ্যাম ডাম্ব"

খুশি হল কুলদীপ। একজন বোবা সুন্দরীর সঙ্গে সারা সন্ধে কাটাবার কোনো অভিপ্রায় নেই তার। নন্দিনী বুঝতে পারছে কনভারসেশন চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা এখানে আলোচনা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ফর্ক দিয়ে মোমোটা কেটে মুখে পুরে বলল "দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়াং টু লিসন টু মাই স্টোরি। হোয়াট আর ইওর ইন্টারেস্টস?"

নন্দিনীর কথা টেনে নিয়ে কুলদীপ বলল "সামিথিং অ্যাকিন টু ইওরস"

"হাউ ডু ইউ নো হোয়াট ইজ মাইন?"

"ইট ইজ রিটেন ইন ইওর প্রোফাইল। ইউ আর এ ক্লাসিক্যল ডান্সার"

আশ্চর্য। লোকটা শুধু ফুর্তি করতেই আসেনি। তার সম্বন্ধে রীতিমত হোম ওয়ার্ক করে এসেছে। একটু হেসে নন্দিনী বলল "ওয়েল নট অ্যান এক্সপোনেন্ট। আদারওয়াইজ আই উডন্ট বি হিয়ার। বাট আই হ্যভ ওয়ান এ ফিউ অ্যাওয়ার্ডস"

"একচুয়ালি আই মেক মিউসিক ভিডিওস। অফকোরস নট এনি ক্লাসিক্যল ওয়াঙ্গ। দে ডোন্ট সেল। ইট ইজ এ বিট অফ ডান্স উইথ ইরটিক টিটিলেশন"

ক্লায়েন্ট ভাড়া করে এনেছে। চুপ করে কথা শোনাটাই কাজ।

এই বাজারে কড়কড়ে পঁচিশ হাজার টাকা কে দেয়?

কুলদীপ বলে চলেছে "আই অ্যাম হিয়ার ইন ব্যঙ্গালুরু টু ফিক্স আপ এ ফিউ ডিলস"

খুব ভাল কথা। এই ইরটিক ভিডিও ইন্ডাস্ট্রিতে তো মেয়ের কমতি নেই। নিজেকে জাহির করার জন্য আজকালকার মেয়েদের কি শুতে কোনো দ্বিধা আছে? তবে ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে তাকে তলব কেন? সেটাই ঠাহর করে উঠতে পারছে না। হতেও পারে হয়ত ব্যঙ্গালুরুতে তেমন কেউ নেই।

সূর্য আস্তে আস্তে ঢলে পড়েছে পশ্চিম প্রান্তে। আলো-আঁধারির সন্ধিক্ষণ যেন অন্য এক সুর শোনাচ্ছে। সেটা রাগ কল্যাণের সুর নয়। আজকের ঝংকার বিটস। সেখানে বিথভেনের সোনাটা নেই, নিখিল বন্দ্যপাধ্যায়ের রাগ ভূপালির আবেশ নেই, আছে ধীরে ধীরে জমে ওঠা ভডকার নেশা। যতক্ষণ না চেনা পথ ঘুরে দাঁড়ায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে। চেনা মোহনার শেষ হওয়া সময়ের সীমানায়। ততক্ষণ কথা চলবে। রাতের আকাশে চাঁদ হয়ত উঠবে। মোহহীন ব্যবসায়।

তারই প্রতীক্ষায় সময় গুনছিল। কুলদীপ ভডকার নেশায় বলে চলেছে "হোয়াই ডোন্ট ইউ বি এ পার্ট অফ মাই ভিডিও সুট?"

মালের ঘোরে অনেকে অনেক কিছু বলে। নন্দিনী জানে কাল সকালে সব ভুলে যাবে। বেশি খেলে কিছু করতে পারবে না। কাজটা যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারে তত তাড়াতাড়ি ছুটি। কুলদীপ কথা বলতে চায়। নন্দিনী যা দিতে এসেছে, মিটিয়ে বিদায় হতে চায়।

"উই ক্যন টক অ্যাবাউট ইট সাম আদার টাইম" নন্দিনী চেয়ার ছেড়ে ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে বলল "আই ওয়ান্ট টু পি। হোয়ার ইজ দ্য টয়লেট?"

"বিসাইড দ্য বেডরুম"

স্ক্যণ্টিলি ক্ল্যাড নন্দিনী বেডরুমের কুইন সাইজ বেডের ওপর নিজেকে বিছিয়ে বলল "ওন্ট ইউ মেক লাভ টু মি?"

প্রথম ক্লায়েন্ট। প্রথম ডেট। প্রথম অভিজ্ঞতা। নতুন পথের দিকে নতুন রং দিয়ে আঁকতে চাইছে ফেলে আসা, মুছে ফেলা ক্যানভাসটাকে। শূন্য ক্যানভাসে আঁকতে চাইছে আর এক না-আঁকা ছবি। নিজের না-দেখা চিত্রমালা। যে ছবি শুধু সে-ই চেনে, আর কেউ নয়। এটাও জীবনের আরেকটা দিক। তার নারী সত্ত্বার আরেকটা স্বতন্ত্র চিত্রপট।

নেক্সট কল। আবার নতুন খেলা। আবার নতুন বেশে সাজা। ঠিক ক্যালিডিওস্কপের মতো নিজের নিত্য পরিবর্তনটা মন্দ লাগছে না। তার সঙ্গে বিভিন্ন পুরুষকে নতুন নতুন আঙ্গিকে দেখা। এজেন্সির ওয়েবসাইটে রেটিং লিস্টে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে নন্দিনী। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ থেকে লাখ ছাড়িয়ে দু-লাখের দিকে। এর মধ্যে কিছু ফিক্সড ক্লায়েন্টও তৈরি হয়েছে। যেমন বিশ্বনাথ।

ইন্দ্রনীলের সঙ্গে যে সেক্সটা ছিল প্রাণের, আজ যেন সেই প্রাণটাই নেই। হায় রে বাৎস্যায়ন! এত ভঙ্গি এঁকেও মনের ছবিটা আঁকতে পারলি না। তবে কী শেখালি আপামর পুরুষ-নারীকে?

বিশ্বনাথের মৃত্যুর পরে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল নন্দিনী। এজেন্সির মালিক জ্যোতিকিরণ তাকে ফোনে আশ্বস্ত করেছিল "ডোন্ট ইউ ওয়াড়ই। উই উইল হ্যন্ডল ইট প্রফেশনালি সো দ্যট ইওর ইমেজ ইজ নট টারনিসড"

"আই নো" নন্দিনী বলল "বাট আই অ্যাম ওয়ারিড অফ দ্য পুলিস ইনভেস্টিগেশন"

গম্ভীর জ্যোতিকিরণ "আইল সি টু দ্যট, পুলিস উইল নট বদার ইউ"

জ্যোতিকিরণ সে ক্ষমতা রাখে। বিশ্বনাথের মৃত্যু থেকে নয় রক্ষে পাওয়া গেল, কিন্তু নিজের কাছ থেকে পালাবে কী করে? একটা দ্বন্দ্বে দোলায় যখন দুলছে, ঠিক সেই সময় এক বাংলাদেশি ক্লায়েন্টের মুখোমুখি হল।

এরশাদ সাহেব।

পঞ্চাশের ওপরে বয়েস। কাঁচা পাকা জুলফি। ডিকেনসন হোটেলের রয়াল অর্কিড সেন্ট্রাল। সাড়ে পাঁচ ফুট। ছোটখাট মানুষটা যখন নন্দিনীকে দরজা খুলে দিল, পরনে

সিল্কের লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। গুগল সার্চ করে ওর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি। তবুও তো বাঙালি। তার এই ব্যঙ্গালুরুর জীবনে এর আগে কখনও বাঙালি ক্লায়েন্ট পায়নি। এই প্রথম। তাই স্বভাবিকভাবে একটা কৌতূহল ছিল। অনেকদিন পর বাংলায় কথা বলা যাবে।

একটু চড়া হলুদ রং-এর বডি হাগিং সালোয়ার কামিজ। বাংলাদেশিরা একটু চড়া রং পছন্দ করে। প্রথমে ভেবেছিল ঢাকাই শাড়ি। ওয়ার্ডরোব থেকে বারও করেছিল। পরতে যাবে, হঠাৎ মনে হল, এ কী! এসকরট রাতে সহবাস করতে যাবে ঢাকাই শাড়ি পরে! কথাটা মনে হতেই পাগলামো দেখে নিজের মনেই হেসে ফেলেছিল। হলুদ সালোয়ারের মধ্যেও যেন অনাড়ম্বরের আড়ম্বর। বেশী প্রসাধন নেই। নন্দিনী তার সৌন্দর্যের মাধুর্যে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। এই অন্ধকার জীবনে সে যেন অজানা নক্ষত্রের আলোকের দীপশিখা। যা পরশপাথরের মতো দিয়া হয়ে টিমটিম করে জ্বলছে কোন এক অজ্ঞাত আকাশে।

“আসো। তোমার অপেক্ষাতেই সিলাম। এই লাইনে তো বাঙালি বড় একটা দেখি নাই। তোমার প্রোফাইল দেইখ্যা তাই পসন্দ হইল”

স্যুটের সোফায় নন্দিনী বসতেই এরশাদ সাহেব ব্যস্ত “নাস্তা করতে হইব তো। কী অর্ডার দিমু?”

“আপনার যা খুশি”

“সন্ধ্যাবেলা আমার আবার হুইস্কি সারা চলে না। তুমি হুইস্কি খাও তো?”

মাথা নাড়ল নন্দিনী।

“সঙ্গে একটু মাছভাজা কই?”

“আপনার যা ভাল লাগে”

এরশাদ মুখোমুখি বসে বলল “আমি বাংলাদ্যশের একটা টিভি চ্যানেলের মালিক। ব্যঙ্গালুরুতে সে কাজেই আইসি। একা একা সারা সন্ধ্যা কাটামু। তাই ভাবলাম তোমারে ডাইক্কা লই কথা কওনের লাইগ্যা। তুমি যা ভাইব্যা আইস ওসব কিসু নয়। মন খুইল্যা একটু বাংলায় কথা কইমু, এই আর কী”

আশ্বস্ত নন্দিনী। অন্তত আজকের দিনটা পোশাক ছাড়াই কোনো বিকৃত শখ মেটাতে হবে না। সব কিছুতে যেমন বিশ্রাম লাগে, তারও তো বিশ্রামের প্রয়োজন। আজ তার

দেহের ছুটি। ছুটির দিনেও দু-লাখ। এক-লাখ এজেন্সিকে কমিশন দিলে হাতে রইল এক। শুধু কথা বলার জন্য এক-লাখ কে দেয়?

"এ সারা আর তোমার শখ কী কী?"

"এক সময় ক্লাসিক্যল গান শিখেছিলাম। নাচটা সেরকমভাবে শেখা হয়ে ওঠেনি। যদিও কয়েকটা প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছি। এখন শখ বলতে একটাই, ছবি আঁকা" এয়ার কন্ডিশনরে একটু শীত। ওড়নাটা মাথায় জড়িয়ে বলল।

"সবি? কী সবি আঁক?"

"যা ভাল লাগে তাই"

"এই কাজ করতে মন চায়?"

প্রশ্নটা যে কোনো একদিন আসবে নন্দিনী জানত। এরশাদের মুখে প্রশ্নটা শুনে এই কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটাকে ভাল লাগতে শুরু করেছে। কোথায় যেন একটা পিতৃসুলভ আচরণ।

বাবাকে মনে পড়ছে। কত সুন্দরই না ছিল কাকুলিয়া রোডের ছোটবেলার দিনগুলো। না চাইতেই জীবনের ক্যাসিনো হঠাৎই চাকতিটা ঘুরিয়ে দিল। যত টাকাই রোজগার করুক না কেন, দিনের শেষে মন যেন সেই স্বাভাবিক স্বচ্ছ সুন্দর জীবনটাই খুঁজে বেড়ায়। বুঝতে পারছে এরশাদ সেই জায়গাটাই নাড়া দিয়ে গেছে।

এরশাদের চোখে চোখ রেখে বলল "কে আর চায়?"

"তবে ক্যান?"

"বেঁচে থাকার জন্য তো টাকার প্রয়োজন"

ততক্ষণে মাছভাজায় কামড় দিয়ে এরশাদ হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল "হুইস্কি খাও?"

"এমনি খাই না। তবে ক্লায়েন্টের সঙ্গে থাকলে একটু-আধটু তো খেতেই হয়..."

হুইস্কির গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল "আজ আমার লইগ্যা একটু খাইয়া লও। পরানটা একটু জুড়াইয়া লও"

যদি হুইস্কি খেয়ে প্রাণটা জুড়াত! কেউ কী কখনও হুইস্কি খেয়ে নিজের থেকে পালাতে পারে? নন্দিনীর জানা নেই। তবুও অনেকেই দেবদাস হতে চায় নিজের থেকে পালিয়ে বেড়াতে।

হুইস্কিতে চুমুক, ভাজা মাছে কামড় দিয়ে নন্দিনী বলল "এভাবে কী ভোলা যায়?"

"ঠিক কইস। এভাবে ভোলা যায় না"

নন্দিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ করুণা হল। মনে হল কক্সবাজারে তার মেয়ের কথা। মনে মনে মেয়েকে মিস করছিল। তাই কী নন্দিনীকে ডেকে আনা? এরশাদ একটু আনমনা হয়ে নন্দিনীর থেকে চোখ সরিয়ে জানলার বাইরে আলোকিত শহরটার দিকে তাকিয়ে উদাস।

মায়াবী শহরটার রাতের আলোগুলো কোনো স্বপ্নের পসরা সাজাচ্ছে না। রূঢ় বাস্তবটাকে যেন আরও বেশি করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। সেটা মধ্যরাতের নেশায় বুঁদ হওয়া কোনো ইলিউশন নয়। বাস্তবটা সাবিনার সুখের কুশনে শুয়ে কক্সবাজারের এসির নিশ্চিন্ত আশ্রয় নয়। সামনে, তার চেয়ে কিছু বড় মেয়েটির চোখে যেন সে হঠাৎ সাবিনাকেই দেখতে পাচ্ছে। নন্দিনীর কাজল কালো গভীর দৃষ্টির মধ্যে কোনো উষ্ণ মাদকতা নেই, বরং স্নিগ্ধ চোখদুটো যেন কিছু বলতে গিয়েও অব্যক্ত, চিত্রবৎ।

"আমার লগে কাম করবা?"

হকচকিয়ে গেল নন্দিনী। এভাবে প্রশ্নটা আসবে ভাবতেই পারেনি। এরশাদের গ্লাসের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই চোখের দিকে। বেশি খেয়ে ফেলেনি তো? আগেও দেখেছে হুইস্কির নেশা মাথায় চাপলে প্রত্যেকেই বেশ উদার হয়ে যায়। পরের দিন নেশা নামতে ভুলেই যায় আগের দিন কী বলেছে।

নন্দিনী তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না বুঝতে পেরেই আবার প্রশ্ন "আমার লগে কাম করবা?"

এবার বোঝা গেল লোকটা নেশার ঘোরে নেই। সত্যি সত্যি কিছু বলতে চাইছে। শিওর হওয়ার জন্য প্রশ্ন করল "মানে?"

"আমার চ্যনেলে একজন আর্ট ডিরেক্টরের প্রয়োজন। তুমি কইলা না সবি আঁকা তোমার নেশা? আমার চ্যনেলে আর্ট ডিরেক্টরের কাম করবা? এই কামে টাকা সারা ভবিষ্যৎ নাই। আমার লগে কাম কইরলে একটা নতুন জীবন নিয়া বাঁচতে পারবা"

এভাবে জীবনের ক্যসিনোর চাকতিটা হুট করে ঘুরবে ভাবতেও পারেনি। কয়েক মুহূর্ত। কে যেন ভেতর থেকে বলল, যা সামনে আসে সেটাই আগামী দিন। চলার পথে সে ছবিটাই আঁকতে হবে। সে যে ছবি আঁকতে চায়, জীবন তাকে সে ছবি আঁকতে দেবে না। চেষ্টা করেও, বারবার ক্যানভাসে রং ছড়িয়েও, ছবিটা শেষ করতে পারছে না। হয়ত কোনোদিন ক্যানভাসটা পূর্ণ হবে, জীবন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া হাজার রঙে। আপাতত ক্যানভাসের ছবির কথা না ভেবে রং সংগ্রহ করা যাক।

"বাংলাদেশে?"

"ঢাকায়। ওই খানেই তো আমার ঘর। কিসসু চিন্তা কইর না। ভিসা, থাকার জায়গা সব আমাগো কম্পানি বন্দোবস্ত কইরা দিব। যাইবা কি না কও?"

কে যেন ভেতর থেকে বলল 'লুফে নে... জীবন তোকে রং-এর ভেলকি দেখাচ্ছে। দেখে নে। দেখতে দেখতে দেখবি কোনোদিন জীবনের পথে রং কুড়তে কুড়তে আসল রংটা খুঁজে পেয়ে যাবি। রামধনুর সাতটা রং মিশিয়ে আরও কত রং তৈরি করা যায়! হয়ত সব রং মিলিয়ে, একদিন শেষে ক্যানভাসে ছবিটা এঁকেই ফেলতে পারবি'

সত্যিই তো। এই কী আলোর জীবন? টাকা রোজগার করলেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, সে এক গভীর খাদের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। যেখানে প্রাণ আছে, মান নেই; সুখ আছে, শান্তি নেই; প্রাচুর্য আছে অথচ ভোগের অবকাশ নেই। এ জীবন তার হতেই পারে না। হয়ত একটা মাত্র রং দিয়ে আঁকা ছবি। কিন্তু এ ছবি তো তার নয়! তার ছবি তো সপ্ত রং-এ তুলির স্পর্শে ফুটে উঠবে নানা বর্ণে। সব বর্ণই যে রঙিন হবে, এমন নয়। ধূসরও হতে পারে। কঠোর ধূসর মায়াজাল। কঠোরতার সঙ্গে আগেও দেখা হয়েছে। আবার নয় কঠোরে কোমলে আরেকটা গ্যম্বলিং ডেনে গিয়ে ক্যসিনোর কোনায় বসে চাকতি ঘোরাবে। রাতে বিবস্ত্র হয়ে মাতালদের অতৃপ্ত খিদের কাছে তো অহরহ নিজেকে সঁপে দিতে হবে না!

সারা জীবন ধরে হারের খেলাই তো খেলে গেছে। যখনই জেতার বাজি ধরেছে, তখনই হার পিছনে তাড়া করেছে। জীবন যে গোলাপের, মখমলের বিছানা নয়, সেটা বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর-ই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু সারাটা জীবন কাঁটার মালা পরে বাঁচতে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই? স্বপ্ন যখন মরীচিকা – এই বিশাল মরুভূমির মধ্যে একটুকরো

জলের খোঁজ করতে বাধা কোথায়? স্বপ্ন যেন তার দেশের যাদুকাঠিটা বুলিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে মায়াবী এক রোশনাইতে। ছোট্ট হাতটা বাড়িয়ে বসে আছে তারার দিকে চেয়ে, কবে আবার আলো জ্বালাবে অন্ধকারের বুকে? কবে তারাগুলো নেমে আসবে মাটিতে? কবে চুমু খেয়ে আদর করে বুকে তুলে নেবে মায়ের মতো ছোটবেলার ঘুমপাড়ানি গানে?

সেই মরীচিকাকে পাথেয় করে, আজও এগিয়ে চলেছে তারার স্বপ্নের কল্পনায়...

যে কল্পনা প্রতিটা মানুষকে ঘিরে জল্পনা দেখায়, সেই অমলিন শান্তির দূত হয়ে চাওয়াটা হাতছানি দিচ্ছে মহাবিশ্বের তাপহীন আকাশে। একটা অখণ্ড পাওয়ার স্বপ্নের নির্মল স্রোতে। ক্লেদাক্ত, বিষাক্ত দেহটাকে পেছনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে – যেখানে অনাবিল অন্ধকারের মধ্যেও আলোর ফ্লাড লাইটে ভরে যায় অস্তিত্বের প্রতিটা কণা।

সেই স্বর্গটাকে খোঁজবার সময় হয়েছে...

“যাব। তবে একবার জ্যোতিকিরণের সঙ্গে কথা বলতে হবে”

চার

এ এক অন. জগৎ।

ব্যাঙ্গালুরুর হাই প্রোফাইল ক্লায়েন্টদের সঙ্গে স্টার হোটেলে সন্ধে কাটানোর থেকে ঢাকার ধানমুন্ডির এরশাদ সাহেবের দেওয়া ফারনিসড ফ্ল্যাট। ছিমছাম দু কামরার নিজের একাকী আশ্রয়। জানলা দিয়ে তাকালেই সামনে ধানমুন্ডি লেকের মনোরম দৃশ্য। রাতে জেগে থাকতে হয় না, নিজের বিছানায় নরম বালিশে নিশ্চিন্ত রিট্রিট। সারাদিনে আর বাড়ি থাকে কোথায়? নয় চ্যানেলের স্যুট নিয়ে ব্যস্ত, নয় আউটডোরে বেরিয়ে যেতে হয় কোনো স্টোরি করার জন্য। অনেক সময় বেশ কয়েকদিনের জন্য। তখন তালাবন্ধ পড়ে থাকে শূন্য ফ্ল্যাটটা।

"সব ঠিকঠাক আসে তো? আমাগো বাংলাদ্যশের লগে একটু মানাইয়া লইতে হইব। আমারে সব সময় পাইবা না। কোনো দরকার হইলে জেনারেল ম্যনেজাররে কইয়া দিও। আমি তো ফোনে সব সময় আসি"

নতুন সহকর্মী। নতুন পরিবেশ। মানিয়ে নিতে একটু সময় লেগেছিল। নতুন কাজ শিখতে বুঝতে হুড়হুড় করে একটা মাস পার হয়ে গেল। তেমন করে নিজের জন্য সময় পেল না নন্দিনী।

ছাড়পত্র চাইতে গেলে জ্যোতিকিরণ বলেছিল "হোয়ারেভার ইউ গো, ইউ ওনট গেট মানি অ্যাজ ইট ইজ হিয়ার"

"বাট আই অ্যাম লুকিং ফর এ ডিফারেন্ট ওয়ে অফ লিভিং..." তখনও বুঝতে পারছিল না, জ্যোতিকিরণ তাকে ছাড়বে কি না।

"ফাইন। হোয়াটেভার মেকস ইউ হ্যপি। ইউ কেম হিয়ার অ্যাট ইওর ওন উইল। ইউ ক্যন লিভ অ্যাট ইওর ওন উইল। ইফ এভার ইউ ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক টু দিস অরগ্যনাইজেশন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু ডু সো"

কোনো ফেয়ারওয়েল পার্টি হয়নি। কেউ নন্দিনীর অনুপস্থিতির জন্য দু-কথা বলেনি। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমন নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। বন্ধনহীন জীবনের এটাই

বৈশিষ্ট। থেকেও যেন কোথাও সে নেই। হয়ত বন্ধন একটা মায়া ছড়ায়। সেই মায়াটাই যে অনেক সময় এগিয়ে যাওয়ার পরিপন্থী। এই মায়ার মায়ায় ক'জন পারে বন্ধন ছিন্ন করে নতুন পথে পাড়ি দিতে? যতক্ষণ না মৃত্যু এই বন্ধন থেকে চিরমুক্তি দেয়?

সাহিনা, রোশেনারা, জাহানারা-রা কাজের বাইরে ভাব জমাতে চাইলেও, নন্দিনী সব সময়ই নিজেকে একটু আলাদা করে রেখেছে। মেয়েদের বড্ড কৌতূহল। বিশেষ করে অন্যদের জীবন নিয়ে। কিছুটা সেই কৌতূহল থেকে দূরে সরে থাকার জন্যই। অতীত নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে চায়নি। পুরনো ক্যানভাসটা মুছে ফেলেছে। সেই অস্পষ্ট অপূর্ণ ছবিটা আর আঁকবার ইচ্ছে নেই।

অফিসে বসে আগামী স্যুটের সেটস-এর যখন পরিকল্পনা করছিল, হঠাৎ ফেরদৌস ঘরে ঢুকে বলল "একটু ডিস্টার্ব করলাম"

চোখ তুলে নন্দিনী ফেরদৌসকে দেখল। নীল রং-এর জিনস, সাদা শার্ট পরা ছেলেটা তো খুব খারাপ দেখতে নয়। নন্দিনীর থেকে বয়সে একটু ছোটই হবে। ফর্সা মুখের ওপর চাপা দাড়ি, বাবরি চুল, মোটা গোঁফ। কমবয়সি চে গুয়েভেরাকে মনে করিয়ে দেয়। তাকাতেই ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নন্দিনীর চোখ দুটো থেমে গেল। আহামরি কিছু দেখতে নয়। তবুও চোখের স্থির চাহনির মধ্যে কোথায় যেন একটা ম্যগ্নেটিক অ্যাট্রাকশন আছে, যা আগে চোখে পড়েনি। কাজের ফাঁকে এক-আধবার দেখা হলেও তেমনভাবে আলাপ হয়নি। কিংবা সুযোগ হয়নি। অনেক লোকের মধ্যে চোখে পড়ার কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না।

"ঠিক আছে। বলো"

"আমার ডিরেক্টর সামিমুল সাহেব আমাকে একটা লোকাল কভারেজের কয়েকটা সিকোয়েন্স সাজাতে বলেছে। কিন্তু আমার স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী বাইরে আরও কয়েকটা সটস লাগবে। বাজেটের দিক দিয়ে তা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ ওই সেটগুলো না থাকলে সিকোয়েন্সটা ইনকমপ্লিট হবে। আমায় একটু সাহায্য করতে পারবে?"

"এখন আমি ব্যস্ত আছি। তুমি যদি অফিসের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো, চেষ্টা করে দেখতে পারি"

"ঠিক আছে। ক'টা নাগাদ?"

“আটটা তো বাজবেই। কাল সকাল থেকে স্যুট হবে। আজকের মধ্যে পুরো স্কিমটা সাজিয়ে দিয়ে যেতে হবে”

“বেশ। আমি আটটায় এখানে চলে আসব”

সেই প্রথম ফেরদৌসের সঙ্গে কাজের সূত্রে সামনাসামনি। রাত হয়েছে। বেশি রাত করলে আফিসের গাড়িটাও মিস হয়ে যাবে। একলা রাতে এই শহরে পাবলিক ট্র্যান্সপোর্টে যেতে নন্দিনীর একটু ভয় ভয় করে। তাই ফেরদৌসের দিকে চেয়ে বলল “স্ক্রিপ্টটা শুনে একটু ভাবতে হবে। এত রাত হয়ে গেছে। তার থেকে চল আমার বাড়িতে। সেখানে বসেই শুনব”

ফেরদৌসের সিকোয়েন্স শোনার জন্য এরশাদ সাহেব তাকে মাইনে দেয় না। তাই ফেভারটুকু কাজের সময়ের বাইরেই করতে হবে। নন্দিনী যে সময় দিয়ে শুনবে তাতেই উৎফুল্ল ফেরদৌস “তাহলে দিদি আজকের ডিনারটা আমি খাওয়াব। যাওয়ার পথে টেক অ্যাওয়ে নিয়ে নিচ্ছি”

ফেরদৌসকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে, টুক করে স্নানটা সেরে নিল। সারাদিনের প্যচপ্যচে গরমে স্নান না করলে সোয়াস্তি নেই। স্নান সেরে, একটা কাফতান পরে, হুইস্কি হাতে কর্নার ল্যাম্পের পাশে বসে বলল “একটু খাবে? তোমরা তো মুসলমান!”

“হলে মন্দ হয় না। ড্রিঙ্কসের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই”

মন দিয়ে ফেরদৌসের সিকোয়েন্স শুনল। তারপর কাগজ কলম নিয়ে সেটের স্ট্রাকচার আঁকতে আঁকতে বলল “হয়ে যাবে। মন দিয়ে সেটসগুলো দেখ। সাজিয়ে দেওয়া যাবে”

ফেরদৌস লক্ষ করছিল নন্দিনীর মধ্যে একটা অসম্ভব সৃজনশীলতা। যা আছে তাকে একত্র করে সাজাতে জানে, প্রায় শূন্য থেকে পূর্ণতায়। একটা বেসিক কাঠামো থেকে সবাই তো কিছু করে দিতে পারে। কিন্তু শূন্য থেকে পূর্ণতার ছবি ক’জন আঁকতে পারে?

যা অন্যে পারে না, নন্দিনী তা পারে।

“তুমি তো দারুণ ক্রিয়েটিভ দিদি। তোমার মতো যদি ক্রিয়েটিভিটি আমার থাকত। এখন তো এই চাকরির জাঁতাকলে ঢুকে নিজের কিছুই করতে পারি না। ওরা যা বলে নিজের বিচার বিবেচনাকে বাইরে রেখে করে দিই। প্রশ্ন করলে চটে যায়, বলে বাচাল, বেশি কথা বলে। তাই আর প্রশ্ন করি না। কথায় আছে না, বোবার শত্রু নেই”

বেশ লাগছে ছেলেটিকে। ওর মধ্যে একটা সহজ ছেলেমানুষি সরলতা আছে। একটা পঙ্কিল দুনিয়ার গোলকধাঁধায় লাট্টুর মতো চক্কর খেতে খেতে, এখন আর কঠিন হিসেবি লোকদের ভাল লাগে না। সরলতাই বেশি করে আকর্ষণ করে। ফেরদৌস ম্যচিওরিটির মধ্যে, সেই ছেলেমানুষিটাকেই আগলে রেখেছে।

ভাল লাগতে শুরু করেছে ফেরদৌসকে।

সেদিন ডিনার খেয়ে এবং খাইয়ে ফিরেছিল ফেরদৌস। তারপর কিছুটা নন্দিনীর প্রশ্রয়, কিছুটা নিজের আকর্ষণে, ওরা যেন পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসছিল। ডিনার খাওয়া থেকে সিনেমা যাওয়া থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ভেজাল আড্ডা, ঢাকার একাকী জীবনে নন্দিনী একটা সাথি খুঁজে পেয়েছিল। ফেরদৌস কিন্তু নন্দিনীর অতীত নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি। ভবিষ্যৎ নিয়েও কোনো স্বপ্ন দেখেনি। শুধু বর্তমানটাকেই আঁকড়ে অবসরটুকুকে আস্বাদন করতে চাইছিল।

নন্দিনীর মনে হল এই অতীতের দিকে না তাকিয়ে, ভবিষ্যতের কথা না ভাবার মধ্যে অনেক শান্তি আছে।

কী বোকাই না ছিল কম বয়সে! ইন্দ্রনীলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত। সেই স্বপ্নের তুলি দিয়ে ক্যানভাসে ছবি আকার চেষ্টা করত। স্বপ্নের তুলি দিয়ে যেই না রংটা ছবিতে লাগিয়েছে, ওমনি কোথা থেকে একটা ঝড়ের দাপটে ছবিটা মুছে গেল। আবার ছবি আঁকার চেষ্টা করল আরেকটা রং দিয়ে, সেটাও মুছে গেল।

এখন আর ছবি আঁকার কথা ভাবে না। খালি পরে থাক ক্যানভাস। এখন শুধুই রং মিশিয়ে যাওয়ার পালা। সাতটা থেকে চৌদ্দ থেকে আঠাশ থেকে এক হাজার আঠাশ। বাইনারি আকারে বাড়ুক রং-এর সংমিশ্রণ। তারপর নয় ছবি আঁকা যাবে।

কিন্তু উত্তাল যৌবন কী আগামীর স্বপ্নে বসে থাকার মতো স্থির? রাতের অস্থির দেহটা স্যাম্পেনের কর্ক খোলার মতো ভাসিয়ে দিতে চায় বোতলবন্দি তরলটাকে বহুদিনের জমে ওঠা খরস্রোতে। দিনের পর দিন, একাকী নিভৃতে মাঝরাতের পুঞ্জিভূত দেহের প্লাবিত মূর্ছনায়। সেখানে কোনো স্বপ্ন নেই। আছে শুধু মুহূর্তটুকু। তাকে অস্বীকার করে কী করে? মুক্তি চাই! নিজের ভেতরে জমে ওঠা মেঘের বর্ষণ চাই, ছাপিয়ে পড়া বাঁধভাঙা প্লাবনে।

তাই, সেদিন যখন ফেরদৌস বেরিয়ে যাচ্ছিল, নন্দিনী নিজেই বাধা দিয়েছিল। একটু হকচকিয়ে গেলেও আশ্চর্য হয়নি ফেরদৌস। কত রাতে একলা বিছানায় নন্দিনীদির ছবিটা দেখেছে মনের ক্যানভাসে। সেই ছবি, তার একা ঘরে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তারপর অন্ধকারের ক্যানভাসে, মনের স্বপ্নের ছবিটা সাজিয়ে, নিজেকে মুক্ত করেছে কামনার আগ্রাসী আক্রমণ থেকে। তবুও মুখ ফুটে কিংবা আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে পারেনি নন্দিনীদিকে নিয়ে জেগে থাকা মাঝরাতের ট্র্যাভিওলি ফাউন্টেনের স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা।

তাই যখন নন্দিনীদি বলল "যেতেই হবে?"

"তুমি বললে যাব না"

হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল শোবার ঘরে। কোনো ভণিতা না করেই নিজের সুতিহীন দেহটাকে তুলে দিয়েছিল ফেরদৌসের হাতে। সেখানে ফেরদৌস তার থেকে ছোট নয়। নন্দিনীও বড় নয়। ফেরদৌস পুরুষ, নন্দিনী নারী। সঙ্গমের মধ্যেই দুজনের পূর্ণতা। পুরুষের দৃপ্ত পৌরুষের স্বাদ নন্দিনীদিকে দিয়ে, ফেরদৌস বুঝিয়ে দিয়েছিল কাজের ক্ষেত্রে সে জুনিয়র হতে পারে, নন্দিনীদিকে তার একাকী চাওয়ার পরিপূর্ণতায় পৌছতে সে কিছু কম নয়!

ফেরদৌসের মনে হয়েছিল তার এতদিনের আকাঙ্ক্ষাটা যেন, শেষমেশ একটা ছবি হয়ে ভেসে উঠল, তার স্বপ্নে দেখা, না-আঁকা ক্যানভাসে। নন্দিনীদির উষ্ণতাকে ভরা বর্ষার প্লাবনে নিরাসক্ত করেছিল শ্রাবণ ধারার ভরা বর্ষণে। সেই আচমকা বর্ষার প্লাবনের জোয়ারের মাধুর্যটা, নিজের মতো করে উপভোগ করেছিল নন্দিনী ধানমুন্ডির ফ্ল্যাটে বসে। নিজের আপাত পূর্ণতার মধ্যে। ব্যাঙ্গালুরুর লাখ টাকার ঝলসানির থেকে অনেক অনেক অনেক বেশি মধুর। তার অতৃপ্ত নারীত্বের এক ঝলক পূর্ণতা।

তার জাগতিক কায়ার বিশুদ্ধ দেবী বন্দনা। সেটাও তো কোনো প্রথাগত অনুষ্ঠানের মতো আরাধনা। নিভৃতে। হলেই বা। আরাধনা যে সব সময় একটা বিগ্রহকে করতে হবে, কে বলেছে?

তখন কী আর জানত, এই নিভৃত আরাধনা যে একদিন বিভীষিকা হয়ে মুখে থাপ্পড় মেরে মুছে ফেলবে তার রঙানো ক্যানভাস। তখন ধূসর জীবনের ক্যানভাসে, আরেকটা ছবি আবার নতুন করে আঁকতে হবে, নতুন চিত্রপটে।

পাঁচ

আ. র্য হয়ে দেখছিল নন্দিনী। শুধু প্রাচীন ভাস্কর্য নয়, এ এক অন্য অভিজ্ঞতা।

রেজ্জাক যেদিন ফোন করে বলেছিল 'নেক্সট মাসে আমাদের কামবোডিয়া ট্রিপের কথা মনে আছে?' সেদিন অতটা গুরুত্ব দেয়েনি ওকে। রেজ্জাক মাসখানেক আগে থেকেই ভাবতে শুরু করেছিল। সারাদিনের ক্লান্তির পর, মাসখানেক পরের একটা ডকুমেন্টারি নিয়ে ভাবার একটুও ইচ্ছে ছিল না নন্দিনীর। এখানে দাঁড়িয়ে এখন বুঝতে পারছে, রেজ্জাক কেন এতদিন আগে থেকে প্ল্যান করছিল।

রেজ্জাক বলল "আগে জায়গাটা ঘুরে দেখে নেওয়া যাক। একটা প্ল্যান করে এসেছি। তবে সেটা তো নেট-এর ডাটার ওপর। আসলে জায়গাটায় না এলে রিয়েলিটিটা বোঝা যায় না"

"আমিও গুগল সার্চ করে করে কিছুটা জানার চেষ্টা করেছি"

"রিসেন্টলি কোনো একটা নিউসে পড়লাম নোয়েল হিডালগো ট্যন বলে একজন অস্ট্রেলিয়ান রিসারচার আরকিওলজিক্যল এক্সকাভেশন করতে গিয়ে এই এংকোরওয়াট মন্দিরের আরও অনেক পুরনো পেন্টিং পেয়েছে। এগুলো নাকি ৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো। প্রব্যবলি সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরির, যখন বৈষ্ণবাইট হিন্দু থেকে থেরাভাইট বুদ্ধিজমে কনভারটেড হয়েছে এই মন্দিরটা"

"কীসের পেন্টিং?" শুনেই উৎসাহিত নন্দিনী। তার ভেতরের আর্টিস্টটা এখনও মরে যায়নি।

চাকরির জন্য ডকুমেন্টারি করা এক জিনিস, আর যদি তা নিজের ইন্টারেস্টের সঙ্গে মিলে যায়, তবে যেন উৎসাহটা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। নন্দিনী পুজো-আচ্চা কোনোদিনই করেনি। ধর্ম কিংবা মন্দির সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহও তার নেই।

"সবই আছে। জন্তুজানোয়ার, দেবদেবী, নৌকো, এই মন্দিরের ভাস্কর্য - সব। এই এংকোরওয়াট মন্দির তৈরি হয়েছিল খামার রাজত্বে, সম্ভবত টুয়েলফথ সেঞ্চুরিতে। এই পেন্টিংগুলো সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরির হবে। নেটে যেটুকু পড়েছি রাজা এং চ্যন বুদ্ধিজমে

রেস্টরেশন করার সময় এগুলো হয়ত আঁকিয়েছিলেন। সেগুলোর ডিজট্যল ইম্প্রিন্ট-এর ছবি যদি কোনোভাবে তোলা যেত... ডকুমেন্টারিটাকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যেত" রেজ্জাক তার স্টিল ক্যামেরাটার লেন্সটা পরিষ্কার করতে করতে বলল।

কত কিছুই না দেখার আছে এ পৃথিবীতে। প্রত্যেকটা দৃশ্য যেন একটা জীবন্ত ছবি। নন্দিনীর দুঃখ হল। আহা! আগে যদি জানত। সঙ্গে করে ক্যানভাস তুলি নিয়ে আসতে পারত। কাজের জন্য হুট করে ব্যাগ প্যক করে বেরিয়ে পরেছে। মন থেকে ছবি আঁকা আর প্রত্যক্ষ দর্শনে ছবি আঁকার মধ্যে অনেক তফাত।

কী আর করা যাবে! ঘুরে ঘুরে ৯০০ বছরের প্রাচীন সভ্যতা দেখতে লাগল।

পড়েছিল ইউনেস্কো এটাকে হেরিটেজ সাইট হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছে। সুপ্রাচীন এই হিন্দু মন্দিরটা এংকোরওয়াটের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে নন্দিনী এগিয়ে চলেছিল মুল মন্দিরটার দিকে। হঠাৎ মনে হল, একজন গাইড নিলে তো ভাল হয়। রেজ্জাককে বলতে গিয়ে ফিরে দেখল রেজ্জাক নেই। কোথায় গেল? মরুক-গে। নিজেই একজন গাইড খুঁজে বার করল। শুধু নিজের জানার জন্য নয়। ডকুমেন্টারি করতে গেলে শুধু গুগল সার্চ যথেষ্ট নয়। গাইডের ভার্সনটাও জানা দরকার।

গাইড যেন গুগলের বাইরে নিয়ে গেছে নন্দিনীকে।

স্পষ্ট ইংরেজিতে নরেন্দ্র পং বলে চলেছে "ইউ মাইট বি আওয়ার দ্যট দিস টেম্পল ওয়াজ বিল্ট ডিওরিং দ্য রেন অফ সূর্যভরনাম ২ এন্ড লেইটার ফারদার কন্সট্রাকশন বাই উদাদিত্তভরনম অ্যারাউন্ড ১১১৩ টু ১১৫০। বাট দ্য হিস্টরি ডেটেস ব্যাক ফারদার টু ২০০ এ ডি, হোয়েন ইন্ডিয়ান ব্র্যক্ষিন ট্রেডারস এস্ট্যব্লিশড দ্য টাউন অ্যাস কিংডম অফ ফুনান। ডেডিকেটেড টু লর্ড বিষ্ণু, দিস ওয়াজ দ্য স্টেট টেম্পল অরিজিনালি কলড 'বরাহ বিষ্ণুলোক'। ২৭ ইয়ার্স লেইটার সূর্যভরনাম টু ওয়াজ স্যকড বাই চামস, দ্য ট্র্যডিশনল এনিমি অফ খামার্স ইন ১১৭৭ অ্যান্ড জয়ভরনাম সেভেন রেস্টরড ইট। দ্য আউটার ওয়াল এনক্লোজেস এন এরিয়া অফ ২০৩ একরস। ফ্রম দ্য আউটার গ্যলারি হোয়ার উই আর নাউ, উই উইল প্রসিড টু দ্য ইনার গ্যলারি"

নরেন্দ্র পং-এর সব কথা যে মাথায় ঢুকছিল, তা নয়। ওকে নিজের মতো বলতে দিয়ে নন্দিনী আপন মনে মন্দিরের ভাস্কর্য দেখে চলেছে। মন চাইছে, ওই সদ্য আবিষ্কৃত

ছবিগুলোকে দেখার। ডকুমেন্টারির জন্য না হলেও, নিজের ছোটবেলার ছবি আঁকার শখের জন্য তো বটেই। কে যেন তাকে ভেতর থেকে টানছে। হয়ত তার অন্তর্নিহিত শিল্পীসত্তা ফিরে যেতে চাইছে আজ থেকে ৫০০ বছর আগের পৃথিবীতে।

নরেন্দ্র পং তার স্বভাব-প্রফেশনল ভঙ্গিতে বলে চলেছে "দিস প্লেস ওয়াজ চোজেন বিকস অফ ইটস স্ট্র্যাটেজিক মিলিটারি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল পোটেনশিয়াল। দো সাম সে, দ্য এরেঞ্জমেন্ট অফ দ্য টেম্পলস রিসেম্বল্ড দ্য স্টারস ইন দ্য কন্সটেলেশন অফ ড্র্যাকো অ্যাট দ্য টাইম অফ স্প্রিং ইকুইনক্স ইন ১০,৫০০ বি সি, ইন অর্ডার টু হারমনাইজ দ্য আর্থ উইথ দ্য স্টারস, হুইচ ইউ উইল সি লেইটার ইন দ্য স্কাল্পচারস অফ ডেভাস অ্যান্ড অসুরাস"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেও নরেন্দ্র পং-এর কথাগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে সেই যুগে নক্ষত্রদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনো স্থাপত্য নির্মাণ-এর কনসেপ্টটা। যা অজানা, অচেনা, অদেখা। বোধহয় যুগ যুগ ধরে তাই মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। সেই অদেখা ছবিটা, যুগ থেকে যুগান্তরে, মানুষ আঁকতে চেয়েছে, তার মনের বিশ্বাসের রং দিয়ে। কখনও বা সুরে, কখনও বা সাহিত্যে, কখনও বা দর্শনে, কখনও বা শিল্পকলার কারুকার্যের বিন্যাসে। অসম্পূর্ণতা থেকে না-চেনা সম্পূর্ণতার পথে। ইহলোক থেকে অজানা লোকের স্পর্শের আশায়। নক্ষত্রের মানচিত্রের মধ্যে যেন ঈশ্বরের আলোক রেখার রং আছে। হয়ত ক্যালিডিওস্কপের মতো, মুহূর্তে মুহূর্তে সে রং বদলায়। তবুও অতৃপ্ত জীবন খুঁজে বেরয় সেই না ছোঁয়ার স্পর্শ।

রোমান ফিলসফার দার্শনিক মারকাস অরেলিয়াস বলেছিলেন ফর দেয়ার ইজ ওয়ান ইউনিভার্স আউট অফ অল, ওয়ান গড থ্রু অল, ওয়ান সাবস্টেন্স অ্যান্ড ওয়ান ল্য, ওয়ান কমন রিজন অফ অল ইনটেলিজেন্ট ক্রিচার্স, এন্ড ওয়ান ট্রুথ

হয়ত এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পূর্ণতার ক্যানভাসটা বারবার আঁকতে চেষ্টা করেছে মানুষ। তাই এই এংকোরওয়াট মন্দির। তাই এই ইতিহাস। তাই এই ডকুমেন্টারি।

"ম্যাডাম, আর ইউ ফলোয়িং মি?" নন্দিনীর অন্যমনস্কতা চোখ এড়ায়নি নরেন্দ্র পং-এর।

“ডেফিনিটলি। ইন ফ্যক্ট আই ওয়াজ ট্রায়িং টু ভিসুয়ালাইজ দেয়ার কনসেপ্ট ইন মাই ওউন ওয়ে”

খুশি হল নরেন্দ্র পং। এ জন্যেই এশিয়ানদের গাইড হতে ওর ভাল লাগে। ওরা দর্শনে চলে যেতে পারে, যা অ্যাংলো-স্যাক্সনরা পারে না। অ্যাংলো-স্যাক্সনরা টেম্পল-এর টেকনিক্যল ডিটেলস নিয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড। আর এশিয়ানরা, টেম্পল ভুলে ওই ড্র্যাকো নক্ষত্র নিয়েই হয়ত হাজারটা প্রশ্ন করে ফেলবে। যেন দুটো পৃথিবীর যোগসূত্রটাই তাদের কাছে বেশি ইন্টারেস্টিং।

নন্দিনীর মনের ভাব বুঝতে পেরেই টেকনিক্যল ডিটেলসে না গিয়ে নরেন্দ্র পং বলতে লাগল “দ্য মেগালম্যনিয়াক কিংস অফ দ্যট এরা ডিজাইন্ড দিস টেম্পল টু ওয়ারশিপ গডস। ইন অ্যালাইনমেণ্ট উইথ দ্য ড্র্যাকো স্টার, দে কন্সট্রাক্টেড দ্য থ্রি ডাইমেন্সনল ইয়ান্ত্রাস, হুইচ ওয়ার অ্যান এন্ডিভার টু অ্যালাইন হিউম্যনস উইথ দ্য ডিভাইন”

নন্দিনী যেন এই সুযোগটাই খুঁজছিল। মন্দিরের আরকিটেকচার সম্বন্ধে জানার ওর খুব বেশি আগ্রহ ছিল না। নরেন্দ্র পং-এর কথার রেশ টেনে বলল “দ্যট ইজ প্রেসাইসলি হোয়াট আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড এবাউট”

একটু হাসল ছোটখাটো কাম্বডিয়ান নরেন্দ্র পং “ইউ হ্যভ একোড দ্য ড্রিমস অফ জয়াভারম সেভেন ফুল অফ ডীপ সিম্প্যথি ফর দ্য গুড অফ ওয়ার্ল্ড, সো এস টু বেস্টও অন মেন দ্য এমব্রসিয়া অফ রেমেডিস টু উইন দেম ইমর্মট্যালিটি। বাই ভারচিউ অফ দিস গুড ওয়ার্কস উড দ্যট আই মাইট রেস্কিউ অল দোস হু আর স্ট্রাগলিং ইন দ্য ওসেন অফ এক্সিস্টেন্স”

“টেক মি টু দোস মিস্টিক করনারস অফ দ্য টেম্পল” নন্দিনী নরেন্দ্র পং-এর কথাটা টেনে নিয়ে বলল।

“সিওর আই উইল, অ্যাস ইউ প্রেফার”

দেওয়ালটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল নন্দিনী। শত পদ্মের কলির মধ্যে বিকশিত শিব।

আগে ঠিক বুঝতে পারেনি নন্দিনী। নরেন্দ্রর কথায়, পুরো মন্দিরটার মানচিত্র দেখে বুঝতে পারল, পদ্মের পল্লবের মতো ১০৮টা টাওয়ার দিয়ে তৈরি এই মন্দির কমপ্লেক্সটা। সেই প্রস্ফুল্টিত পদ্মের কেন্দ্রভাগে, মাউন্ট মেরুর মতো সেন্ট্রাল টাওয়ার হয়ে বিরাজ করছে, একমেবাদ্বিতীয়ম অধিপতি শিব। তাকে ঘিরে, টাওয়ারের দেওয়ালে রয়েছে ২০০০ ভঙ্গিমায় অপ্সরার প্রতিমূর্তি।

নরেন্দ্র বলে চলেছে আমাদের সুপ্রাচীন ইতিহাসের একাংশ - কবে তা হয়েছিল স্থলে, কবে হয়েছিল জলে, কবে হয়েছিল মহাব্যোমে। বত্রিশটি নরক আর সাঁইত্রিশটি স্বর্গের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে কবে 'সি অফ মিল্ক'-এর আবির্ভাব ঘটে। নন্দিনীর তাতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না।

সে তাকিয়েছিল ওই অপ্সরাদের প্রতিমূর্তিতে।

যুগ থেকে যুগান্তরে, অনাদি সৃষ্টির 'বিগ ব্যং' থেকে এই অপ্সরারাই সৃষ্টি করেছে অমর চিত্রলেখা। স্বপ্নের ছবির পটভূমি হয়ে এঁকেছে স্বপ্ন মধুর স্বপ্নময় মধুরেখা। সৃষ্টির উল্লাসে গেয়েছে স্বপ্নসংগীত সুমধুর রেণুমাখা। কালস্রোতের প্রবাহে যা আজও অমলিন, নব রসে নতুন সম্ভারে আঁকা। যেখানে সহস্র কোটি বছরের রং মিলে গেছে এক অনাবিল ছন্দের প্লাবনে। যেখানে শতক থেকে শতকে রাজা মহারাজারা এঁকেছে তাদের বিশ্বাসকে ছুঁতে - পূর্ণতার অশ্রুত অবগাহনে; প্রাচীন থেকে নবীনে, পুরাতন থেকে নতুনে। যেখানে সুপ্ত গীত, হয়েছে সংগীত, মহাকালের ঔরসে। যেখানে প্লাবন ঝঞ্ঝা বাতাস হয়েছে নীল নীলিমার দিগন্তে। সেখানে আজ খেলে জীব, সেই আরাধনার বন্দনা স্তুতি গানে। আঁকে জীবনের ছবি ক্যানভাস ভরে, অশ্রুত সেই নামে। যেখানে পাখনা মেলে অচেনার আলো ওদের শেখানো প্রবাদে, হারিয়ে যায় চেতনার সুর হাজার রিয়েলের দামে।

নন্দিনী রিয়েল দিয়ে ছবি আঁকতে এখানে আসেনি। মন বহুদিন ধরে ক্যানভাসে একটা ছবি আঁকতে চাইছে। কোনো ছবিটা শ্রেয়? আর কোনো ছবিটা প্রেয়? যদি খাজুরাহর ছবিটা শ্রেয় হয়, তবে কেন ব্যাঙ্গালুরুর ছবিটা প্রিয় হবে না? সময় হয়ত সঠিক উত্তর দেবে।

সময়ের সীমা পেরিয়ে নন্দিনী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে আজ থেকে পাঁচশ বছর আগের লংভেক সম্রাট এং চ্যন ১-এর রাজ্যে। যেখানে ক্রং চাকতমকের বাইরে মেকং, বাসাক

আর টনলে সাপ নদীর প্রয়াগে, ছোট্ট একটি গ্রামে থাকত একটি অষ্টাদশী মেয়ে জোরানি। যেখানে তা[1] আর ইয়ের[2] ভালবাসায় বড় হয়ে উঠছিল সে। অপ্সরা না হলেও, আদর্শ নারী হতে চেয়েছিল সে। সবাই ভালবাসত তাকে। শোভনও ভালবেসেছিল জোরানিকে।

ছেলেবেলার খেলার সাথি পো শোভনের হাত ধরে বেরিয়ে যেত মেকং নদীর ধারে। নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলত "খনহম চাউলসেট চচেক চিময় চীইময় থম্মচিয়েটি[3]"

"এ এন্তাউ ফং ডের[4]" জোরানি জবাব দিত।

"পেল ডেল এনাক ইন্টারমিংল চিউময় থম্মচিয়েটি এনাক মিউলটো ডছিয়া রিউয়েং পি পপক মুওয়[5]" শোভন হেসে বলত।

আহ্লাদে লাল হয়ে যেত জোরানি। কাঁপা কাঁপা সুখে বুকটা কেঁপে উঠত শোভনের কথায়। নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে কখন যে সেই ভাল লাগাটা ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে, বুঝতেও পারেনি। উঠতি বয়স। ভরা যৌবনের বাঁধভাঙা প্লাবনে ওরা দুজন ভেসেছিল এক স্বপ্নের পথে। ছেলেবেলার স্মৃতিকে যৌবনের টেরেসে উন্মুক্ত করে দিতে উভয়কে কাছে পাওয়ার অঙ্গীকারে।

কিন্তু না।

কাম্বডিয়ান সমাজটা অত্যন্ত রক্ষণশীল। সেই রক্ষণশীল সমাজ মেনে নিতে পারেনি তাদের এই প্রেমের বন্ধনের অঙ্গীকার, কিংবা আদি অনন্ত বাসনার বাস্তব প্রস্ফুটন। মানতে পারেনি ওদের অবাধ প্রেমকে।

"আনাক ট্রাউভতে চাকচেন পি কীট[6]" তা চিৎকার করে উঠেছিল।

এটা যে কাম্বডিয়া সংস্কারের পরিপন্থী।

শান্ত জোরানি তা-এর কথার প্রতিবাদ করতে পারেনি। মনে মনে, মেনে নিতেও পারেনি। চুপিসারে শোভনের সঙ্গে দেখা করেছে, কথা বলেছে, পালিয়ে যেতে চেয়েছে অন্য এক শহরে, যেখানে তাদের কেউ চেনে না। শোভনও চেয়েছিল জোরানিকে নিয়ে হারিয়ে যেতে।

জোরানিকে নিয়ে ইলোপ করার আগেই হারিয়ে গেল শোভন। কোথায়, তা কেউ জানে না। জোরানিও নয়। বুঝতে পেরেছিল তা গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শোভনকে গায়েব করে দিয়েছে।

জোরানিকে শাসন করে তা বলেছিল "ছাপ্পি থ্যঙ্গাইনহ আনাক মিন আচ বড়েই সেভা রোম আম্পি কার তেমনাকেং আনাক কান্তে কেমেংগোসরেই[7]"

হারিয়ে গেছিল শোভন। হারিয়ে গেছিল তার বুকভরা স্বপ্ন। হারিয়ে গেছিল তার ছোট্ট মনের অপার ভালবাসার সাথি। হারিয়ে গেছিল তার অষ্টাদশী নারীত্বের একটু চাওয়া। পূর্ণতার ক্যানভাসটা ছিঁড়ে ফেলে, একটা অসম্পূর্ণ ছবি আঁকড়ে আঁকতে হয়েছিল মনের রামধনুর হারিয়ে যাওয়া দিগন্তের অসমাপ্ত ক্যানভাস। সপ্ত রং-কে মুছে ফেলে একটা ধূসর অস্পষ্ট ছবি নিয়ে খেলা করেছিল মনের ক্যানভাসে।

দেওয়ালের ওই অপ্সরাদের লীলাচার কখন ধোঁয়াটে জোরানির সামনে। কল্পনার অপ্সরারা জোরানির যুগ থেকে আগামী যুগের যুগান্তরে ওই মন্দিরের ভাস্কর্যের স্বর্গভূমির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে মর্ত্যের অসম্পূর্ণতার স্থাপত্যে বিরাজ করতে।

"আর ইউ অ্যাপ্রিসিয়েটিং দ্য বিউটি অফ দ্য স্কাল্পচারস?" সম্বিত ফিরল পং-এর কথায়।

"ওয়েল আই হ্যড এ ভিসন অফ দ্য ডিসাস্টার অফ ড্রিমস"

নন্দিনীর কথাটা বুঝতে পারেনি পং। ওর দিকে তাকিয়ে বলল "আই কুডণ্ট কোয়াইট ফলো"

"দ্য পিকচারস আর সো পিসেস। রিয়ালিটি ইজ ডিফারেন্ট"

এত বছর ধরে গাইডের কাজ করছে নরেন্দ্র পং। এর আগে কখনও কোনো টুরিস্টের কাছে এরকম কথা শোনেনি। ঘাবড়ে গেল নন্দিনীর কথায়। ঠিক কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। ফ্যলফ্যল করে চেয়ে রইল নন্দিনীর মুখের দিকে। মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছে না। হঠাৎই যেন সারাদিন বকবক করা গাইডটা বোবা হয়ে গেছে।

নন্দিনী ওর চোখের তাকিয়ে বলল "হিয়ার উই আর স্ট্যন্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য প্রেসেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েটিং দ্য বিউটি অফ দ্য পাস্ট। অর সিয়িং দ্য প্রেসেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েটিং ইট। আই জাস্ট হ্যড এ ভিসন অফ দ্য পাস্ট"

"ভিসন? হোয়াট কাইন্ড অফ ভিসন?"

"অফ দ্য স্যাক্রিফাইসেস অফ দ্য কমন লেডিস, ইন বিল্ডিং দ্য এপিটোম অফ দ্য ডিভাইন, দ্য মিথ অফ দ্য অপ্সরাস অফ আওয়ার ড্রিমস ইন রিয়ালিটি"

অতীতের কাহিনিটা বলল নরেন্দ্রকে। মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে ভাবল নরেন্দ্র - মেয়েটা কী পাগল হয়ে গেছে? না কী জাতিস্বর? জাতিস্বরের কথা বইয়েতে পড়েছে। কিন্তু সাক্ষাতে কাউকে দেখেনি। নরেন্দ্রর গুলিয়ে যাচ্ছে পাগল আর জাতিস্বরের সংজ্ঞার ব্যঞ্জনাটা।

নন্দিনী বলল "বিলিভ মি। আই হ্যভ সিন ইট উইথ মাই ওউন আইস" যদিও বেশ অনুভব করছে নরেন্দ্র পং তাকে বিশ্বাস করছে না।

বিশ্বাস করুক চাই না করুক, নন্দিনীর অতৃপ্ত আত্মাটা যেন আবার জেগে উঠেছে। মন্দির থেকে ছুটে বেরিয়ে এল খোলা প্রাঙ্গণে। এই ১০০০ বছরের স্থাপত্যের মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে। যতই তা যুগ যুগান্তরের সাক্ষ্য বহন করুক না কেন। একটা সভ্যতা, একটা কৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ঈশ্বর তো হিন্দুত্বের আঁচলে কিংবা থেরাভেডা বুদ্ধিজমের কোলে অবস্থান করে না। ঈশ্বর তো মানুষের সম্পূর্ণতার একটা ভরাট ক্যানভাস। রং? সে নয় পরে ভাবা যাবে, কোন রঙে সে ছবি আঁকা হয়েছে। আত্মাকে অতৃপ্ত রেখে অপ্সরার ছবি গড়লে নারীত্ব পূর্ণতা পায় না।

তার ভিসনটা যেন আজকে সেকথাই বুঝিয়ে দিয়েছে। নন্দিনী এই অসম্পূর্ণতার মধ্যে থাকতে চায় না। যেমন অসম্পূর্ণ করে রেখে দিয়েছিল তার নারীত্বকে, খাজুরাহর জৈবিক সাক্ষর। সেই সত্ত্বা কিংবা আত্মা নিয়ে ছুটে বেরিয়েছে ব্যঙ্গালুরু থেকে ঢাকা। জীবনের চলার ক্যাডেন্সে প্রতি মুহূর্তে কোথায় যেন একটা ছন্দপতন।

নরেন্দ্র পং বুঝতে পারছিল না কী করবে?

নন্দিনীর পেছন পেছন বেরিয়ে এল খোলা আকাশের নীচে।

"কোথায় চলে গেছিলে?" রেজ্জাকের স্বরে ফিরে তাকাল নন্দিনী।

"প্রশ্নটা আমারও" পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিল নন্দিনী।

"আমি তো পারমিশন করাতে গেছিলাম। ওই যে নতুন পেন্টিংগুলো রিসেন্টলি পাওয়া গেছে, ওগুলো যাতে ডকুমেন্টারির জন্য ফিল্মিং করতে পারি। আগে থেকে তো পারমিশন

করিয়ে আসিনি। তাই করাতে গেছিলাম। ডকুমেন্টারিটা তা না হলে ইনকমপ্লিট থেকে যেত”

নন্দিনীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই রেজ্জাকের এই ডকুমেন্টারি নিয়ে। পাঁচশ বছরের পুরনো ছবিটা যেন চেনা অরবিট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তাকে অচেনা সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে।

হাসি পেল রেজ্জাকের কমপ্লিটনেস এর স্থূল ব্যাখ্যা শুনে। ধীর শান্ত গলায় বলল “কোনোদিনও কমপ্লিট হবে না”

রেজ্জাক বুঝতে পারল না, নন্দিনী কী বলতে চাইছে। নন্দিনীর তির্যক উক্তি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে নন্দিনী তার দুনিয়ায় আর নেই। কোনো এক অন্য দুনিয়ায় হারিয়ে গেছে। নিজের স্বপ্ন ছবির চিত্রপটে। তার এতদিনের পরিশ্রম কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই মুহূর্তে ওর কাছে মূল্যহীন।

রেজ্জাকের বোঝার বাইরে, কিছুক্ষণ আগের উৎসাহে ভরা নন্দিনী হঠাৎ ফিউস হয়ে গেছে কেন?

কী এমন ঘটল তার এই কিছুক্ষণের অনুপস্থিতিতে যা নন্দিনীর এই পরিবর্তন ঘটাল?

এই মহিলাকে নিয়ে ডকুমেন্টারিটা শেষ করতে পারবে তো?

---

[1] ঠাকুরদা

[2] ঠাকুমা

[3] আমার প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে খুব ভাল লাগে

[4] আমারও

[5] তোকে ঠিক মেঘপরীর মতো দেখতে লাগে যখন তুই প্রকৃতির সাথে মিশে যাস

[6] তোমায় ওকে ছাড়তে হবে

[7] আজকের থেকে তোমার একলা ঘোরা বারণ, নষ্ট মেয়ে কোথাকার

ছয়

টনিদার ভিলার বাগানে .সলিব্রেশন পার্টি। কত লোক। নন্দিনী তাদের কাউকেই চেনে না। টনিদা এক এক করে সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে। সেলিব্রিটি, চিত্রতারকা থেকে মন্ত্রী, আমলা, সঙ্গীত শিল্পী। সস্ত্রীক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা তো বটেই।

"মিট মাই চায়েল্ডহুড ফ্রেন্ড নন্দিনী"

এর আগে এত ইমপরট্যান্স পায়েনি নন্দিনী। সামিমুলের চোখ তাই দেখে ছানাবড়া। আশ্চর্য হয়ে দেখছে এলিট অফ হংকং-দের। মিডিয়ায় কাজ করার দৌলতে বাংলাদেশের একাধিক হোমরাচোমরাদের একাধিক পার্টি অ্যাটেন্ড করেছে, কিন্তু তা বলে অভিজাত হংকংবাসীদের সঙ্গে তার তুলনা! প্রাচুর্যের আতিশয্য, আগে এভাবে দেখেনি। এরাই দেশের ভবিষ্যতের নিয়ামক। এরাই সাধারণের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয় নিজেদের প্রভাবে। আবার এরাই সাধারণের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেয় অন্য কোনো জৈবিক নেশার তাড়নে। আম জনতার দাবি নিয়ে যারা ক্রমান্বয়ে মিডিয়ায় ঝড় তোলে, তারা কতই না গৌণ। এরাই পরোক্ষভাবে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, আগামী দিনের পশ্চাতে নিয়ামক হয়ে।

এরশাদ সাহেবের কথায় গল্পটা সাজাতে, নন্দিনী আবার ফিরে এসেছে সামিমুলকে নিয়ে। সেটাও তো, এদের মতো কোনো এক মিলিয়নেয়ারের ছকের দাবাখেলা। এই অদৃশ্য নিয়ামকদের কাছে নিজেকে কেমন অসহায় মনে হল। এরা গল্পের থিম তৈরি করে, স্ক্রিপ্ট লেখে। আর সেই থিমের বিন্যাস দিতে সামিমুল, নন্দিনীর মতো কত লোক নেমে পড়ে মাস মাইনের বিনিময়ে এদের ভাষাকে জনসমক্ষে পৌঁছে দিতে।

"এত জায়গা থাকতে হংকং কেন?" সামিমুলকে নন্দিনী প্রশ্ন করেছিল অঙ্কটা না বুঝেই।

"গল্পটা তো এখন হংকং-এরই। গেটওয়ে বিটুইন কমিউনিস্ট চায়না অ্যান্ড ক্যাপিট্যালিস্ট ওয়ার্ল্ড"

নন্দিনী অত ইজম বোঝে না। চ্যানেলের জন্য একটা আলোড়ন তৈরি করা স্টোরি তৈরি করতে হবে, এটুকুই এরশাদ সাহেব বলেছেন। সেই আলোড়নটা, দুই ইজমের যুগলবন্দির মধ্যে কী করে আসবে, নন্দিনীর মাথায় ঢোকেনি।

"অতশত বুঝি না। কী নিয়ে স্টোরি করবে, কিছু ঠিক করেছ?"

"একটা হুক মাথায় এসেছে। কিন্তু কীভাবে তাকে সাজাব ঠিক বুঝতে পারছি না"

"হুকটা কী?"

"পৃথিবী জোড়া এই চাইনিজ ইকনমির বাড়বাড়ন্তের পেছনে কাদের হাত আছে, সেটাই ইনভেস্টিগেশন করে তুলে ধরতে চাইছি"

"চাইনিজ কালচারের উৎকর্ষ নিয়ে স্টোরিটা করলে হয় না?" নন্দিনী তার নিজের মতো করে ইনোসেন্টলি জিজ্ঞেস করল।

"ধুস। ওই সব কালচারাল কচকচানি কে শুনতে চায়? মসলা চাই - বুঝলে নন্দিনী, মসলা চাই। মিডিয়া কোনো কালচারের ধ্বজা ধরে চলে না। মিডিয়া চলে সেনসেশনের ওপর। সেটাকেই স্টোরি করে বাজারে ছাড়তে হয়। সেটাই খায়"

দমে গেল নন্দিনী। ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এই ইকনমির কচকচানির মধ্যে সেনসেশনটা কোথায়? আর এর মধ্যে নিজের ভূমিকাটাও ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছে না।

"হোয়ার ডু আই ফিট ইন?" সামিমুলের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

"গল্পের ছবিটাকে রং দিয়ে সাজাতে"

মানে ছবিটা আঁকা হয়ে গেছে। শুধু রং বোলাতে হবে। তার নিজস্ব কোনো কেরামতি নেই। নিছক গুছিয়ে গল্প সাজানোর চিত্রপট তৈরি করা ছাড়া। ক্যানভাসে ছবি সাজাবার স্বপ্নেই তো নন্দিনীর এতগুলো বছর কেটে গেল। কিন্তু সেটা তো পূর্ণতার ছবি।

সামিমুল এ কোনো ছবি সাজাতে তাকে এ কাজে ভিড়িয়েছে?

"এত গুনি মানুষ আমাদের চ্যানেলে থাকতে, আমি কেন?"

"ক্রমশ প্রকাশ্য..."

কথা বাড়ায়নি নন্দিনী। চাকরি করতে এসে একটা জিনিস বেশ বুঝেছে, প্রশ্ন করা বাতুলতা মাত্র। অনুচ্চারিত ভাষাটা খুব স্পষ্ট। মাইনে পাচ্ছ, কাজ করে যাও - অত প্রশ্ন

কোর না। প্রশ্ন করলে কোনো অরগ্যনাইজেশন চলে না। সামিমুলের, নন্দিনীর চেয়ে, অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সে আরও বেশি কিছু করে দেখাতে চায়, যাতে এরশাদ সাহেব আরও বেশি খুশি হয়, তার সীমিত চৌহদ্দির মধ্যে।

হঠাৎ নন্দিনী মারফত এন্থনি মিত্রের এই বিশাল বলয়ের পরিব্যাপ্তির মধ্যে এসে হকচকিয়ে গেছে। ঢাকায় নন্দিনীর ক্ষুদ্র আর্ট ডিরেক্টরের জীবন থেকে সে যেন এক অন্য নন্দিনীকে দেখছে।

ব্যুটিকের সাদা ডিজাইনার কাফতানটায় ঝলমল করছে স্বারাভস্কি ক্রিস্টালের কাজ। ভিলার গার্ডেনের ফ্লাড লাইটের আলোর ঝিলিকে ঠিকরে উঠছে, আর এক অন্য সম্পূর্ণ অচেনা নন্দিনী। শতেক তারার মাঝে আপন আলোয় প্রোজ্জ্বল। যেন নিজেই একটা নক্ষত্র। নিজ মহিমায় বিচরণ করছে জমায়েত হওয়া নক্ষত্রের দরবারে।

নন্দিনীর যে এত সুদূরপ্রসারী কনট্যক্ট আছে, সামিমুল ভাবতেও পারেনি।

টনির পরনে লাল সার্টের ওপর সাদা স্যুট, সাদা টাই, সাদা জুতো। মুখে একটা স্মিত হাসি নিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করছে “মিট মাই চায়েল্ডহুড বেইব নন্দিনী। নাউ সি ইজ এ গ্রোন আপ লেডি। আফটার অল আই অ্যাম অ্যান ওল্ড ম্যান”

অতিথিদের মধ্যে থেকে একজন মধ্যবয়সি মহিলা বলে উঠল “হু সেইড ইউ আর ওল্ড? ইউ আর টুয়েন্টিটু ক্যারেট গোল্ড”

নন্দিনীর মনে হল, হয়ত মহিলা কথাটা ভুল বলেনি।

অজানা পরিবেশ। তার মধ্যে নিঃশব্দে সবাইকে দেখছিল নন্দিনী। আস্তে আস্তে পার্টির হাওয়া জমে উঠেছে। রঙিন পানীয়র রঙে সেজে উঠছে পার্টির মুখর পরিবেশ। যেন মহিলাদের বন্দনার আরাধনা চলছে তরল গরলের আন্তরিকতায়...

“ম্যম ইউ লুক গরজিয়াস” আচমকা এই কমপ্লিমেন্টে ফিরে তাকাল নন্দিনী। জমে ওঠা নেশার আসরে একজন আর্লি থারটিস ভদ্রলোক তার দিকে কথাটা ছুড়ে দিয়েছে।

ব্যঙ্গালুরুতে এসকরট সার্ভিসের অভিজ্ঞতায় এই কমপ্লিমেন্টস গুলো কেমন যেন ক্লিসে হয়ে গেছে। রঙিন জলের নেশার মাদকতায়, সন্ধ্যার ক্ষ্যান্তমনিও হয়ে ওঠে অপরূপা। সে তো শুধু আজ সন্ধের জন্য। সাজানো অপ্সরা কালকেই আবার হারিয়ে যাবে জীবনের চোরাবালিতে। আজকের স্তুতিকাররা ডুব দেবে দিনের আলোর সঙ্গোপনে, আপন মহিমায়

অস্তিত্বের মাহাত্ম্যকে প্রাধান্য দিয়ে, কালকের নেশার হ্যং ওভার কাটিয়ে নিজেদের মুখোস পরে।

তারপর?

একটা নিরবচ্ছিন্ন অঘোর ঘুমে নতুন স্বপ্ন দেখা। যা আজ, কাল হয়ে যাবে অতীত। যা আজ, নতুন কালে তা হয়ে যাবে বাসি। তবুও এ খেলা যেন কলিযুগের কালান্তরের খেলা। যতদিন না সত্যযুগ এসে মুছে দেবে এই অবক্ষয়ী মাদকতা। ঘুচিয়ে দেবে অতৃপ্তির চাদরে মোড়া নারীত্বের শ্লেষের মোহময় সুবাস।

এসব এলো কথার গুরুত্বটা ওই রঙিন জলের বালতিতে ফেলে দেয় নন্দিনী। জীবনের ছকের এক্কা-দোক্কার অঙ্কগুলো আর ভাল লাগে না। অপরূপা বেশের আড়ালে যে উড়ে বেড়াচ্ছে, তার অসম্পূর্ণ ক্যানভাসের অভ্যন্তরে ক্লেশে ঢাকা অবয়ব।

"থ্যঙ্কস" নন্দিনী মিষ্টি হেসে প্রত্যুত্তর জানিয়ে সরে গেল।

একটু ফাঁক দেখতেই, সামিমুল নন্দিনীর কাছে এসে বলল "তোমার টনিদা তো দেখছি এখানকার বেশ দাপুটে মানুষ। আগে জানতাম না তো!"

"আমিও জানতাম না। আর জানলেই বা আমার কী? ওর সঙ্গে তো আমার ছেলেবেলার সম্পর্ক। আমাকে বাচ্চা বয়সে কোলে করে রবীন্দ্র সরোবরে ঘোরাতে নিয়ে যেত"

"তোমার হন্যারে এত বড় পার্টি দিচ্ছে, তার মানে সম্পর্কটা বেশ অন্তরঙ্গ"

"সেটা টনিদার মর্জি। আমি তো পার্টি দিতে বলিনি"

সামিমুল নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল "এদের মধ্যে কয়েকজনকে যদি আলাদা করে ইন্টার্ভিউ নেওয়া যেত স্টোরিটা খুব জমত" একটু থেমে বলল "তোমার টনিদাকে বলবে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে?"

ধ্যস...

এখানেও ধান্দা? এরা কী ধান্দা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না?

এদের স্পাইন্যাল কর্ড থেকে পেরিফেরিতে প্রতিটা পদক্ষেপেই যেন ধান্দার বীজ পোঁতা আছে। একটা চেনা মধ্যাকর্ষণের বলয়ের মধ্যে ঘুরছে এরা। এদের এই রংগুলো চেনা। তাই দিয়ে কখনও ছবি আঁকা যায় না। চেনা ছবি - যা অস্পষ্ট হতে বেশিক্ষণ লাগবে না। মধ্যাকর্ষণের বলয়ের মধ্যে রংটাকে চিনে নিতে হলে, খেলতে হবে শুশুকের মতো। আগের

পেশার খেলাটা যেন এখন নেশা হয়ে যাচ্ছে, খুঁজে বেড়ানো রং-এর দিশায়। যা দিয়ে, নন্দিনী আঁকতে চায় তার না-আঁকা ছবি।

নন্দিনীর মনে হল এই বড় বড় সব টাইকুনরা পার্টিতে কেন আসে? নিজের অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখার জন্য? অনেকে আবার পার্টিতে আসে সামিমুলের মতো ধান্দা করতে।

"না। এতদিন পর দেখা। আমি ব্যক্তিগত কিংবা পেশাগত কোনো ধান্দা নিয়ে টনিদাকে কিছু বলতে পারব না। আমার কী একটা ডিগনিটি নেই? জাস্ট বিকস উই হ্যভ এক্সিডেন্টালি মেট" গম্ভীর ভাবে জবাব দিল নন্দিনী।

নন্দিনীর দৃঢ়তা দেখে থমকে গেল সামিমুল। বেশ কিছুদিন হল ওর সঙ্গে কাজ করছে। ইনটেলিজেন্ট, ডিলিজেন্ট, সিন্সিয়ার, হার্ড ওয়ার্কিং। তবুও কোথায় যেন স্বতন্ত্র। ঠিক বুঝে উঠতে পারল না এরশাদ সাহবে কেন ওকে এই কাজটার সঙ্গে যুক্ত করেছে।

এরশাদ শুধু বলেছিল "এটা কিন্তু সিক্রেট অপারেশন। আমারা তিনজন ছাড়া কেউ যেন জানতে না পারে..."

সিক্রেসির কারণটা না জানলেও কিছুটা আঁচ করতে পারে। এটা গ্লোবাল দাবা খেলার ছোট্ট একটা দেশীয় কভারেজ। ঠিক শিওর না হলেও, পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত চাইনিজ কম্যুনিজমের ভিতের গোড়াতে, অন্য কোনো শক্তির প্রভাবের একটা অস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠছে। খালি বুঝতে পারছে না, ওই আগামী দিনের ক্যানভাসে, কে বা কারা ছবিটা আঁকছে?

না বুঝেও ছবিটা আঁকতে হবে। সেখানেই এই জারনালিস্ট জীবনের সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি। এরশাদ যে শুধু শুধু ছবি আঁকতে চাইছে, তা নয়। নিশ্চয়ই পেছনে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের একটা অজানা অঙ্ক রয়েছে। গ্রে জারনালিজম। বুঝেও, তার ভাগীদার থাকতে হচ্ছে পেটের তাগিদে।

সেদিন এন্থনি মিত্রর ডিস্কোতে যাওয়ার আগে, নন্দিনীকে নিয়ে বেশ কিছু স্যুট করেছে। ডিজিট্যল ভিডিও ক্যমে ফটোগ্রাফি সামিমুলের। ভাষ্যকার কাম ইন্টার্ভিউয়ার নন্দিনী। স্টোরি আর স্ক্রিপ্ট তার তৈরি। আর তার চিত্রপটের ব্যকগ্রাউন্ড কনসেপ্ট, কম্পসিশন নন্দিনীর। শুধু ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই ইউনিটে।

এরশাদ সাহেব ডেলিবারেটলি সিক্রেসি মেন্টেন করতে চেয়েছে। গভীর সিক্রেসি।

হংকং-এর বিজনেস ডিসট্রিক্টে বেশ কিছু ইন্টার্ভিউ নিয়েছে। অনেকের সঙ্গে কথাও বলেছে। বিশেষ করে চাইনিজ ইকনমি কী ভাবে গ্লোবাল ইকনমির ওপর প্রভাব বিস্তার করছে।

একজন তো অকপটে বলেই ফেলল "বিফোর দ্য চাইনিজ অকুপেশন অফ হংকং, দেয়ার ওয়াজ এ ভাইব্রেন্ট ইকনমি ইন ভোগ। আফটার দ্য ব্রিটিশ হ্যন্ডিং ওভার চায়না, দ্য প্রেসেন্ট রেজিম হ্যস টেকেন এ ফুল কন্ট্রোল অফ আওয়ার মানি মার্কেট। নাউ ইট ইজ মোর অফ কিপিং দ্য রেইন্স ইন দেয়ার কন্ট্রোল, রেদার দ্যন প্লেয়িং ইন টিউন্স উইথ দ্য ডাউ জোন্স"

"সো আরেন্ট ইউ হ্যপি উইথ দ্য প্রেজেন্ট সিনেরিও?"

"ওয়েল উই হ্যভ টু ওয়ার্ক উইথ দ্য প্রেসেন্ট সিস্টেম। ইট ইজ ইমমেটিরিয়াল হোয়েদার উই লাইক ইট অর নট। ইট ইজ দেয়ার ওয়ে অফ মেন্টেনিং দেয়ার সুপ্রিমেসি ওভার ডাউ জোন্স, বেসিক্যলি দ্য অ্যামেরিকান ইকনমি। বিফর ইট ওয়াজ এ মোর ফ্রি মার্কেট। নাউ ইট ইজ মোর অফ এ স্টেট কন্ট্রল্ড মার্কেট"

"হোয়াট ডু ইউ ফোরসি ইন নিয়ার ফিউচার?"

"দ্য ইকনমি উইল বি টাইটলি রেগুলেটেড বাই দ্য স্টেট। অন হুইচ প্রিন্সিপ্যল দ্য কনট্রি উইল অপারেট, ইট ইজ ফর টাইম টু ডিসাইড। বাট ইট ওন্ট বি দ্য সেম অ্যাজ বিফোর"

বুঝতে পারছে, ওরা একটা র‍্যডিক্যল পরিবর্তনের আশংকা করছে। কিন্তু কী সেই পরিবর্তন, ঠিক বুঝতে পারছে না। হয়ত এরশাদ সাহেব এই পরিবর্তনের ছকে কোনো দাবা খেলছে। দাবার পুরো চালটা ঠিক আঁচ করতে পারছে না। এও বুঝতে পারছে না, বাংলাদেশের মতো একটা নগণ্য দেশ, কী ভাবে এই বড় খেলার হিসসা হতে পারে?

নন্দিনী বুঝে উঠতে পারছিল না এসব নিয়ে নিউজ তৈরি করে কী লাভ? সামিমুলের কথামত ইন্টার্ভিউ শেষে নন্দিনী বলল "এসব ইকনমিক প্যচপ্যচানি নিয়ে স্টোরি করে কী হবে?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। এরশাদ সাহেব বললেন। বোধহয় বড় টাকার খেল আছে। মরুক গে... আদার ব্যপারি জাহাজের খবরে দরকার কী?"

নন্দিনী বেশ বুঝতে পারছে, ইকনমির অংশটুকু না বুঝলেও, এর মধ্যে কোনো বড়সড় টাকার রফা আছে। তা না হলে এক সন্ধেতে মাছ ভাজা খাওয়া আর গল্প করার জন্য কেউ নন্দিনীকে দু-লাখ টাকা দেয়? হয়ত এই আন্ডারহ্যন্ড কিছু ইকোয়েশন আছে বলেই, প্রাইভেসি মেন্টেন করতে ইন্ডিয়া থেকে নন্দিনীকে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের মতো বিদেশে, নন্দিনীর নাড়ি-নক্ষত্র তার হাতের মুঠোয়। তাই অন্দরের কাহিনি জানলেও বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

এখন আর এরশাদকে ভাল লাগছে না। ব্যাঙ্গালুরুর হোটেলে বসে যতই ঔদার্য দেখাক না কেন, জ্যোতিকিরণের থেকে কোনো তফাত নেই। অন্তত জ্যোতিকিরণের মধ্যে কোনো হিপক্রেসি নেই। এসকরট সার্ভিস চালাচ্ছি এবং মহিলাদের ইচ্ছেয় দেহ ব্যবসা করাচ্ছি - ব্যাপারটা স্ট্রেট কাট। করলে করো না করলে ছেড়ে দাও। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

এ তো ঘোমটার তলায় খেমটা নাচা। আরও বেশি মারাত্মক!

"সাবাইকে বাদ দিয়ে, আমাকে ঠিক করল কেন এরশাদ সাহেব?"

সামিমুল ভিডিওটা কেসে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল "বলতে পারব না। তবে কিছুটা আঁচ করতে পারছি"

"কী?"

"বোধহয় লোকাল কাউকে নিলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। তুমি যেহেতু ইন্ডিয়ান, তোমাকে নিলে কোনো চিন্তা নেই"

"লোকালি জানলেই বা?"

"আমি কী করে বলব? নিশ্চয়ই ইণ্টারন্যল সিকিউরিটির কোনো প্রবলেম আছে"

কীসের প্রবলেম?

নন্দিনীর মাথায় ঢুকল না।

শুধু এটুকু বুঝতে পারছে, নিজের অজান্তে কোনো ইন্টারন্যশনল দাবার বড়ে হয়ে যাচ্ছে। এক অসম্পূর্ণতা থেকে আরেক অসম্পূর্ণতা। তার ওপর, এই বড় চক্করে জড়াবার ভয়টাও সঙ্গোপনে মনের ভেতরে ধুকপুক করছে। ধান্দার ফাঁদ পাতা সারা বিশ্বে। নিজের সরল বিশ্বাসে, সে বারবার সেই ফাঁদে পড়ছে। এই ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে জীবনের মধ্যে তো শান্তির রং নেই! শুধু আছে এগিয়ে যাওয়ার একটা দিকশূন্য র‍্যাট রেস।

সেখানে নন্দিনীর স্বপ্নের ছবিটা তো কোনোদিনও আঁকা হবে না। পড়ে থাকবে কিছু অগোছালো রং। সেই রং দিয়ে বারবার নানা রং-এর মেলায় একটা ছবি আঁকার চেষ্টা হবে, যা ক্লিসে হয়ে গেছে জীবনব্যাপী চেনা মানচিত্রে। তার মধ্যে কোনো মাধুর্য নেই। আছে শুধু ক্ষয়ে যাওয়া মানব সভ্যতার আপ্রাণ অস্তিত্ব রক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস, যা সময়ের ঝড়ে বিলীন হয়ে যাবে। সাদা পট সাদা থেকে যাবে। হবে না রঙিন তুলির স্পর্শে।

মহাকাল হাসবে অট্টহাসে পাগলদের মূর্খতার দাপানি দেখে। কালের নিয়মে, জীবন পার হয়ে, সবাই একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। সাদা ক্যানভাসটা হেসে উঠবে বিদ্রূপে - দ্য গ্লরি ইজ গন, ইয়েট ইউ হ্যভ ফেইল্ড টু ড্র এ সাউন্ড পিকচার অফ কমপ্লিটনেস? ইতিহাস পার হয়ে যাবে, যুগ থেকে যুগান্তরে। সব দৌড় মুছে যাবে মহাকালের পটে। ছবির কথা থাক, নিজের সিগনেচারটাও থাকবে না কোনো ঐতিহাসিকের অগোছালো ধূসর পাণ্ডুলিপিতে।

এই জীবন নিয়ে এত বড়াই করি আমরা?

পার্টির শেষে, ভিলার এয়ারকন্ডিশনড লাউঞ্জে, সাদা ইটালিয়ান লেদারের কাউচে বসে ড্র্যাম্বুই খেতে খেতে টনিদা বলল "সো হোয়াট নেক্সট? চাকরিতে ফিরে গিয়ে আবার দিনগত পাপক্ষয়?"

"তাছাড়া আর গতি কী?"

"এক দেশ থেকে আরেক। এক চাকরি থেকে আরেকটা বেটার চাকরি। দেন হোয়াট?"

"ভাবার সময় পাইনি টনিদা। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর শুধু সারভাইভেলের জন্য ছুটে মরেছি। নো মির‍্যাকেলস হ্যভ হ্যপেন্ড। এর নামই বোধহয় জীবন। আই নাউ টেক লাইফ অ্যাজ ইট কামস। মেক বেস্ট আউট অফ দ্য ওয়ার্স্ট"

"এই বয়সে আফটার অল দিস ওয়েলথ, হোয়েন আই গো টু বেড, দেয়ার ইজ অ্যান এলিমেন্ট অফ লোনলিনেস দ্যট এনগালফস মি। আই মিস মাই ওয়াইফ অ্যান্ড দ্য কিডস"

নন্দিনী বেশ বুঝতে পারছে টনিদার অসম্পূর্ণতা। সঙ্গে নিজেরটাও। যা বেশ কিছুদিন ধরেই তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। এভাবে তো জীবন চলতে পারে না। তাকে টেনে হিঁচড়ে চালানো যেতে পারে।

"ঘর তো সব মেয়েই খোঁজে। পায় কজন টনিদা?"

"কাউকে পেলে না?"

মাথা নাড়ল নন্দিনী। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল ড্র্যাম্বুই -এর গ্লাসটার দিকে চেয়ে। তারপর টনিদার দিকে তাকিয়ে বলল "ফিরে যাব ভাবছি। ফর বেটার অর ফর ওয়ার্স। কিন্তু খাওয়া থাকার একটা সংস্থান না করে কি ফেরত যাওয়া যায়? দিস ফরেনার্স আর নট মাই কাপ অফ টি"

"আমার এক বন্ধু কলকাতায় আলট্রা লাইফ মেরিন্স-এর ওনার। বেসিক্যলি ওরা কারগো শিপমেন্ট নিয়ে ডিল করে। যদি তোমার এটুকু ফেভার নিতে আপত্তি না থাকে, আই ক্যান টক টু হিম" একটু থেমে পাইপে টোব্যকো ভরতে ভরতে বলল "অফ কোর্স, দ্য পে মে নট বি হ্যন্ডসাম। বাট ইট উড বি রিসনেবল টু স্টার্ট অফ উইথ"

নন্দিনী ভাবছিল। ফট করে উত্তর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। দিতেও চায় না। এরশাদ সাহবে সম্বন্ধে যা আঁচ করছে, নাও হতে পারে। তাহলে এই চাকরিটা ছেড়ে অনির্দিষ্টের পথে পাড়ি দেওয়াটা কী ঠিক হবে?

"কয়েকদিন ভাবতে দাও। লেট মি পন্ডার ইট ওভার অ্যাট নাইট ওভার এ ফিউ পেগস"

সেদিন এই নিয়ে আর কথা না হলেও, হোটেলের ঘরে এসে নন্দিনী ভেবেছে। এতদিন ধরে তো বাঁচার তাগিদে, ভাগ্যের ক্যসিনোতে নিজেকে বসিয়ে খেলেছে। এখন হয়ত বা সময় হয়েছে জীবনের হাল ধরার। নারীর পূর্ণতা অর্থ উপার্জনের মধ্যে নয়। নারীর পূর্ণতা একটা নিটোল সংসারের অরবিটে। টনিদা যেন কক্ষপথ শূন্য নন্দিনীকে, সেই অরবিটে ফিরিয়ে আনার ডাক দিয়েছে। তার একাকী শূন্যতার মধ্যে, যেন মাঝরাতের অন্ধকার সেই গান শোনায়। টনিদা তার থেকে কত্ত বড়। সে যদি এত জাগতিক সার্থকতার মধ্যেও বেহাগের সুর শুনতে পায়, নন্দিনীও হয়ত একদিন শুনতে পাবে।

খালি দেরি না হয়ে যায়!

হংকং-এর কাজ শেষ হয়ে গেছে। এবার ঘরে ফেরার পালা। ঘর? নিজের মনেই হাসল নন্দিনী।

"কালকে সকাল সাতটায় ফ্লাইট। ঘুম থেকে উঠতে দেরি করো না" সামিমুল মনে করিয়ে দিল।

“কটায় পিক আপ করতে আসবে?”

“ফাইভ এ এম শার্প”

ফোনটা ডিস্কানেক্ট করে নন্দিনী ভাবল, কোথায় সে ফিরে যাচ্ছে? একটা হিপক্রিটিক চক্রে মানুষের অর্থলিপ্সার আরেকটা চোরাবালিতে, এই উন্মাদ ছোটার রেসকোর্সে, একটা সাজানো জকি। দিব্যি দেখতে পাচ্ছে এরশাদ সাহেবের চেসবোর্ডের অঙ্কটা। কোনো বিদেশি নিয়ামক দেশ যেন তাকে কিনে নিয়ে, কারোকে চেকমেট করতে চাইছে মোটা টাকার লেনদেনে। এরশাদ সাহেবের কথাগুলো মনে পড়ল ‘আমাগো চ্যানেলের একটা পাবলিসিটি দরকার। মানে এইসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র কইর‍্যা’। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তো লোকাল ব্যাপার। এ খেলা তার থেকে অনেক বেশি মারাত্মক। এরা পৃথিবীর বুকে নিজের অপূর্ণতাকে কভার-আপ করতে, নিজেদের স্বপ্নের ব্লু প্রিন্ট আঁকতে চাইছে তাদের নিজের মতো করে, একটা পুরনো চেনা ছবি খালি নতুন ক্যানভাসে।

ইতিহাস তার সাক্ষী। দু হাজার বছর ধরে কত লোক, কত ধর্ম, কত রাজা-বাদশা থেকে শুরু করে বর্তমান পৃথিবীর নিয়ামকরা সেই একই ছবি, নানা রঙে ক্যানভাসে আঁকতে চেয়েছে, দুনিয়ার মানচিত্রকে পাল্টে দিয়ে। তারপর কালস্রোতের দুর্বার ঝাপটায় হারিয়ে গেছে মহাশূন্যের ধাঁধায়। ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তাদের সাজানো ক্যানভাস মহাকালের প্রলয়স্রোতে।

রেখে গেছে এক অসীম শূন্যতা।

এখন কত রাত, কে জানে? পর্দা ফাঁক করে দেখল বাইরে রাতের আলোয় ঝলমল করছে হংকং সিটি। রঙিন নগরীটা যেন বিষাদের ছবি আঁকছে। পর্দা টেনে পোশাকহীন, বাথরুমে ঢুকল। বাথ সোপটা মাখতে মাখতে স্বপ্নের তুলি দিয়ে মনের ক্যানভাসে ছবি আঁকতে চাইছে। মধ্যরাতের একাকী স্তব্ধতায় নিজেকে আরেকবার খুঁজে নেওয়ার শেষ প্রহরের ঝালা। ছবিটা অস্পষ্ট হলেও এক আবছায়া সিল্যুট। আড়ম্বরহীন তাকে। তার নিজের আবছায়া প্রতিবিম্ব। এখনও স্বপ্ন দিয়ে আঁকা ক্যানভাসটা শূন্য। নিজের অস্তিত্বকে নতুন রঙে সাজানো! এক নতুন রূপে, নতুন তুলি দিয়ে আঁকা নতুন চিত্রপটে।

দূরের হংকং সিটির কোলাহল এখানে পৌঁছয় না। আবরণহীন অবয়বটাও বাথ সোপের ফ্যানায় চাপা পড়েছে। শুধু ক্লান্তির মধ্যে একটাই দ্বন্দ্ব। ছবিটা আঁকার আগে যে স্কেচটা

আসবে, সেটা কী রং-এর? উষ্ণ জলের মিঠে আমেজে সন্ধিক্ষণের কাঁসর ঘন্টার আওয়াজটা হয়ত দূরে কোথাও বাজছে। কিংবা কাছে।

নিজের মধ্যে...

চোখে যেন একটা অজানা রং ভাসছে। পেছনের ফেলে আসা চেনা-জানা বাহারি রং-এর বাইরে। সামনের না-জানা আগামীর অনিশ্চয়তার মধ্যে নয়। অন্তরের স্পষ্টতার মধ্যে।

ঝাপসা অস্পষ্ট একটা ছবি। চিনেও যেন অচেনা। রংহীন একটা অবয়ব। শুধু রঙটাই প্রয়োজন, আঁকা শুরু করতে।

কী সেই রং?

সাত

অসমা. ছবিটা মনে গেঁথে তার আশ্রয় খুঁজতে বেরল নন্দিনী। কিছু রং একত্র করেছে নিজের মনের অ্যাটাচি কেসে। কিছু খুঁজে নিতে হবে আগামীর থেকে। কিন্তু ছবিটা তো কোনো একদিন শুরু করতেই হবে।

"ফ্রেইটের কোটটা পাঠিয়ে দিয়েছ?"

"এই প্রায় হয়ে গেছে স্যার। লাস্ট চেক করছি। এক ঘণ্টার মধ্যে মেল পাঠিয়ে দেব"

"আমাকে ফাইন্যাল কপিটা দেখিয়ে নিও। দেখো যাতে আজকের মধ্যে চলে যায়। অর এলস উই মাইট লুস দ্য ডিল"

"পসিটিভলি স্যার। হয়ে গেছে। জাস্ট ফাইনাল চেক করছি"

ইন্টারকমটা ডিসকনেক্ট করে দিল আলট্রা মেরিন্সের মালিক সুখেন্দু বড়ুয়া। ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের ফারনিসড এয়ার কন্ডিশনড ঘরে সুখেন্দু স্যরকে পাঠাবার আগে শেষ বারের মতো কম্পিউটারের এক্সেলে চোখ বোলাচ্ছিল নন্দিনী। ফাইন্যাল চেক শেষ হতেই বেলটা টিপল।

ভজহরি ঘরে ঢুকতেই কম্পিউটার থেকে মুখ তুলে বলল "এক কাপ চা দে তো"

টনিদা ঠিকই বলেছিল। ভ্যগাবন্ডের মতো এভাবে ঘুরে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই। কমপ্লিটনেসটা ওই ঘরের মধ্যেই। আর সেই ঘরটা যদি জন্মভূমিতে হয়, তার থেকে ভাল আর কী হতে পারে?

অনেক ভেবে এরশাদ সাহেবের চাকরিটা ছেড়ে, টনিদার বন্ধু সুখেন্দু বড়ুয়ার আলট্রা মেরিন্সে যোগ দিয়েছে। নিজের পুরনো শহর চেনা কলকাতায়। অনেক তো ঘোরা হল। অনেক তো দেখা হল। অনেক তো বোঝা হল। ছবিটা যে এখনও অস্পষ্ট সিল্যুট। মনের ক্যানভাসে কিছু রং চড়িয়েছে বটে, কিন্তু কিছুই আঁকা হয়নি। এখনও ক্যানভাসটা অসম্পূর্ণ। এবার সময় হয়েছে জড় করা রং দিয়ে ছবিটা আঁকতে শুরু করার।

হেস্টিংসে একটা ছোট্ট দু কামরার ফ্ল্যাট দিয়েছে আলট্রা মেরিন্স। এই কমপ্লেক্সে বাঙালি নেই বললেই চলে। তবে ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুম থেকে সন্ধের হুগলী নদী, কিংবা নতুন

রঙে আলোর মালায় সেজে ওঠা বিবেকানন্দ সেতুর দিকে তাকিয়ে থাকতে খারাপ লাগে না।

সেই সামেনের আলো-আঁধারি বিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে ছিল নন্দিনী।

দূরে ওপাশের রামকেষ্টপুর ঘাটের টিমটিম করা আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে। একটা আবছায়া অন্ধকার মেশানো অতীত পেরিয়ে ওটাই একমাত্র ছবি।

পেছনের ঘর থেকে ঝলমলে রাতের কলকাতাকে দেখা যায় না। দেখবার ইচ্ছেও নেই নন্দিনীর। ওখানে পড়ে আছে তার স্মৃতি বিজড়িত সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা আজ ট্যনড, বিক্ষিপ্ত জীবনের ছন্দে। হয়ত ইন্দ্রনীল তার সুখের নীড় সাজিয়েছে, ওই আলো ঝলমলে শহরের কোনো এক ফ্ল্যাটে অন্য কেউ। সেখানে হাজার হাঙরের মতো ঋতব্রতরা অন্য কোনো নারীদের নিয়ে ভেঁজে চলেছে নতুন সঙ্গমের বোল, কোনো নাট্যমের পুরনো আকুতিতে। বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই নন্দিনীর সেই পৃথিবীতে।

রামকেষ্টপুর ঘাটের টিমটিম আলোয় সে দেখতে পাচ্ছে আগামীর ক্যানভাস। নিজের একটা অচেনা ছবি। যা আলো ঝলমলে রং-এর বাইরে। তার মনের গভীর গোপন কোনায় গাঁয়ের বধূর মতো তুলসীতলায় সন্ধ্যারতির ছবি। প্রকৃতির।

মোবাইলটা বেজে উঠল। ওপাশে সুখেন্দু স্যর।

“বলতে ভুলে গেছিলাম। কালকে অফিসে আসার আগে তোমার বাড়ির কাছেই মেরিন হাউস হয়ে এস তো একবার। আমাদের আর্জেন্টিনার এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা আটকে আছে। যদি পার ক্লিয়ারেনন্সটা করিয়ে নিতে...”

“কার সঙ্গে দেখা করব স্যর?”

“ঠিক বলতে পারছি না। খুঁজে নিও। আমাদের অ্যাপ্লিকেশন-এর রেফারেন্স নম্বরটা এস এম এস করে দিচ্ছি। ওখান থেকে ট্র্যাক করে নিও”

“শিওর স্যার”

ফেনটা ডিসকানেক্ট করে দিল সুখেন্দু বড়ুয়া।

কোথায় যাবে বুঝতে পারছিল না নন্দিনী। মেরিন হাউসের রিসেপশনে জিজ্ঞেস করতে বলল “ফরেন ক্লিয়ারেন্স সেকশনে চলে জান। ওরা বলতে পারবে”

“ওটা কোথায়?”

“লিফটম্যানকে জিজ্ঞেস করুন। বলে দেবে” বেশি সময় নষ্ট করতে চাইল না মহিলা।

“দাঁড়ান এখনই বললে তো আর বার করা যাবে না। সময় লাগবে। লবিতে গিয়ে বসুন। আপনার নাম আর মোবাইল নম্বরটা এখানে লিখে রেখে যান। খুঁজে দেখি। আপনাকে ডেকে নেব”

টিপিক্যাল গভর্নমেন্ট অফিসের বড়বাবুদের মতো কথা। কিছুই করার নেই। সুখেন্দু স্যর যখন কাজটা করে যেতে বলেছেন, বসে থেকে করে যেতেই হবে। অগত্যা লবিতে বসে মানুষের আনাগোনা, কথোপকথন দেখা ছাড়া, আর কী করার আছে?

কতক্ষণ যে এভাবে কেটে গেছে খেয়াল করেনি নন্দিনী।

পাশের লোকের কথায় ঘাড়টা ঘোরাল “এখানে সময়ের কোনো দাম নেই”

ঠিক বুঝে উঠতে পারল না এটা স্বগতোক্তি, না নন্দিনীকে উদ্দেশ করে বলা। আবার আপাদমস্তক দেখল লোকটিকে। বছর তিরিশের মতো বয়স। ক্লিন শেভন। পরনে একটা লাইট খয়রি ট্রাউজার ও সাদা হাফ সার্ট।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুখ তুলে নন্দিনীর দিকে ফিরে বলল “আপনি কতক্ষণ ধরে বসে আছেন?”

“প্রায় হাফ অ্যান হাওয়ার তো হলই”

“আই অ্যাম ওয়েটিং ওভার অ্যান আওয়ার জাস্ট টু গেট এ সিম্পল থিং ডন”

“আপনি কী কোনো দরকারি কাজে এসেছেন?” বলে ফেলেই নন্দিনীর মনে হল, কেন যে দুম করে কথাটা বলে ফেলল? সচরাচর অচেনা লোকের সঙ্গে এরকম দুমদাম কথা তো বলে না।

“আমি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। প্রত্যেক পাঁচ বছরে আমাদের লাইসেন্স রিনিউয়াল করতে হয়। সেই জন্যই এসেছিলাম। এখন তো দেখছি এদের আঠেরো মাসে বছর। প্রবলেমটা হচ্ছে আমাকে আজকেই রিনিউ করতে হবে। কালকের ফ্লাইটে আমায় মুম্বই গিয়ে শিপ বোর্ড করতে হবে”

“আপনার হাতে তাহলে সময় নেই”

“যা কিছু আজকের মধ্যেই করতে হবে। আই ডোন্ট হ্যভ এ চয়েস” অ্যাক্সেন্ট শুনে মনে হচ্ছে কনভেন্টে পড়া।

লোকটির কথাটা টেনে নিয়ে বলল "আপনার তো তাহলে শিরে সংক্রান্তি"

"বলে কথা। লাইসেনস ছাড়া আমি শিপ বোর্ড করতে পারব না। আই অ্যাম জাস্ট অ্যাট এ লস। আই হ্যভ নো আদার অল্টারনেটিভ। কিছু তো করার নেই। যতক্ষণ হোক, বসে কাজটা শেষ করে যেতে হবে" নন্দিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল "আপনি কীসের জন্য এখানে?"

"অফিসের একটা কাজে এসেছি"

"তাহলে ভাগ্যবান বলতে হবে। এমন কোনো কম্পালশন নেই যে আজকের মধ্যে শেষ করতে হবে"

"বলতে পারেন। অন্তত আপনার মতো অতটা আরজেন্সি নেই"

সত্যি কী নেই? নতুন চাকরিতে জয়েন করেছে। কাজটা কমপ্লিট করে না যেতে পারলে, ভাল ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করতে পারবে না। টাইমের দিক থেকে কম্পালসন না থাকলেও, ক্রেডিবিলিটির দিক থেকে আছে। কোথায় যেন একটা অলিখিত দায়বদ্ধতা থেকে যায়।

এক... দেড়... দুই ঘণ্টা। ঘড়ি দেখে লাভ নেই। দু-দুবার নন্দিনী উঠে গিয়ে খোঁজ নিয়েছে। একটাই তির্যক উত্তর "আমার কী আর কোনো কাজ নেই? দেখছেন না কত কাজ পড়ে আছে? লবিতে গিয়ে বসুন। সময়মতো ডেকে নেব"

অগত্যা আবার অপেক্ষা। খিদেও পাচ্ছে। সকালে কুঁড়েমির জন্য ব্রেকফাস্ট করাও হয়নি। ওই লোকটি বসে থাকতে থাকতে কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে। নন্দিনী ওর পাশে বসে বলল "কী জানি কখন হবে। আমার খিদে পেয়েছে। এখানে কোনো ক্যান্টিন আছে?"

নন্দিনীর কথায় ঝিমুনিটা কেটে গেল। তাকিয়ে বলল "হ্যাঁ। চলুন আমিও যাই। আমারও ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে"

ক্যান্টিনে বসে দুজনে দুটো থালি অর্ডার দেওয়ার পর লোকটি বলল "আমার নাম অর্ণব। অর্ণব চৌধুরী"

"নন্দিনী" পদবিটা এড়িয়ে গেল নন্দিনী।

মহিলাদের কী কোনো স্ট্যাটিক পদবি হয়? নামটারও বা কোনো মূল্য আছে? একমাত্র কাউকে সম্বোধন করা ছাড়া। ঠিক যেন সাদা কানভ্যাসে একটা রং লাগানোর মতো। যে

রং লাগাও, সেটাই। যে নামই দাও না কেন, সেটাই সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য। তার সঙ্গে মানুষটার এক সামাজিক পরিচয় ছাড়া আর কতখানি সংযোগ, সেটা ভাববার বিষয়।

"কী অদ্ভুত জীবনটা, তাই না? আপনার সঙ্গে দেখা হল, বেশ কয়েকঘণ্টা একসঙ্গে কাটালাম, তারপর যে যার পৃথিবীতে হারিয়ে যাব। অনেকটা ছবি আঁকার মতো। ছবিটা আঁকলাম। তারপর কোনো এক দমকা হাওয়ায় ছবিটা উড়ে গেল" অর্ণব নিজের মনেই আওরাল।

"সব ছবি যে টেম্পোরারি, কে বলল? পার্মানেন্টও তো হতে পারে..."

অর্ণব ঠিক বুঝে উঠতে পারল না নন্দিনী কী বলতে চাইছে। মাংসে কামড় দিয়ে নন্দিনীর চোখের দিকে তাকাল।

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দৌলতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘোরার সৌভাগ্য হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের নিবিড় সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য যে হয়নি, এমনও নয়। তবে এর আগে এমন তীক্ষ্ণ বলিষ্ঠ দৃষ্টিতে কোনো মহিলাকে তার দিকে তাকাতে দেখেনি।

কাজল চোখ দুটো যেন অন্তরের প্রতিবিম্বের ক্যানভাস। কোনো কবির ছন্দে আঁকা কল্পনা নয়। কোনো আর্টিস্টের কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকা স্বপ্নের ছলনা নয়। কোনো সুরকারের নতুন রাগের বন্দনা নয়। জীবন্ত বাস্তবের রংহীন জলছবি। সেখানে কোনো উদ্দাম যৌবনের আকর্ষণ নেই। আবার পরিত্যক্ত কোনো অবহেলা নেই। কোনো আমন্ত্রণ নেই। কোনো বিসর্জন নেই। কোনো ভড়ং নেই। কোনো ছলাকলাও নেই। একটা স্বভাবিক জীবন্ত ছবি। কোনো ক্যানভাসের রং মাখানো জলছবি নয়।

শুধু একটা অতি সাধারণ মেয়ের, নিবিড় গভীরতা।

"পার্মানেন্ট কী করে হবে বলুন? আপনার কাজ হয়ে গেলে আপনি চলে যাবেন। আমার কাজ হলে আমিও চলে যাব। তারপর কাল বাদে পরশু অন্য কোনো দেশে পাড়ি দেব। সব কিছুই রেলেটিভ, ক্ষণস্থায়ী। কোনো কিছুই পার্মানেন্ট নয়"

"আপনি থাকেন কোথায়?"

"বাড়ি একটা আছে কলকাতায়। পৈতৃক বাড়ি। আমার তো সেখানে আপন কেউ নেই। কলকাতায় এলে ওখানে উঠি। বাকি সময় বন্ধ থাকে। একজন এস্টেট এজেন্টকে দায়িত্ব

দিয়ে রেখেছি। ওরাই দেখাশোনা করে। বিল মেটায়। আপনি?”

“এই কাছেই হেস্টিংসে কম্পানির ফ্ল্যাটে। যে ভাবে এগোচ্ছে মনে হচ্ছে যদি লাকে থাকে টি-টাইমে কাজটা উদ্ধার হবে”

টি টাইমের কিছুটা আগেই কাজটা শেষ পর্যন্ত হল।

যে বাবু লাইসেন্সিং বিভাগে আছেন ফাইলটা দেখে বলল “ইশ! এতদিন ধরে পড়ে আছে! আসলে এখানে যে কাজ করতেন তিনি রিটায়ার করেছেন। এই থ্রি উইক্স হল আমি জয়েন করেছি। সব ব্যাকলগ এখনও দেখে ওঠা হয়নি। আপনি বাড়ি চলে যান। কালকে আপনাদের আলট্রা মেরিন অফিসে আর্জেন্টিনার এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা চলে যাবে বাই কুরিয়ার”

সুখেন্দু স্যরকে কথাটা জানাতে ওপাশ থেকে বললেন “এখন আর অফিসে এসে কী করবে? কাজটা যখন হয়ে গেছে, বাড়ি চলে যাও। কুরিয়ারের জন্য অপেক্ষা না করে, কালকে বরং আসার আগে ওনার কাছ থেকে এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা হাতেনাতে নিয়ে এসো”

বাড়ি চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ মেরিন হাউস থেকে বেরবার মুখে অর্ণবের সঙ্গে আবার দেখা।

“শেষ পর্যন্ত হল?”

“হ্যাঁ। শেষমেশ কাজটা নামল। আপনার?” স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নন্দিনী বলল “সারাটা দিন যা ধকল গেল”

“আমারটাও হয়েছে। তদবির তাগাদা দিয়ে করিয়ে নিলাম”

“এখন কোথায়? বাড়ি?”

“বাড়ি গিয়ে কী হবে? ওখানে তো রান্না করার কেউ নেই। এই চক্কর মেরে হোটেলে খেয়ে বাড়ি ঢুকব”

নন্দিনীরও তো সন্ধেবেলা কিছু করার নেই। একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিল। অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল “বেশ তো চলুন না আমার ফ্ল্যাটে। আহামরি কিছু খাওয়াতে পারব না। তবে বাড়িতে যা আছে খাওয়াতে পারি। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে...”

বলে ফেলেই ভাবল, এরকম হঠাৎ আলাপে আগে তো কাউকে এভাবে ফ্ল্যাটে ডাকেনি। হঠাৎ অর্ণবকে আমন্ত্রণ জানাল কেন?

মাঝে মাঝে মানুষ এমন অনেক কিছুই করে ফেলে যা তার হিসেবের বাইরে। কেন করে, এটা জানতে পারলে হয়ত নিয়তির কেমেস্ট্রিটা জানা সম্ভব হত। দুম করে যখন বলে ফেলেইছে, তখন তো আর ফেরত যাওয়া যায় না। তেমন কী আর করতে পারে? তার ভয় পাওয়ার কী আছে? অন্যান্য শহরের তুলনায়, কলকাতায় সে অনেক বেশি সিকিওরড।

ফ্ল্যাটের সোফায় হেলান দিয়ে অর্ণব নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বলল "এটা রাখুন। আপনার নিশ্চিন্তির জন্য"

কার্ডটা নিয়ে একটু হেসে নন্দিনী বলল "আমি এমনিতেই নিশ্চিন্ত। তা না হলে আপনাকে বাড়ি বয়ে ডেকে আনতাম না। কম বয়েসে বাবা-মাকে হারাবার পর এতদিন তো একাই চলেছি। আমার খুব একটা ভয়ডর নেই" একটু থেমে কার্ডটা লেদার পার্সে ঢুকিয়ে বলল "পরে যোগাযোগের জন্য রেখে দিলাম। আমি সদ্য এই চাকরিটায় জয়েন করেছি। এখনও কার্ড ছাপা হয়নি। আপনার নম্বরে একটা মিসড কল দিচ্ছি। সেভ করে রাখুন"

নম্বরটা সেভ করতে করতে অর্ণব বলল "নামটা?"

"নন্দিনী"

পরিচয়টা যে শেষ পর্যন্ত রেজিস্ট্রি অফিসে পৌছবে, ভাবতেও পারেনি। কথায় আছে ম্যারেজেস আর মেইড ইন হেভেন, সেলিব্রেটেড হিয়ার অন আর্থ

সেই হেভেনটা আর্থে নেমে এল একাকী সোহাগ রাতে।

নন্দিনী প্রশ্ন করেছিল "হঠাৎ আমাকে পছন্দ হল কেন?"

অর্ণব নন্দিনীর কপালে চুমু এঁকে দিয়ে বলেছিল "ইউ আর ডিফারেন্ট"

"কী ভাবে?"

"তোমার মধ্যে আমি নারীত্ব পেয়েছি" নন্দিনী থেকে সরে বেডসাইড টেবল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে বলল "ইউ আর নট দ্য ফার্স্ট লেডি উইথ হুম আই হ্যভ

ইন্টারঅ্যাক্টেড অর স্লেপ্ট উইথ। দেয়ার হ্যভ বিন মেনি ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। কিন্তু তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা তুমি নিজেও জানো না"

নন্দিনী চুপ করে আছে। এর আগে তো এমনভাবে কেউ তাকে দেখেনি। এর আগে তো এমন কথা কেউ আগে বলেনি। কী এমন আছে ওর মধ্যে, যা ও জানে না অথচ অর্ণব জানে?

মনের জানলার তো চারটে দিক আছে। নিজের জানা, সকলের জানা। নিজের জানা, সকলের অজানা। কোনো সে দিক, যা নিজের অচেনা, অথচ অন্যদের জানা?

নন্দিনীকে চুপ করে থাকতে দেখে কোনো ভণিতা না করেই অর্ণব বলে চলল "নারীত্ব শুধু ফিসিক্যল ডিস্পসিশন দিয়েই হয় না। তার বাইরে সম্পূর্ণতার ছবিটা দেখার চোখ চাই"

"সে ছবিটা কী?" নন্দিনী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"সমর্পণ, রিসেপশন, আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ততা, সেন্সুয়ালিটি কত কিছু আছে"

নন্দিনী হেসে বলল "আজকেই তো বিয়ে হল। এর মধ্যেই এত কিছু দেখে ফেললে?"

"সব দেখেছি কে বলল? সারা জীবন তো পড়ে আছে সব দেখার। ফটোগ্রাফারের চোখ তো। কিছু কিছু দেখতে পাই"

"তুমি ফটোগ্রাফার? জানতাম না তো"

"পেশাদারি নয় - শখের। সে নেশা হোক আর পেশা হোক, দেখার দৃষ্টিটাই আসল"

নন্দিনী একটু আশ্চর্য হল। এভাবে তো এর আগে কেউ অন্যরকম ভাবে দেখেনি তাকে।

ইন্দ্রনীলের কাছে ভালবেসে নিজেকে সমর্পণ করেছে নন্দিনী। খাজুরাহতে তার দেহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঋতব্রত। ব্যঙ্গালুরুতে নিজেকে নিলামে চড়িয়েছে লাখ-দুলাখের বাজিতে। সব জায়গাতেই সে থেকে গেছে একটা দেহ। কোথাও তো কেউ তার অন্তরের ছবি দেখতে চায়নি কিংবা আঁকতে চায়নি। দেহটা যে জীবনের চলার পথে একটা সামগ্রী, সে ভাবেই নিজেকে নিয়ে এগিয়ে চলেছিল নন্দিনী।

চমকে উঠল অর্ণবের কথায়। অর্ণব যেন নন্দিনীর নতুন একটা ছবি, নিজের ফটোগ্রাফিক দৃষ্টি দিয়ে আঁকতে চাইছে, নন্দিনীর না-চেনা ক্যানভাসে। যে ছবি নন্দিনীর

এখনও অচেনা। পরিচ্ছন্ন ক্যানভাসে নিটোল একটা স্বপ্নের ছবি। ভবিষ্যতের ছবি। আগামী দিনের শান্তির ছবি। আগামী দিনের পূর্ণতার প্রতিমূর্তি।

"কোথায় একটা অজানা মিল আমাদের জুড়ে দিয়েছে। তুমি ফটোগ্রাফার, আমি পেইনটার। তোমার মতোই শখের। ছবি আঁকা আমার বরাবরের নেশা"

"মিডিয়ামটা যাই হোক না কেন, দেখাটাই আসল। কে কী ভাবে দেখছে। মাইক্রোস্কোপিক, না টেলিস্কোপিক, না বার্ডস আই ভিউ দিয়ে..."

নন্দিনীর মনে হল, অর্ণবের কথার মধ্যে একটা নিজস্ব দৃষ্টি আছে। ওর নিজস্বতা। পেশার বাইরে, এই দৃষ্টিটাই ওকে একটা স্বতন্ত্র জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সেই জন্যই বোধহয় ভগবান ওদের দুজনকে একই মালায় গেঁথে দিয়েছেন একটা পূর্ণতার ছবি আঁকতে। দৃষ্টির শার্পনেসে, মনের রং-এর সংমিশ্রণে।

রজনীগন্ধার মালাটা একদিন বাসি হয়ে যাবে। একদিন তরতাজা ফুলগুলো শুকিয়ে খসে পড়ে যাবে। ফুলশয্যাটাও ফুলের সাজ হারিয়ে ফেলবে সময়ের ব্যাপ্তিতে। পড়ে থাকবে কিছু মধুর স্মৃতি, কিছু হারানো অতীত। কিন্তু জীবনের ছন্দের স্পন্দনে সাঁকোর মতো জড়িয়ে থাকবে এই অদৃশ্য মালার বর্ণাঢ্য সম্ভার। সেটাই পাথেয়, যা আগামী দিনের ক্যানভাসে একটা পূর্ণতার ছবি আঁকবে। মলিন হবে না সময়ের বিবর্তনে।

কিন্তু সময়ের প্রবহমানতা কী ক্যানভাসে একটা নির্দিষ্ট ছবি আঁকতে দেয়?

আট

আসানসোলের আফতার গার্ডেনে বড় হওয়া বড়লোক বাপের ব্যাটা ইন্দ্রনীল কলকাতায় পড়বে। এ যেন ক্লাস এইট পাস কয়লা ব্যবসায়ী রুদ্রনীল সেনগুপ্তর হাতে চাঁদ পাওয়া। তার অনেক ফ্ল্যাটের মধ্যে ছেলের থাকার জন্য উপহার দিয়েছিল কাকুলিয়া রোডের এই ফ্ল্যাটটা। সঙ্গে একজন ফুল-টাইম কাজের লোক।

"হস্টেলে সিট পেলাম না" বিমর্ষ হয়ে বলেছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী, তার পরিচিত আসানসোলের মেয়ে শ্রীমিতা "দেখি এবার একটা পিজি অ্যাকমডেশন খুঁজতে বেরতে হবে"

"কেন? আমার বাড়িতে থাকলেই তো পার। অবশ্য তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে" একটু থেমে বলেছিল "এক ঘরে থাকতে হবে না। থ্রি রুমড ফ্ল্যাট। সঙ্গে ফুল টাইম কুক"

"কত দিতে হবে?"

"থাকার জন্য কিছু দিতে হবে না। খাওয়া খরচটা শেয়ার করলেই হবে"

আইডিয়াটা মন্দ নয়। রেডিমেড পিজি অ্যাকমডেশন। একটু ইতস্তত করছিল। একজন ছেলের সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে থাকবে? পরে মনে হল পিজি অ্যাকমডেশনে যে কোনো ছেলের সঙ্গে থাকতে হবে না, এমন গ্যারান্টি কি কেউ দিতে পারে? একজন অচেনা ছেলের সঙ্গে থাকার থেকে, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে থাকা অনেক ভাল। খুব পরিচিত না হলেও, একেবারে তো অচেনা নয়।

প্রথম আলাপ হয়েছিল জুবিলি রিসর্টে একটা ইন্টারস্কুল পার্টিতে। শ্যামলা হলেও মুখশ্রী আর ভরাট শরীরটার দিকে নজর পড়েছিল ইন্দ্রনীলের। উঠতি যৌবন, রঙিন পিতৃদেব, পারিবারিক সূত্রে ইনহেরিট করা মহিলা সংস্পর্শ ইন্দ্রনীলের কাছে নতুন নয়।

মা আপত্তি করলে বাবা প্রতিবাদ করত "এই বয়সে মেয়েদের সঙ্গে মিশবে না তো কী শেষ বয়সে মিশবে? যখন আর কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না, তখন আর মিশে কী করবে?"

"তবু ছেলেটা যে এত মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছে, পড়াশোনায় ক্ষতি হবে তো" মায়ের সবসময়ই চিন্তা।

"আমার ছেলে বলে কথা। সব করেও দেখো ভাল রেসাল্ট করবে। ঈশ্বর যখন দিয়েছে ওটায় কি কোট ঝুলিয়ে রাখবে? ব্যবহার না করলে যে অচল হয়ে পড়বে" রুদ্রনীল তার পথেই ছেলেকে দীক্ষিত করেছিল।

মায়ের ভয় করত, সচল রাখতে গিয়ে গুটিকয়েককে না বাঁধিয়ে ফেলে। অবশ্য রুদ্রনীল সেনগুপ্তও বদ্যির ব্যাটা। খালাস করাতে সিদ্ধহস্ত। নিজে তো কম মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করেনি। এও মায়ের অজানা নয়, পেটে বাচ্চা এলেই কয়েকটাকে চুপিসারে খালাস করিয়েছে। সতীসাধ্বী স্ত্রী নীরবে দেখে গেছে। এত বছরে ওনার রাগটাও তো কম দেখেনি। তেমন কিছু বলতে গেলে খতম পর্যন্ত করে দিতে পারে। অতএব করিতকর্মা বাপের সুযোগ্য পুত্র পড়ার ফাঁকে রঙিন দুনিয়ায় ভাসবে, এ আর আশ্চর্য কী?

জুবিলি রিসর্টে সেই জন্যই যাওয়া। অবশ্য শ্রীমিতার সঙ্গে সে রকম কিছুই হয়নি। রিমঝিম আলাপ করিয়ে দিয়েছিল শ্রীমিতার সঙ্গে "আমার স্কুলের বন্ধু শ্রীমিতা"

"তুমিও কী রিমঝিমের মতো লরেটো কনভেন্টে পড়?"

"হ্যাঁ" সম্মতি জানাল শ্রীমিতা।

"ও খুব ভাল গান করে" রিমঝিম বলেছিল।

"রবীন্দ্রসংগীত?"

"না আধুনিক" শ্রীমিতা বলেছিল।

"হিন্দি গান জান?" মাথা নেড়েছিল শ্রীমিতা।

রাত গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পার্টির ভিড় আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে। এটা স্কুলের ছেলেমেয়েদের পার্টি। তাই বাবা-মায়েদের কড়া হুকুম ন'টার মধ্যে ফিরতে হবে। বেশিভাগ ছেলেমেয়েই তাদের অভিভাবকদের হাত ধরে গুটি গুটি পায় বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে।

শ্রীমিতাকে নেওয়ার কেউ নেই। রিমঝিমের দিকে তাকিয়ে বলল "আমি চলি রে"

"যাবি কী করে?"

"একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাব"

কথাটা ইন্দ্রনীল শুনতে পেয়েছিল। বলল "তাড়া কীসের? আমার গাড়ি আছে। আমি নামিয়ে দেব। তোমার গান তো শোনা হল না। চল, আমরা মাঠে গিয়ে বসি। তোমার কয়েকটা গান শুনব। তারপর তোমাকে আর রিমঝিমকে বাড়িতে নামিয়ে দেব"

ইতস্তত করলেও, শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনীলের পিড়াপিড়িতে বেশ কয়েকটা গান শুনিয়েছিল। কথামত জুবিলি রিসর্ট থেকে বেরিয়ে, শ্রীমিতাকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে, ওরা গাড়ি নিয়ে চলে গেছিল।

আলাপটা অতটুকুই।

তারপর প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুবাদে ক্যাম্পাসেই দেখা। তবু তো ইন্দ্রনীল চেনা না হলেও কিছুটা অন্তত চেনা। এক মফসসলের শহর থেকে কলকাতায় পড়তে আসা। তাই ইন্দ্রনীল যখন প্রপোসলটা দিল, শ্রীমিতার মনে হল মন্দ কী? পিজি অ্যাকমডেশনে যখন অচেনা লোকের সঙ্গে থাকতে হবে, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কী?

অতএব কাকুলিয়া রোড।

একই ছাদের তলায় দুটি পৃথক ঘরে অবস্থান। কলেজ জীবনে বিভিন্ন বন্ধুদের আনাগোনা। তাদের মধ্যে পাড়ার নন্দিনীরও। শ্রীমিতা গান গাইত। আশা ভোশলে থেকে গীতা দত্তর পুরনো দিনের গান। কিংবা সুনিধি চৌহান থেকে শ্রেয়া ঘোষাল। নন্দিনী চুপ করে শুনত। কিন্তু কখনই ওদের কাছে প্রকাশ করেনি যে ওর ক্লাসিক্যল গানে তালিম আছে। চুপচাপ শুনে ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে। যেহেতু এক পাড়াতেই বাড়ি, তাই অনেক সময়ই ফেরার তাড়া ছিল না। এমনও হয়েছে, যখন ওরা সবাই চলে গেছে ইন্দ্রনীল, শ্রীমিতা আর নন্দিনী একটু বেশি রাত পর্যন্তই একসঙ্গে বসে আড্ডা মেরেছে। ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেনি, যে ইন্দ্রনীল আর শ্রীমিতার মধ্যে ফ্ল্যাটমেট ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে।

সম্পর্কটা ফ্ল্যাটমেটের পর্যায়ই ছিল। আসানসোল ছাড়ার পর কলকাতার নতুন পরিবেশে পৈতৃক সূত্রে ইন্দ্রনীলের জাগ্রত পৌরুষ তখনও অচেনা শহরে মাথাচারা দিয়ে ওঠেনি। নতুন শহর, হালচাল বুঝতে টাইম লাগবে। বড় শহরে বৈচিত্রময় অত মহিলার

মধ্যে, কে যে কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে, ইন্দ্রনীল তখনও ঠাহর করে উঠতে পারেনি। ভয় শুধু একটাই - এডস না হয়ে যায়!

নিজের তৃপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল নিজেকে। শ্রীমিতাও ডুবে ছিল তার মেয়েবন্ধুদের নিয়ে নিজের জগতে। সাংসারিক কথাবার্তা ছাড়া, দুজনের মধ্যে তেমন কোনো সংযোগই ছিল না।

রবিবারের দুপুর। ফুল টাইম কাজের লোক বৈকুণ্ঠ সেদিনের জন্য ছুটি নিয়ে নিজের ভিটে নন্দীগ্রামে গেছে ছোট ছেলেটাকে ডাক্তার দেখাতে।

"কাল বিকেলে আসব। তোমাদের খাবার সব রান্না করে রেখে গেছি ফ্রিজে। সময়মত মাইক্রোওয়েভে গরম করে খেয়ে নিও"

সকালের রান্না গরম করে খেয়ে, নিজের ঘরে আন্ডারগারমেন্ট পরে ঘুমিয়েছিল ইন্দ্রনীল। হিউমিডিটি মেশা ভ্যপসা গরমে কোথাও বেরবার প্রশ্নই ওঠে না। সুপুত্র যাতে গরমে কষ্ট না পায়, সেইজন্য কিছুদিন আগেই রুদ্র সেনগুপ্ত তার ছেলের ঘরে এসি লাগিয়ে দিয়েছে। সেই এসির শীততাপনিয়ন্ত্রণে দাবদাহ ভ্যপসা গরমে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়ে টিভি চালিয়ে এলোপাথাড়ি চ্যনেল ব্রাউস করছিল ইন্দ্র।

হঠাৎ দরজায় টোকা।

"আসতে পারি?" বুঝতে অসুবিধা হল না শ্রীমিতার কণ্ঠস্বর।

যেমন ছিল তেমনই বিছানা থেকে না উঠে নবাবি চালে বলল "কাম ইন"

শ্রীমিতা এই বেশে দেখে একটু ভ্যবাচ্যকা খেয়ে গেল। এক বাড়িতে থাকলেও, এ অবস্থায় ইন্দ্রনীলকে এর আগে কখনো দেখেনি। লক্ষ করেছে, বরাবরই ইন্দ্র সৌজন্য রক্ষা করেছে। হয়ত কিছুটা সচেতন হয়েই, যে একই ছাদের তলায় তার সঙ্গে একজন মহিলা থাকে। সম্পর্ক না থাকতে পারে, সৌজন্যের যাতে কমতি না থাকে। শ্রীমিতা বুঝে উঠতে পারছিল না, কী করবে? বেরিয়ে যাবে, না থাকবে? আন্ডারগারমেন্ট পরা কোনো পুরুষ যে আগে দেখেনি, তা নয়। কিন্তু ইন্দ্রনীলকে এভাবে আগে দেখেনি বলেই তার বেশি দ্বিধা।

"এই ভ্যপসা গরম অসহ্য লাগেছে। আর পেরে উঠছি না। তোমার ঘরে তো তবু এসি আছে। আমার ঘরের পাখাটাও গরম হাওয়া দিচ্ছে। আর পারছিলাম না"

“এখানেই থাক। আমার কোনো প্রবলেম নেই। এই গরমে তোমার জন্য ভদ্র-সভ্য হতে পারব না। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড!” ইন্দ্রনীল রাজকীয় ভঙ্গিতে উত্তর দিল।

‘লীভ ওর লিভ’ - সামনে দুটো রাস্তা। এই দোটানার মধ্যে, শ্রীমিতা এই সংস্কারের বেড়াজাল পেরিয়ে গরমের মধ্যে বাঁচতেই চাইছিল। খাটের ওপাশে বসে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে বলল “রবিবার দুপুরে স্টার জলসায় ভাল সিনেমা থাকে”

ইন্দ্রনীল স্কিপ করে দেখল গত উইকে রিলিজ করা, হল থেকে বিলুপ্ত, নতুন সিনেমা ‘উন্মাদ’ চলছে।

“এটা ভাল সিনেমা?” কিছুটা ব্যঙ্গের সুরেই বলল ইন্দ্রনীল।

“ধ্যত। ভাবলাম কোনো ভাল সিনেমা থাকবে। ...বন্ধ করে দাও। নট ওয়ারথ অন এ সানডে আফটারনুন। বরং তোমার সঙ্গে গপ্প করি। এতদিন তো এক বাড়িতে থেকেও তোমার সঙ্গে গপ্প করার সময় হয়নি”

“তুমি তোমার পৃথিবীতে থাক। তাই বিরক্ত করি না”

এই প্রথম ভালমত ইন্দ্রনীল শ্রীমিতাকে দেখল। একটা ফিনফিনে সাদা-নীল নাইটি পরে বসে আছে বিছানার অন্য প্রান্তে। সাগরের নীল যেন মিশেছে ওর শ্যামলা দেহসৌষ্ঠবের লাবণ্যে। ধূসর সাদার মধ্যে উর্বর নীল, যেন এসির ভ্যপসা গরমে সতেজতার বাণী শোনাচ্ছে, নিঃস্পৃহ আবেশে ভরা জতুগৃহে। ভালো লাগছে শ্রীমিতাকে। পর্দার ফাঁক থেকে খসে পড়া, আলো-আঁধারিতে ঢাকা রোদ্দুর রঙে মাখা, দেখানো হাসির ঠোঁটে ছোঁয়া না-চেনা পল্লবে।

আসানসোলে কিঞ্চিত আলাপ, কিছুটা অতীতের বিলাপ, কিছুবা তুষ্টির শৃঙ্গারে প্রলাপ, জুবিলি রিসর্টে মধুর গীতি সম্ভাষণে। কিছু আবোলতাবোল কথার মধ্যেও ছিল না একটুও বাতুলতা।

ওর চিবুকে তিল, জোরা ভ্রুরুর ভাঁজে ফুটে ওঠা উৎকণ্ঠা, যেন আজ নতুন রং-এর প্লাবন ছড়াচ্ছে নীল-সাদা ভেদ করা, অসীম নীলিমায় হারিয়ে যাওয়ার নতুন সুবাসে। দগ্ধ উষ্ণ দ্বিপ্রহরে দুজনে বসে একাকী নিরালায় না-দেখা নতুন সাজে। ঋতুর তুলিতে মুহূর্তে আঁকা একটা চিত্র, নতুন ক্যানভাসে। না-চেনা স্বপ্ন সৌধের ভিত্তির বিন্যাসে।

সেদিকেই তাকিয়ে ছিল ইন্দ্রনীল।

নীল নাইটিটা যেন পাহাড়ের দুই মেরুকে সন্তর্পণে আড়াল করে রেখেছে। সেই উপচে পড়া পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, তার পাশে ইন্দ্রনীলেরও সুপ্ত পৌরুষ আবার ফিরে আসছে। নজর এড়ায়নি শ্রীমিতার।

"আমি কী থাকব, না চলে যাব?" একটু বিচলিত হয়ে শ্রীমিতা ইন্দ্রনীলের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

"চলে যাবে কেন? এই গরমে, ঠান্ডা হাওয়া খেতেই তো এসেছ" বুঝতে পেরে ওর দিকে তাকিয়ে বলল "লজ্জা পাচ্ছ কেন? জামাকাপড় খুলে ফেললে দেখবে এই ভ্যপসা গরমে কত্ত আরাম" নিজেই স্বগতোক্তি করল "আহঃ কী আরাম!"

"তোমারা আরামে থাকতে পারো। আমরা পারি না"

"গরমটা সবার দেহেই সমান ভাবে লাগে" তির্যক জবাব।

এই প্যাচপ্যাচে গরমে, নাইটিটাও দেহের সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে লেপটে, গরমটাকে যেন আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে মনে শ্রীমিতারও তাই মনে হচ্ছিল। আহা! যদি গরমে সব খুলে এসিতে শুয়ে থাকা যায়! হয়ত পরিত্রাণ পাওয়া যাবে এই কামড়ে ধরা হিউমিডিটি থেকে। হঠাৎ মনে হল, পরিত্রাণ খোঁজার থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই ভাল। ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে গেল, হঠাৎ শ্রীমিতাকে মাথার ওপর দিয়ে নাইটিটা সরিয়ে ফেলতে দেখে।

"কী করছ?"

"এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?"

ইন্দ্র অপলক চেয়ে আছে। স্বল্পবসনা শ্রীমিতা। এতদিন একই বাড়িতে থেকেছে। এভাবে তো আগে কখনও দেখেনি। আজ যেন নতুন ভাবে দেখছে। শ্রীমিতার যে এমন দেহসৌষ্ঠব আছে, পাশে থেকেও এর আগে তো চেনেনি! মনের ক্যানভাসে একটা নতুন ছবি, একটা নতুন স্বপ্ন।

সত্যিই তো - এক যাত্রায় পৃথক...

শ্রীমিতাও চেয়েছিল ইন্দ্রনীলের রোমশ পায়ের দিকে। এর আগে তো এভাবে ইন্দ্রনীলের ম্যনলিনেস পরখ করার সৌভাগ্য হয়নি। যদিবা কখনো বাথরুম থেকে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে, তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে ঢুকে গেছে।

অনুভূতির জন্য সময় ও পরিবেশ লাগে।

আজকে এই বেশে এসি ঘর যেন, সেই মোহময় আবেশ সৃষ্টি করেছে। সুপুরুষ তো বটেই, ওর রোমশ সুঠাম পা দুটো যেন ওর দিকে ক্রমশ আকৃষ্ট করছে তাকে। দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে হাঁটু ছাড়িয়ে, ইন্দ্রনীলের কায়াবস্ত্রের চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইন্দ্রনীল টিভিতে খেলা দেখছিল। শ্রীমিতা কী করছে, সেদিকে খেয়াল নেই। হয়ত স্বল্প বস্ত্র পরিহিত বলেই, লজ্জায় ওর দিকে তাকায়নি। পাছে অন্য কিছু ভেবে বসে। শ্রীমিতার দৃষ্টিটা ক্রমশ ওর রোমশ বুকের ওপর ঘোরাফেরা করছে। ভেতরে ভেতরে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বাসা বাঁধছে। পুরুষ সংস্পর্শের।

স্কুলে পড়ার সময় একবার অয়ন গাছের ফাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল। কশে থাপ্পড় মেরেছিল অয়নকে। বাড়িতে এসে লজ্জায় মুখ ঢেকেছিল নিজের ঘরে। এখন মনে হচ্ছে অয়নকে থাপ্পড়টা না মারলেই পারত। যৌবনের চাওয়াটা তাহলে আধুরা থেকে যেত না। আজ যেন সেই অতৃপ্ত চাওয়াটা কিছু চাইছে। অথচ ইন্দ্রনীলের সেদিকে হুঁশ নেই।

আলতো করে চাপ দিল ইন্দ্রনীলের হাতে। শ্রীমিতার ছোঁয়ায় ফিরে তাকাল। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেও নিজের মনে খেলা দেখতে লাগল। শ্রীমিতার হাত খেলে বেড়াচ্ছে ইন্দ্রনীলের বুকে। সেখান থেকে মুখে। দৃষ্টিটা ঢেকে দিচ্ছে। নাঃ... আর খেলা দেখা যাবে না। ওর দিকে ইন্দ্রকে ফিরতে দেখে, শ্রীমিতা সাহস করে নিজের দেহটা ছড়িয়ে দিল। বাইরের তপ্ত প্রবাহ এসি ঘরে, বাড়িয়ে ফেলেছে দুজনের চাওয়ার পারদটাকে। বহুদিনের ফেলে আসা অভ্যসটা আবার যেন মাথা চাড়া দিচ্ছে, শ্রীমিতার আহ্বানে।

দুই দেহের উপচে পড়া ভলক্যানোর লাভা ইরাপ্ট করতে চাইছে সুনামির বর্ষণে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সুনামির ঝড়ে ভেসে গেল ওরা দুজনে। খরাতপ্ত রবিবাবারের দুপুর যেন মেঘমল্লার বাজাচ্ছে তৃপ্তির সৌরভে। ভালবাসার নতুন গুঞ্জনে। সুর তাল লয় যেন মিশে গেছে নতুন চাওয়ার মূর্ছনায়। দেহের বন্দনায়। কামনার আরাধনায়।

শ্রীমিতা ভেবেছিল এটাই প্রেম। জানতও না, যে ইন্দ্র চুপিসারে তখন নন্দিনীর ক্যানভাসে নতুন ছবি আঁকছে। সেদিন দুপুরে ওর সমর্পণটাকে, প্রেম বলেই ভুল করেছিল শ্রীমিতা। তার রেশ টেনে নতুন ছবিও আঁকতে শুরু করেছিল মনে মনে।

"পেয়িং গেস্ট না অন্য কিছু? ঠিক করে বলত" ভেতরে ভেতরে নন্দিনীর কোথায় যেন একটা সংশয়।

“পেয়িং নয়, ফ্রি। আমাদের দুজনের বাড়ি আসানসোলে। আগে থেকেই চিনতাম। কলকাতায় থাকার জায়েগা পায়নি বলেই আমার বাড়িতে থাকে” নন্দিনীকে আশ্বস্ত করছিল ইন্দ্রনীল।

ভরসা করে কী ভুল করেছিল নন্দিনী? এখন আর বিগত অতীতের ডিসেকশন করে কী হবে? অনেক বছর তো পার হয়ে গেছে। স্মৃতির র‍্যম মেমরিতে ঢুকে, খালি ক্যস-এর মধ্যে, ফেলে আসা জীবনের হার্ড ডিস্কে আবার সার্চ করল নন্দিনী।

কে ওই অজ্ঞাত কলার?

ভাসা ভাসা হলেও, মনে পড়ছে সেই বর্ষামুখর রাতের কথা। ইন্দ্রনীলের একতলায় এক ভাড়াটে পরিবার থাকত। সময়ের ব্যাপ্তিতে কাকুলিয়া রোডের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও, ওই পরিবারের মধ্যবয়সি কর্তা কিন্তু নন্দিনীকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছিল। আজ এত বছর পরে সে-ই বার্ধক্যের আঙিনায় বসে নিশ্চয়ই এই ছ্যবলামোগুলো করছে ফোনে। আবার যদি ফোন করে বিরক্ত করে, পুলিসে জানাতে বাধ্য হবে।

“দিদিমণি অনীশ দাদাবাবু আজ রাতে খাবে না”

“কই আমাকে তো কিছু বলেনি”

“যাওয়ার আগে তো তাই বলে গেল আমাকে। বলল, কোথায় নেমতন্ন আছে বন্ধুদের সঙ্গে”

নন্দিনী বুঝতে পারছে ছেলেটা বড় হয়ে উঠছে। সব কথা মাকে বলে না। নায়েগ্রা ফলস থেকে ছেলেকে বুকে নিয়ে ফেরার পর ওকে ঘিরেই তো এত বছর কেটে গেছে। এবার বোধহয় সেই ছবিটাও ধীরে ধীরে মুছে যাবে।

জীবনের রং দিয়ে আঁকা রঙিন ক্যানভাসটা আবার ধূসর হয়ে যাবে। এবার ছবি আঁকবে - আর কাউকে নিয়ে নয়; নিজেকে নিয়েও নয়। ঘরে পড়ে থাকা খালি ক্যানভাসটা টেনে রংগুলো সাজাতে লাগল নন্দিনী। বহুদিনের ফেলে আসা অভ্যাসটা যেন আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

নিজের মনের কল্পনাকে বাস্তবের ক্যানভাসের ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে। যা জীবনের ঝঞ্ঝায় মুছে যাবে না। অমলিন হয়ে থাকবে ঝড়জলের দাপটে, স্বপ্নে ছোঁয়া বাস্তবের চিত্রপটে।

সেখানে আর কেউ নেই। শুধু পড়ে আছে নন্দিনী। আর তার সামনে একটা খালি ক্যানভাস।

নিজের মনের সব রং মিলিয়ে ছবিটা নিজেই আঁকতে শুরু করল নন্দিনী।

নয়

“চাকরিটা কী ছাড়ার . য়োজন আছে?” আলট্রা মেরিন্স-এর মালিক সুখেন্দু বড়ুয়া কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে ডেস্কের উল্টো দিকের চেয়ারে বসা নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। প্রশ্নটা এরশাদ সাহবেও করেছিলেন ঢাকার চাকরিটা ছাড়ার আগে।

জীবনের চলার পথে পরিবর্তন মাস্ট - সেটা শুধু কাজের প্রেক্ষাপটেই নয়, মানসিক ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। এই পরিবর্তনের খোলস পাল্টাতে পাল্টাতে প্রতি মুহূর্তে নারীর নতুন রং-এর মাধুরী, নব রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই রং-এ একটা ছবি তৈরি হয় - জীবনের ছবি। যা গোটা জীবনটাকে একই সূত্রে একটা ক্যানভাসে বন্দি করে রাখে - জীবনের আসল ছবিতে। সেই ছবিটাই অবচেতনে আঁকার চেষ্টা করে নারী মন, বারবার বিভিন্ন রং-এর সংমিশ্রণে। রং ভরা হয়, রং মুছে দেওয়া হয়, আবার নতুন রং দিয়ে সাজানো হয়, আবার তা মুছে যায় - ছবিটা যেন কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে চায় না। আধুরাই থেকে যায়। হয়ত কোথাও সন্তর্পণে সে চিন্ময়ী রূপ আঁকা হচ্ছে।

কিন্তু কোথায়?

এরশাদ সাহেবকে নন্দিনী বলেছিল “অনেকদিন তো বাইরে বাইরে কাটানো হল। এবার কলকাতায় ফিরতে চাই। একটা চাকরির অফার পেয়েছি। তেমন আহামরি কিছু নয়। তবে কলকাতায় থেকে খেয়ে পড়ে চলে যাবে”

“তোমার যদি মন চায়, যাও। আমার কী কওনের আসে। তবে এইখানে থাকলে তোমার ভবিষ্যৎ অনেক ভাল হইত। তোমার মতো ব্রাইট মাইয়াদের এইখানে অনেক প্রস্পেক্ট আসে”

প্রস্পেক্ট মানে তো গোলামির সিঁড়ির আরেকটা নতুন ধাপ। নন্দিনীর মনে হয়েছিল চিরকাল নিয়তির ক্রীতদাস হয়ে জীবন কাটিয়েছে। একবার... অন্তত একবার নয় নিজের মতো করে জীবনটা বাঁচল।

এরশাদ সাহেবকে বলেছিল “আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। এক বয়ে যাওয়া জীবন থেকে আমাকে তুলে এনে আপনি আমায় নতুন জীবন দিয়েছেন। এখন

মন চাইছে নিজের একটা ছোট পৃথিবী গড়তে। নাই-বা থাকলাম এই ওঠার র‍্যট রেসে। সবাই তো তার পেছনেই ছুটছে। আমি নয় ফিরে গেলাম আমার ছোট্ট বাসায়..."

"বাসায় যাইবা? যাও। বাসা তো আমাগো গোটা পৃথিবীটাই। তার মধ্যে যদি আলাদা কইর‍্যা কোনো বাসা পাও, খুইজ্যা লও। আলাদা বাসা কী আমাগো জীবনে কিসু আসে? তবু আমরা সেই স্বপ্নে সারাজীবন ধইর‍্যা ছুইট্যা মরি"

আজ এত বছর পরে ফিরে তাকালে মনে হয়, এরশাদ হয়ত ঠিকই বলেছিল। অনীশের বড় হওয়ার সঙ্গে নন্দিনী এটা আরও বেশি করে বুঝছে। বাসাটা হয়ত বাইরে নেই। বাসাটা সন্তর্পণে লুকিয়ে আছে মনের গভীর গোপন কোনে। সেখানেই এবার খোঁজবার পালা। নিজের রং দিয়ে সাজাতে হবে তাকে, নতুন তুলির ক্যানভাসে। যে ক্যানভাস অমলিন অক্ষত থাকবে সময়ের বিবর্তনে। ঠিক চিরবসন্তের নব-পেল্লবের মতো। পলাশের ফাগুনের হাওয়ায় খুলে দেবে মনের বন্ধ দরজাগুলো আগামীর জলছবি এঁকে।

"বিয়ে করেছি। সংসার করতে চাই" নন্দিনী জবাব দিল।

"সংসার করেও তো চাকরি করেও করা যায়। আজকাল তো সব মেয়েই তাই করছে"

"আমার হাসব্যন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। কখন কোন দেশে কতদিন থাকে। ওর সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে চাকরিটা ঠিক মতো করতে পারব না স্যার"

"যাতে তোমার শান্তি। তোমার মতো কাজের মেয়ে কী সারাদিন ঘরে কাটাতে পারবে?" কিছুটা হতাশ ভাবেই বলেছিল "দেখ চেষ্টা করে দেখ। যদি কোনোদিন ফেরত আসতে চাও, দ্য ডোরস আর ওপেন ফর ইউ"

এক সময় বন্ধ দরজায় বারবার করাঘাত করেছে। কেউ ফিরেও তাকায়নি। তারপর জীবন এক নতুন দরজা খুলে দিয়েছিল ব্যঙ্গালুরুতে। জীবনের রং-এর বিভিন্ন শেডস-এ একটা পথ তো খুলেই যায়। সেই পথটাই তখনকার একমাত্র পথ। পছন্দের না অপছন্দের বিচার করে লাভ নেই। সেই পথেই হাঁটতে হবে।

নতুন ঠিকানায়...

সল্ট লেকের সিডি ব্লকে অর্ণবের অগোছালো পৈতৃক বাড়িতে নতুন সংসার ঠিক মতো করে সাজাবার আগেই, অর্ণব ঘরে ঢুকে বলল "হুইসেল বেজে গেছে"

নন্দিনী বাথরুম থেকে বেরিয়ে ভেজা চুলটা আঁচড়িয়ে সিঁথিতে সিঁদুর লাগাতে গিয়ে অর্ণবের কথায় পেছন ফিরে বলল “তার মানে?”

“হনলুলুর হুইসেল। এক সপ্তাহের মধ্যে টোকিও থেকে জাহাজ নিয়ে সেইল করতে হবে প্যাসিফিকে। হওয়াই পৌঁছে দিতে হবে” নন্দিনীর মুখটা গাঢ় ভায়োলেট হয়ে যেতে দেখে বলল “আমার সঙ্গে চল না। হনিমুন করা তো আর হল না। প্যাসিফিকেই মিড ওশেনে আমাদের হনিমুন হয়ে যাবে”

শুনতেই নন্দিনীর মুখে ফিকে লাল রং ফুটে উঠল। একেবার রামধুনুর রং-এর দুই এক্সট্রিম।

মলিন সন্ধেবেলায়, কে যেন আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে নতুন রামধনু মাখা আলতায়। সিঁথিতে না পরা সিদুর কে যেন মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে নৈমিত্তিকতার আছিলায়। মুখটা জ্বলজ্বল করছে সেই অন্তরের আবিরের রঙে। ফাগুয়ার হোলি খেলতে, অসময়ের ফাগুনে, আলো ভরা দিনের সূর্যকিরণ মাখতে নতুন সোনাটায়। হতে গিয়েও যে মালা বাসি হল না প্রখর দিবার উষ্ণতায়।

জীবনের রং কী আঁকতে পারে প্রকৃতিক নিয়মের আছিলায়?

কৌটো থেকে চিরুনি দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুরটা লাগাতে লাগাতে নন্দিনী বলল “কতদিনের জন্য?”

“আট দিন হনলুলু পৌঁছতে। তারপর এক সপ্তাহ ঘোরা অ্যান্ড দেন ফ্লাই ব্যাক” অর্ণব মোবাইলে টেক্সট করেতে করতে বলল।

“আ... ট... দিন! তুমি তো কাজে ব্যস্ত থাকবে। সমুদ্রের নীল-এর দিকে তাকিয়ে বোর হয়ে যাব না তো?”

“আমি সঙ্গে থাকলেও বোর হবে?” অর্ণব ফোন থেকে চোখ না সরিয়েই প্রশ্ন করল।

নন্দিনী সিঁথির সিঁদুরটা ঠিক করে বিছিয়ে, অর্ণবের কাছে এসে বলল “এই আট দিন কোথাও তো বেরতে পারব না। জাহাজেই থাকতে হবে”

“ক্ষতি কী? আট দিন ধরে সকাল-বিকেল-রাত্রি আমার আদর খাবে” ফোন থেকে চোখ সরিয়ে, সদ্য বিবাহিতা পূর্ণযৌবনা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল।

“মাঝখানে কোথাও হল্ট নেই?”

“প্যাসিফিকে কোথায় হল্ট করবে? যদি না সমুদ্রে সুইম করতে চাও? অবশ্য সুইম করতে জানলেও প্যাসিফিক ওশেনে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না” একটু থেমে বলল “হল্ট সেই গিয়ে হনলুলুতে। কয়েকদিন হাওয়াই ঘুরে বেড়াব। তারপর ফ্লাই ব্যাক”

“মানে, ওয়ান ওয়ে জার্নি ইন দ্য সি?”

“প্রেসাইসলি”

নন্দিনীর কেমন যেন আরষ্ট লাগছে। এর আগে কখনও শিপ-এ চড়েনি। এবারে একেবারে লং ভয়েজে। নিজেকে কীরকম ফেরডিন্যান্ড ম্যাগেলেনের মতো মনে হচ্ছে। যেন সে স্ট্রেটস অফ ম্যাগেলেন পার করে, কেপ হর্ন-এর পাশ দিয়ে, পৌঁছে যাবে প্যাসিফিক ওশেনে। ওর পক্ষে এটা নতুন ডিসকভারি হতে পারে, অর্ণবের পক্ষে তো নয়।

ঠাট্টা করে নন্দিনী বলল “ওখানে আবার আর একটা বউ নেই তো? আই হ্যভ হার্ড দ্যট অল পিপল ইন মেরিনস হ্যভ আ ওয়াইফ ইন এভ্রি পোর্ট”

অর্ণব খুব ক্যসুয়ালি বলল “তুমি যে রকম ভার্জিন নও, আমিও তো তোমার মতো নিউবি নই”

“নিউবি! হোয়াটস দ্যট?” নন্দিনী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

“দ্যট ইজ দ্য পান অফ আওয়ার পেট্রিয়ারকল কালচার। এ চ্যস্ট লেডি ইজ কলড এ ভার্জিন। দেয়ার ইজ নো ওয়ার্ড ফর মেল চ্যস্টিটি। বিকস দ্য পেট্রিয়ারকল সোসাইটি ডসেন্ট বিলিভ মেলস ক্যন লুস দেয়ার চ্যস্টিটি। দে আর অফেন রেফারড অ্যাস নিউবিস। আই কনফেস আই অ্যাম নট এ নিউবি। আই হ্যভ স্ক্রুড নিউমারাস লেডিস ইন মাই লাইফ। বাট দ্যট ডসন্ট মিন দে ডিসারভ টু বি মাই ওয়াইফ” একটু থেমে বলল “আই হ্যভ ওয়ান ওয়াইফ অ্যান্ড দ্যট ইজ ইউ”

কত সহজ সরল অকপটে অর্ণব কথাগুলো বলে গেল। ক’জন পুরুষ বিবাহিত স্ত্রীর সামনে এমন সত্যি কথা অকপটে বলতে পারে? নিজেও তো অর্ণবকে বলতে পারবে না, সে কতজনের সঙ্গে শুয়েছে। পারবে কী? ঈশ্বর যখন আকাঙ্ক্ষা দিয়েছে, সেটা পরিতৃপ্ত করা অযৌক্তিক নয়। পিওরিটির দোহাই দিয়ে করতেই বা যাবে কেন? আর পাঁচটা বাসনা মেটানোর মতো এও তো এক বাসনা। এর সঙ্গে সতীত্ব, সিন্সিয়ারিটি, ডেডিকেশন-এর কী

সম্পর্ক আছে? নন্দিনী আজও বুঝে উঠতে পারল না, এ দুটোকে এক মেরুতে কে এনেছে?

এই সাবেকি চিন্তাধারা একটা রক্ষণশীল ক্লাস আগলে রেখেছে। হয়ত বৈবাহিক বন্ধনকে ধরে রাখতে এটাই এক মাত্র অস্ত্র। কিছু বলতে গেলে কেউকেটারা অনেক তত্ত্বকথা শুনিয়ে দেবে।

ভয়টা অন্য জায়গায়। অর্ণবকে এডস-এর টেস্ট না করিয়েই বিয়ে করেছে। বিয়ের আগে তো আর হবু স্বামীকে বলতে পারে না 'তোমার এডস টেস্ট করা আছে?' অন্তত জ্যোতিকিরণের সঙ্গে থাকতে তার রেগুলার মেডিক্যাল টেস্টের মধ্যে এডস টেস্টটাও হত। আফটার অল, হাই লেভেল এস্করট এজেন্সিতে কাজ করলে, দিস টেস্টস আর এ মাস্ট। লোকে কয়েক ঘণ্টার জন্য এত টাকা দিচ্ছে কী এডস নিয়ে ফেরার জন্য?

"তাহলে সিঁদুরের একটা দাম আছে, বল?"

"অফ কোর্স। আই অ্যাম ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট মাই আইডিয়াস। আই ডোন্ট ফেইন পিউরিটি অফ হিপক্র্যাসি। দেয়ার আর প্লেনটি অফ লেডিস টু ফাক, বাট ওনলি ওয়ান টু ফুলফিল এ ড্রিম অফ এ হোম"

ড্রিম!

স্বপ্ন তো নন্দিনীও দেখত ছোটবেলায়। কাকুলিয়া রোডের জানলার ফাঁক দিয়ে রাতের অন্ধকার আকাশটা দেখা যেত। ওই অন্ধকার আকাশে ছোট্ট নন্দিনী একটা অন্য ভাষা শুনতে চাইত। জানলার কার্নিশ ছাপিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যেত, সেটাও যেন অন্ধকারের আস্তিন পেতে গুম মেরে বসে থাকত প্রতীক্ষায়। তারাদের? যে, ওকে জ্বলতে দেখে লাফিয়ে উঠবে আনন্দে?

অন্ধকারেরও আলোর একটা ঔজ্জ্বল্য দেখতে চেয়েছিল। কিংবা কোনো অদৃশ্য জগতের রাজপুত্তুরকে। তারাদের সিঁড়ি বেয়ে কারা যেন ফিসফিস করে ডাকত 'আয়...আয়...' মনমাঝির বৈঠা নিয়ে হাতে, সপ্তর্ষির পিঠে চড়ে, আকাশগাং পাড়ি দিতে, কোনো এক অচেনা রূপনগরের দেশে। এক মোহময় অজানার হাতছানি, এক পার্থিব চাওয়ার অলৌকিক নিঃশব্দ আহ্বান।

নাম না-জানা তারাগুলো স্বপ্নের দরজা খুলে, ছোট্ট নন্দিনীর মনে আলোর সিঁড়ি বিছিয়ে, স্বপ্ন পরীদের নাচের ক্যানভাস আঁকার ভেল্কি দেখিয়ে, গাইত ঘুমপাড়ানি গানঃ

আমার মনের বইঠা ধর রে তুই নারী

আমি হাজার সমুদ্দুর পার হয়ে তোরে ছুঁতে পারি।

ভাসে আমার মন বৈঠার তরী

যেখানে উজলা ফসল ভরে তোর ভরা গাঙের বুকে

আমি কেনে নির্জলা তোর পিরিতির সুখে?

তোর মন বইঠা আমি বাইব রে তোর মাঝি

দেখাইতে তরে স্বপ্ন গাঙের তরি

আমার মনের বইঠা ধর রে তুই নারী

আমারে কোন স্বপ্নের তীরে ভিড়াইলি?

তাদের আলোর প্রদীপের সিঁড়ি বেয়ে, আকাশগাং-এর রাজপথ ধরে, দুহাত বাড়িয়ে, ওদের দেখান রাজপথে, ওই ক্ষীণ অথচ দৃপ্ত আলোর দিকে, তারাদের আলোর সিঁড়ি ধরে, একা হেঁটে চলেছিল নন্দিনী। গুটিগুটি পায় ছোট্ট নন্দিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে মহানন্দে হাততালি দিয়ে, হই হই করে উঠে, দ্বিগুণ জোরে মিটমিট করে জ্বলে উঠেছিল তারাগুলো। জ্বালিয়ে দিয়েছিল জোনাকির ফুলঝুরি - আকাশগাঙে আনন্দের মধুকর ডিঙাতে গিয়ে বসতে ওই স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের পাশে।

"তোমার জন্য কত যুগ ধরে বসে আছি আমি" রাজপুত্তুর নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলত "এত দেরি করলে কেন?"

"তোমাকে তো খুঁজে পাচ্ছিলাম না"

"কেন? আমি তো যুগযুগান্তর ধরে এই নৌকোয় ভেসে বেড়াচ্ছি"

"আমি তো দেখতে পাইনি"

"তুমি কী দেখতে চেয়েছিলে? আনমনা বেপথে হারিয়ে যাওয়া মনটাকে দেখার জন্য দৃষ্টি লাগে, এক নিপুণ শিল্পীর নিজের আলোয় দেখা ছবিটা, অকলুষিত ক্যানভাসে"

হয়ত তাই। একটা নিজস্ব দৃষ্টি লাগে। সেই দেখার হাতেখড়ি কী সেই কম বয়সে তুলি তুলে নেওয়ার প্রবণতা? সেই স্বপ্নভেলার জাগতিক হাতেখড়ি। সেই স্বপ্নের ভেলায় চেপে

ওরা দুজনে ভেসে গিয়েছিল বিস্তৃত মহাকালের স্রোতে।

অন্ধকার আকাশে ঝিকমিক করছে অজস্র তারা। সেই তারার আলোয় তৈরি হয়েছে এক অপূর্ব মায়াময় মূর্ছনা। কারা যেন হাজার হাজার সন্ধে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে সারা আকাশজুড়ে। কয়েকটি তারা সেই অন্ধকারের স্বপ্নলোকের সাগরে, এক এক করে জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঝিকমিকে আলোর রংমশাল। দু-একটা বড়সড় তারা, ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে দেখছে এই অন্ধকারের বুকে অন্যান্য তারাদের সন্ধ্যারতি। কয়েকটা মেজো ধাঁচের তারারা, রজপুত্তুরের সঙ্গে সাধারণ মেয়ের উচ্ছল স্বপ্নবিহার দেখে, মিটমিট করে হেসে, ছিটিয়ে দিচ্ছে হাজার আলোর ফুলকির উলুধ্বনি। সেই দেখে, বাচ্চা তারাগুলো খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি। নৌকোর চারপাশে দাপাদাপি করে, পুকুরপাড়ের উলঙ্গ শিশুদের মতো, ঝাঁপিয়ে পড়েছে আকাশগঙ্গায় স্নান করতে।

রাজপুত্তুর আলতো করে তার হাতটা নন্দিনীর কাঁধে বিছিয়ে বলল "আমার সঙ্গে যাবে?"

"কোথায়?"

"যেখানে মেঘেরা খেলে বেড়ায় ওই নীল আকাশের কোণে। যেখানে পাখিরা কিচমিচ করে ছোট্ট একটা নীড়ে। যেখানে স্বপ্ন কখনও মুছে যায় না ওই মেঘপরিদের দেশে। তোমায় ওখানে পৌছতে হবে অমলিন এলোকেশে"

"যাব... যাব... যাব..."

এতদিন পরে বুঝি আবার সেই যাবার ডাক এল। নতুন সুরের ঝংকার বিটস-এ নতুন গান শোনাল। স্বপ্নমাখা নীল সমুদ্রে জাহাজে ভেসে নীল আকাশের কোলে।

নির্নিমেষ কঠোর অর্ণব এবারে কিছুটা মমতায় করুণ হয়ে বলল "পোর্টে গেলে কোনো ওয়াইফ পাবে না, লাইফ পাবে"

"কী লাইফ?"

"ইপু হেকে... ইলি ইলি... উলি উলি... পুলি... কালা আউ... মেলে ইনোয়া"

"অ্যাঁ!" নন্দিনী বুঝে উঠতে পারছিল না, অর্ণব কী ভাষা বলছে।

"হ্যাঁ"

"মানে?"

“পুয়া আহিহি... কাও উইকা” মোবাইলটাকে খাটে ফেলে নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরল অর্ণব।

“এ...মা... দিন দুপুরে - এ কী করছ?” নন্দিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। লোকটা বোধহয় পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে।

“আমার কিন্তু একটাই বউ এখানে। ওখানে আছে শুধু মেলে আলোহা ওয়ে...” একটু থেমে বলল “এটা কিন্তু রেগে বিট নয়, এগুল ট্র্যাডিশনল হাওয়াইন মিউসিক” বলতে বলতে দুহাত দিয়ে নন্দিনীর মুখটা ধরে ঠোঁটে চুমু খেল।

এর আগে এত পুরুষের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছে নন্দিনী। কিন্তু আজকে যেন প্রথম অনুভব করল সে এক নারী। সম্পূর্ণ নারী। যে ছবিটা সে দেখেছিল ছেলেবেলায়। স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের হাত ধরে ভাসতে ভাসতে ভেলায়। ওর চিবুকটা তুলে নিবিড় ভাবে তাকিয়েছিল নন্দিনীর দিকে। তারপর খুব আস্তে আস্তে রাজপুত্তুর ঠোঁটটা এগিয়ে আনছিল তার মুখের কাছে। হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে ‘হুম্ হুম্’ শব্দ করে স্বপ্নটা ভেঙে দিয়েছিল, জানলার কার্নিশ দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা পেঁচা। তার কানে ‘হুম্ হুম্’ শব্দটা ‘ওঁ ওঁ’ এর মতো শুনিয়েছিল।

গুমরানো কান্নায় ঘুমটা ভেঙে গেছিল। অক্ষমের হতাশার দীর্ঘশ্বাসের শীতল বাতাস যেন কোথা থেকে অন্ধকার ভেদ করে, জানলার ফাঁক দিয়ে, তার স্বপ্নটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছিল। তারপর অযুত জীবনের নিযুত ব্যর্থতার কালো কালো ধুলোর একটা ঝড়, যেন তার শ্রান্ত দেহের ফাঁক ফোঁকরে ঘুঘুর বাসা বেঁধেছিল এতকাল ধরে। শ্লথ শিথিল অনিশ্চয়তায় জীবনটাকে ভাসাতে ভাসাতে, ভুলেই ছিল সে নারী। শুধু একটা রক্তমাংস দিয়ে গড়া কুমোরটুলির সাজানো প্রতিমা নয়। তারও একটা সত্তা আছে। একটা আত্মা আছে। আছে একটা কোমল নারী মন।

অর্ণবের আলিঙ্গনে, তার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। একটা অচেনা কান্নার দলা তার গভীরের অলিন্দ-নিলয় থেকে উঠে এল। সেই কান্নার দলাটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল তার গলা বেয়ে, তার সুষুম্নার ব্রক্ষনাড়ি ভেদ করে, স্পাইনাল কর্ড ছাড়িয়ে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে, স্মৃতির ভাণ্ডার অ্যামিগডালার অন্দরে। পৌঁছে গেল তার ইমোশনের গোপন কুঠরিতে, তার চেতনার অন্দরে, তার গভীর আপনার নিজের মন্দিরে - তার একান্ত

আপন আত্মার ট্রেজার চেস্টে। ভরা বর্ষার জিয়া ভেড়ালির মতো, পাহাড় থেকে লাফিয়ে নামা সুবনসিরির মতো, ভরা অন্ধকারে ঢাকা তার বেপথে হাঁটা মনটাকে এলোমেলো করে, ভেতরের ইমোশনটাকে আলুথালু করে, ভাসিয়ে দিল অর্ণবের নিবিড় চুম্বন। জাগ্রত অবোধ মনটা আস্তে আস্তে ডুবে গেল এক তলহীন অন্ধকার ঘূর্ণীতে।

'ওঁ ওঁ'

পেঁচার ডাকটার যেন নতুন মানে খুঁজে পাচ্ছে। গভীরের এক নতুন শব্দ মন্ত্রোচ্চারণে। পেঁচার ডাক সে আগেও শুনেছে। কিন্তু এরকম তো কখনও মনে হয়নি। কোথায় যেন একটা শান্তির ওংকার ধ্বনি। হয়ত এত বছর পরে, স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে একটা যুগলবন্দি টানতে চাইছে। তার দুচোখ বেয়ে নেমে এল এক আশ্চর্য কান্না।

কে যেন সেই কান্নার একটা নতুন ক্যানভাস আঁকছেঃ

নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্য

দশ

এতদিন জলে কাটানোর পরে অবশেষে একটু . ল।

প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও, শেষের দিকে নন্দিনী একটু হাঁপিয়েই উঠেছিল। এক সপ্তাহের ওপর শুধু জল আর জল আর জল। অবারিত নীল-এর সীমাহীন জল পার হয়ে মাটির ছবিটা দেখে মনটা আবার ময়ূরের মতো পেখম তুলে নেচে উঠল। যেন অনেক দিনের প্রতীক্ষায় শেষমেশ একটা মোহনায় পৌঁছেছে।

সত্যি কী?

“অ্যাট লাস্ট উই হ্যভ রিচড আওয়ার ডেসটিনেশন” অর্ণব দূরে তিরের দিকে তাকিয়ে বলল।

“এটাই কী হনলুলু?”

“হাওয়াইয়ের ক্যপিট্যাল। আগে এখানে দু-বার এসেছি। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আসার মজাটাই অন্য”

“হনিমুন ইন হাওয়াই” নন্দিনী নিজের মনে স্বগতোক্তি করল।

“হনিমুন ইন শিপ। তুমি বললে না লাস্ট পিরিয়ডটা মিস করেছ? হনলুলুতে নেমে একটা প্রেগ্রেন্যন্সি কিট কিনে একবার টেস্ট করিয়ে নিও”

নন্দিনীর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। যতই অবজ্ঞা করুক না কেন, এক্সপ্রেশনের প্রতিটা স্তরে অজান্তে অলক্ষ্যে রংগুলো বারবার ফুটে ওঠে। ইনেভিটেবল রেসাল্ট অফ এ কনজুগ্যল ব্লিস। ভাবলেই নারী মন একটা সম্পূর্ণতার ছোঁয়া পায়। অজান্তে, রক্তিম পলাশের রং ছড়ায় জনসমক্ষে, আপাতবাস্তব ছবিটায়। হয়ত ভেতরে ভেতরে ধিক ধিক করে সুপ্ত চাওয়ার আগুনটায়, ফাগুন লাগাতে চায় বাইরের আলতা রং-এর স্পর্শ দিয়ে।

এইটুকু জীবনে এত জনের সঙ্গে ইন্টারকোর্স করেছে নন্দিনী। এর আগে তো কখনও এমন মনে হয়নি। এমনকী এই এতদিনে, দিনে একবারের বেশি অর্ণবের সঙ্গে সহবাস করার সময়ও নয়। তাহলে কী দৈহিক মিলনের মধ্যে সে রং নেই, যে রং ছড়িয়ে আছে

তার ফসলে? ফসলটাই আসল। দেহের পরিতৃপ্তিটা একটা সাময়িক খিদে মাত্র। যার ছবি আঁকতে গিয়েও কোনো সৃষ্টি কোনোদিন অমরতা পায়নি।

যৌনতা কী তবে আমাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা প্রপাগেশন অফ জিনের মাধ্যমে, অন্তরের সুপ্ত ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ নয়? আর পাঁচটা নারীর মতোই কী নন্দিনীর অবচেতন, সেই অমরত্বের পিয়াসী?

"দ্য সুনার দ্য বেটার। আবার কোথায় কাজে দূরে চলে যাবে। আমারও তো একটা অবলম্বন চাই" নন্দিনী অর্ণবের চোখে, চোখ রেখে বলল।

"হোয়াই নট?"

অনেক রং-এর মেলায় এই রংটা দিয়ে কী নন্দিনী ক্যানভাসটা পূর্ণ করতে চাইছে? অখণ্ড নীলে আরেকটা রং ছড়াতে।

এক সপ্তাহ ধরে, পাথরবাটির নীল বারবার হাতছানি দিয়েছে। মিশে যেতে বলেছে ওই অখণ্ডতার গর্ভে। ঝাঁপিয়ে পড়ে নয়। দুচোখ ভরে আস্বাদন করতে তার সীমাহীনতাকে। তাই করেছে নন্দিনী। অর্ণব যখন জাহাজের কাজে ব্যস্ত, ক্যানভাস নিয়ে ডেকে বসে আঁকতে চেষ্টা করেছে সামনের দৃশ্যপট। পরম সুখে চেয়েছে দিগন্তহীন নীলিমাকে বন্দি করে রাখতে ক্যানভাসে। নন্দিনী দেখতে-দেখতে আঁকতে-আঁকতে হারিয়েছে আর এক স্বর্গে।

সেই ছোটবেলায় এক ঝলক দেখা স্বপ্নের স্বর্গ।

সেই স্বপ্নের রাজপুত্তুর তাকে ভেলাতে করে নিয়ে গেছিল মাঝ দরিয়ায়। সেখানেও ছিল এমনই অখণ্ড নীল। মুখে ভরে ছড়িয়েছিল দুষ্টু-মিষ্টি হাসি। নিবিড় ভাবে তাকিয়েছিল নন্দিনীর চোখের কাজলে। বলেছিল "স্বর্গটাকে পেতে গেলে তো পিরিতির সমুদ্রে ভাসতে হবে"

"সেটা কোথায় গো?" গাঢ় চোখের পাতা মেলে ওর দিকে তাকিয়েছিল নন্দিনী।

"ওই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে"

একটা সমুদ্র পার হতে গোটা সপ্তাহটা কেটে গেল। সমুদ্রের নীল-এর দিকে তাকিয়ে, নন্দিনী হিসেব করার চেষ্টা করছিল সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে কদ্দিন লেগে যাবে -

তার স্বপ্নের আঁতুড়ঘরে পৌঁছতে। আকাশে ভেসে বেড়ানো গাংচিলগুলো কী ওর থেকে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে ওখানে? যেখানে সে স্বপ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছে এতদিন ধরে।

সেই স্বপ্নের ছবিটা সে আঁকতে চায় ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাসে।

“আমায় তুমি নিয়ে যাবে সেখানে?”

রাজপুত্তুর হাত ধরে বলেছিল “এস আমার সঙ্গে”

হাত ধরে ভেলায় চেপে হারিয়ে যেতে যতে স্বপ্নটা ভেঙে গেছিল ওই লক্ষ্মীপেঁচার শব্দে। তারপর এত বছর পার হয়ে গেছে। সেই সুখের স্বপ্নটা আর ফিরে আসেনি।

সেই স্বপ্নটাকে আজও খুঁজে চলেছে নন্দিনী।

জাহাজ হ্যন্ডওভারের পর অর্ণব বলল “অ্যাট লাস্ট ফ্রি। চল তোমাকে হনলুলু দেখিয়ে আনি” টুরিস্ট অ্যাট্র্যাকশনস এর লিস্টটা হাতে নিয়ে বলে চলল “কত কিছুই তো দেখার আছে। সব তো আর দেখা যাবে না। যে কটা ঘুরে দেখা যায়”

পার্ল হারবার এন্ড ইউএসএস এরিজোনা মেমোরিয়াল, ওয়াইকিকি, লিওন আরবরেটাম আর মানোয়া ফলস, আওলানি প্যলেস, আলা মোয়ানা পার্ক, কুইন এমা সামার প্যলেস, ফসটার বটানিক্যল গার্ডেন, প্ল্যনেটরিয়াম আর বিশপ মিউসিয়াম, মিশন হাউস মিউসিয়াম, পু উলাকা স্টেট পার্ক, স্পিটিং কেভ অফ পোর্টলক দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে নন্দিনী বলল “দিস আর রেমেনেন্টস অফ অ্যামেরিকান অকুপেশন অফ হাওয়াই। এমন কিছু নেই যেটা ট্র্যডিশন্যল?”

এংকরওয়াটের স্মৃতি মনে পরে যাচ্ছিল। সেখানে একটা প্রাচীন কালচারকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। নন্দিনী যেন সব সময় কৃত্রিমতার বাইরে আনস্প্যয়েল্ট ফর্মটাকে খুঁজছে। এই কদিন অর্ণবের সঙ্গে ঘুরেও তো সেটা পেল না। যা দেখল, সেগুলো তো মিউসিয়ামগুলোর মতোই অ্যামেরিকান ইনফ্লুয়েন্স সাজানো। সেখানে তো হনলুলু নেই। সেখানে তো হাওয়াই নেই। একটা সদ্য পাঁচমিশালি কালচারলেস আয়োজন তাদের আধিপত্যের জয়ধ্বনির ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে। অথচ নন্দিনী সেই আদি অকৃত্রিম সভ্যতার ছবিটাই খুঁজছে। সেটাই তো একটা দেশের আসল ক্যানভাস।

অর্ণব বুঝল নন্দিনী প্রাচীন হাওয়াইকেই খুঁজছে।

“আজ শনিবার না?”

“হ্যাঁ”

“তাহলে চল তোমায় ওয়াইকিকি বীচে নিয়ে যাই”

“শনিবারে কী স্পেশাল আছে?”

“আগে যখন একবার এসেছিলাম, প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবার সন্ধেবেলা সেখানে হুলা ডান্স হত। খোঁজ নিয়ে দেখি। এখনও হয় বোধহয়” একটু থেমে বলল “ঠিক নামটা মনে করতে পারছি না। সম্ভবত কুহিও বীচ টর্চ লাইটিং মনে হচ্ছে”

নাচের কথায় নন্দিনী ফিরে গেল তার ভরতনাট্যমের দিনে। হয়ত খাজুরাহ ডান্স ফেস্টিভ্যালের স্মৃতি বেদনাদায়ক। তবু রক্তে নাচের বীজটা যে আজও বিলীন হয়ে যায়নি। তাই আজও নাচের কথা শুনলে মনটা ময়ূরের মতো নেচে ওঠে। সে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য নৃত্য, যাই হোক না কেন।

ওয়াইকিকি বীচে উলিনিউ আর কালাকাউয়া এভিনিউর সংযোগে ওরা খুঁজছিল কুহিও বীচ হুলা মাউন্ড। বেশি খুঁজতে হল না। বড় বড় বট গাছের ফাঁকে ডিউক কাহানমোকুর স্ট্যাচুর কাছে পেয়ে গেল। এখন সাড়ে পাঁচটা। ছ’টা থেকে প্রোগ্রাম শুরু।

“এত জায়গা থাকতে এখানে নিয়ে এলে কেন?” নন্দিনী অর্ণবকে জিজ্ঞেস করল।

“এটা ফ্রি। তাছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশে হুলা নাচ দেখার একটা মজা আছে”

ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ছ’টা বাজতেই ভিড়ের মধ্যে থেকে লাল-হলুদ সেরিমোনিয়াল কেপ পরা একজন মধ্যবয়সি লোক এক বিশাল হাওয়াইয়ান শাঁখ দিয়ে সূচনা করল। তারপর ধীর সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বীচের ডায়াসের ধারে এক এক করে মশালগুলো জ্বালিয়ে দিল।

তারপর, সূর্যাস্তকে পেছনে ফেলে ওই শিখায় শুরু হল সপ্ত রঙে সাজা যুবক-যুবতিদের বাজনার তালে তালে হুলা নৃত্য। কিছুক্ষণ পর কণ্ঠ মিলল বাজনার ছন্দে - আলো ওয়ে, হিলা ওয়ে, পুয়া আহিহি... ছন্দের মধ্যে দেহের বন্দনা।

রঙিন ভেল্কির মধ্যে নন্দিনী আসল রংটা খুঁজছিল। সূর্যাস্তের আলো-আঁধারে, জ্বলে ওঠা মশালের আলোতে, নানা রং-এর ছন্দ বন্দনা মন্দ লাগছিল না। তবু নন্দিনীর মনে হল, এর মধ্যে কোথাও যেন একটা কৃত্রিমতায় মোড়া এই প্রোগ্রাম।

অর্ণবকে বলল “স্পেলনডর আছে বাট লাইফ নেই”

"কেন? এটাই তো হুলা ডান্স। গানগুলো ভাল লাগছে না?"

"গানগুলোর নিজস্ব একটা বিট আছে। মন্দ নয়। কিন্তু নাচের মধ্যে কোথায় যেন প্রাণ নেই"

নন্দিনীর শিল্পীমন ছন্দের বন্দনা জানে হৃদয়ের স্পর্শে। কোথায় যেন প্রোগ্রামটা তাকে ছুঁতে পারছে না। সেই গভীর কোণে, যেখানে সরগম থেকে নিখাদ মিশে যায় রামধনুর সাতটা রঙে। যেখানে মন জেগে ওঠে তালের মূর্ছনায়, চোখ ভরে যায় নৃত্যের পশরায়। যেখানে দেহ বসে থাকতে রাজি নয় দর্শকের আসনে। যোগ দিতে চায় ওদের তালে পা মেলাতে অন্তরের ছন্দে। অতৃপ্ত মনটা আরও কিছু চায়।

"হাওয়াই-এর কোনো ট্র্যাডিশনাল ডান্স প্রোগ্রামে নিয়ে যেতে পারবে?"

"এক সময় যে সাবেকি হুলা ডান্স হত, এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। শুনেছি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান মিশনারিরা হাওয়াইতে এসে সেই নাচ বন্ধ করে দেয়"

"কেন?"

"ঠিক জানা নেই। শুনেছিলাম ওদের ধারণা হয়েছিল, সেই সময়কার হাওয়াইয়ান নাচের কস্টিউম আর জাইরেশন মানুষের মধ্যে সেক্সুয়াল ফিলিংস উদ্রেক করে"

"তাই কী?"

"কী জানি! আগেরবার এসে যেটুকু শুনেছিলাম, এই নাচ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। ঠিক আমাদের ভরতনাট্যমের মতো। সেই সংস্কৃতির দেবীপূজা কী করে যে পাদ্রিদের কাছে ইরটিক হয়ে গেল, কে জানে?"

"যত...ত...সব। ধর্মের নামে ভণ্ডামি। কবে যে ধর্মের নামে সংস্কৃতিকে কিনে নেওয়ার নেশাটা ঘুচবে, কে জানে?"

অর্ণব হেসে বলল "কোনোদিনও নয়। আফটার অল রিলিজিয়ান ইজ দ্য হায়েস্ট অর্ডার অফ পলিটিক্স। শুনেছি ওরা হাওয়াইয়ান রয়েলটিকে ক্রিসচ্যানিটিতে কনভার্ট করার পর, রাজা এদেশে ট্র্যাডিশনাল হুলা ডান্স বন্ধ করে দেয়"

নন্দিনী আবদার করে বলল "তবুও খুঁজে দেখ না, এখনও কোথাও হয় কি না। কোনো রিমোট ভিলেজে"

অবশেষে ছোট্ট একটা গ্রামের খোঁজ পাওয়া গেল হনলুলুর বাইরে সমুদ্রের ধারে।

"পাকালা ভিলেজ। সেখানে এখনও গ্রামীণ পরিবেশে সাবেকি প্রথা বর্তমান। যাবে?"

শুনেই নন্দিনী লাফিয়ে উঠল "চল না একবার ঘুরে আসি। এতদিন ধরে যে জায়গাগুলো দেখলাম, সব তো টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। এবার একটু নন-টুরিস্ট স্পট ঘুরে দেখি"

"সেখানে কিন্তু ভাল থাকার জায়গা নেই। পারবে ওই পরিবেশে থাকতে?"

"পারব" নন্দিনী জোর গলায় বলল।

অবশেষে তারা হো'আনুআনু বের ধারে পাকালা ভিলেজে পৌঁছল। কয়েকশো লোকের বসবাস। সেখানে বাঁশের মাচার ওপর বাঁশে তৈরি খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর। চারদিকে নারকেল গাছের সারি। ফাঁক দিয়ে অকৃত্রিম বিস্তারে সমুদ্র।

"লাভলি!" নন্দিনী সিঁড়িতে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

নারকেল গাছের আলোছায়ার ফাঁক দিয়ে সমুদ্দুরের কোলে ঘুমিয়ে পড়ার আগে, সুয্যিমামা ছোট্ট শিশুটির মতো ফিক ফিক করে হাসছে। লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে দূরের সন্ধের সঙ্গে। লাল ধুলো মেখে হুটোপাটি। পালিয়ে বেড়াচ্ছে দূর থেকে ধেয়ে আসা অন্ধকারের আস্তিন গোটানো নীল সমুদ্রের পারে।

"তুমি বস। আমি কয়েকটা ছবি তুলে আসি" অর্ণব ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিয়ের এতদিনের মধ্যে নন্দিনী অর্ণবের ছবি তোলার নেশাটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। কাঁধে সব সময়ই ক্যামেরাটা ঝুলছে। যখন পারছে দুমদাম ক্লিক করে যাচ্ছে। প্রকৃতি থেকে নন্দিনী। এই ক'দিনে নন্দিনীর কত যে ছবি তুলছে তার ইয়ত্তা নেই। বেরতে বেরতেও সিঁড়িতে বসা বেশ কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল।

তাই দেখে নন্দিনী হেসে উঠে বলল "জংলি ড্রেসে এই জংলির কত ছবি তুলবে?"

"এখনও জংলি হইনি। রাতে হব"

পড়ন্ত দিনের লাল সূর্যের আভা নন্দিনীর মুখে ছড়িয়ে, কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই হাঁটা দিল।

এই গ্রামীণ পরিবেশে নন্দিনী মনের ক্যানভাসটা মেলে ধরল রং-এর খোঁজে। দূর দিগন্তের বেগুনি আভা, সাগরের নীল, নারকেল গাছের সবুজ, সূর্যের হলদে কিরণ, আর

নিজের পরা লাল-কমলা স্কার্ট ব্লাউসকে, কে যেন এক সূত্রে বাঁধতে চাইছে নিজের মনের সপ্ত রঙে। মন ভেসে চলেছে ওই স্বপ্ন পরিদের দেশে। যেটা মিলেছে মেঠো পথের বাঁকে। প্রকৃতি যেন নিজের দরজা খুলে ডাক দিচ্ছে 'আয়...আয়...আয়... আমার কোলে। শোনাব তোকে আজকে রাতের গান। আমার তালে ছন্দ মেলাবি, ভরবে রে তোর প্রাণ। সমুদ্দুরের সুরে গাইবি আবার নতুন গান'

গানটা নন্দিনীর গাওয়া হল না।

সন্ধে নামতেই পুরুষ মহিলারা চারধারে মশাল জ্বেলে নিউতে[1] মাই তাই[2] নিয়ে বসে পরল। ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যারতি শুরু হবে। নাচের তালে প্রকৃতির বন্দনা। কিংবা প্রাচীন দেবতার আরাধনা।

ওদের পরনে গাছের ছাল দিয়ে তৈরি পা'উ, গাছের পাতা, ফুলের লেই, কুকুই নাট। সেই আভরণ ছড়িয়ে পরেছে গলা থেকে হাতের কব্জিতে, পায়ের বেষ্টনীতে ছন্দের বন্দনা, নূপুর নিক্কণে। ওদের কাছেই শুনল নাচের শেষে এই পরিধানের পবিত্রতার কথা। নাচের শেষে এই বেশ তারা অর্পণ করবে দেবী লাকার চরণে। ওদের সংস্কৃতিতে পুরুষ মহিলা কারো ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো আবরণ নেই। মহিলাদের অনাবৃত স্তনে কোনো কামনা নেই। এটাই পবিত্র ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

ইচ্ছে থাকলেও অর্ণব ছবি তোলা থেকে বিরত। সাবেক গ্রামবাসী সভ্যতার অসভ্যতা ভাল চোখে নেয় না। নন্দিনী লক্ষ করছিল ওই তরুণীদের নিষ্পাপ স্তনের মাধুর্য। যেটা ওদের কাছে দেবী লাকার বরমাল্য। অকৃত্রিম নৈসর্গিক পরিবেশে দৈহিক সৌষ্ঠবের এক বিশেষ মাধুর্য আছে।

লোকমুখে শুনেছে, এক সময় ওরা এভাবেই থাকত। প্রকৃতির কোলে, প্রাকৃতিক বেশে, গানে-নাচে প্রাকৃতিক বন্দনায় ভরে থাকত ওদের সহজ সরল জীবন। যতদিন না অ্যামেরিকান মিশনারিরা সভ্যতার ভয়াবহ কুটিল থাবায় ওদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করে। কৃষ্টির নামে সাম্রাজ্যের বিকাশ, আর ধর্মের নামে, ওদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিলীন করে দিতে চাইল, এক কাল্পনিক ঈশ্বরকে সামনে খাড়া করে। সভ্যতা এল। সঙ্গে নিয়ে মানুষের অন্তরের কুটিল নগ্নতা। প্রাকৃতিক সাজে সাজা নারীদের বিক্রি করতে সক্ষম হল ইরটিজমের নগ্নতায়। নিয়ে এল সিফিলিস। নিয়ে এল কুটিল সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ

অহংকারর উন্মাদ তাণ্ডব। বিক্রি হয়ে গেল ওদের রাজাধিরাজ। বিক্রি হয়ে গেল কোমলতা। বিক্রি হয়ে গেল নিষ্পাপ সারল্যে ভরা বনলতার কোলে বড় হওয়া মাধবীলতা।

বাজনার তালে তালে, সারি দিয়ে নেচে চলেছে কমবয়সি পুরুষ ও নারী। মধ্যবয়সি ও বৃদ্ধরা একপাশে বসে মাই তাই-এর নেশায় ডুবে যাচ্ছে। অদ্ভুত লাগল, কেউ কিন্তু কোনো ধরনের তামাক সেবন করছে না। মাই মাই-এর নেশায় নাচের ছন্দে নন্দিনীর সারা দেহে অনুভূতির রং ছড়িয়ে, পাকালা গ্রামের দেবী বন্দনায়, মন নেচে উঠল নতুন ছন্দে। আনন্দের স্পর্শ চুমু খেয়ে যাচ্ছে দেহের প্রতিটা কোষে। সভ্যতার নাগপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকৃতির কোলে মিশে যেতে।

নন্দিনীকে একটু তাড়াতাড়ি খেতে দেখে অর্ণব কানে কানে ফিসফিস করে বলল "এটা হুইস্কি নয়। এর আগে কখনও খাওনি। কত স্ট্রং জান না। একটু ধীরে সুস্থে খেও"

"আমার কিসসু হবে না। এই মস্ত সময় সংযমের কোনো মানেই হয় না" নন্দিনীর ভেতর থেকে যেন আনন্দের ঐকতান সুরধ্বনি তুলছে ছন্দে হারিয়ে যাওয়ার স্রোতে।

পাশে বসা কিছু কমবয়সি গৃহবধূদের দিকে ফিরে বলল "ইজ দেয়ার এ নেম ফর দিস ডান্স?"

ওদের মধ্যে একজন বলল "দ্য নেম অরিজিনালি ওয়াজ হুলা কাহিকো, দো দ্য ফর্ম মে হ্যভ চেঞ্জড নাউ। আই ডু নট নো অ্যাবাউট ইট ইন ডিটেলস"

"ডোন্ট ইউ লিভ হিয়ার?"

"নো। আই স্টাডি ইন সান ফ্রান্সিসকো। আই হ্যভ কাম টু ভিসিট মাই গ্র্যান্ডমা। অল আই নো ইজ, দে হ্যভ এ স্ট্রিক্ট লেজিসলেচার। ডিওরিং সেরিমনিস, ইফ এনি মিস্টেক্স আর মেড, ইট ইজ কন্সিডারড ইন আওয়ার ট্র্যাডিশন অ্যাজ এ ভেরি ব্যড ওমেন। গডেস লাকা উইল নট ফরগিভ দেম"

ঠিক দেশীয় ভরতনাট্যমের মতো। কোথায় যেন আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অদ্ভুত মিল খুঁজে পাচ্ছে নন্দিনী। এক সময় ভরতনাট্যম শেখা নন্দিনী দেবতার স্তুতির ঘরানাটাও অনুভব করছে। দুঃখ হচ্ছে ভেবে, এই সাবেকি ঘরানাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কীভাবে পিষে দিয়ে গেছে ধর্মের নামে।

ধ্যত...

এসব ভেবে কী হবে?

ভাবনার জটগুলো ক্রমশ শিথিল। নেশার ছন্দে আবছা হয়ে আসা নাচের তালে আনন্দ। উঠে পড়ল নন্দিনী। ওদের দলে ভিড়ে পা মেলাতে উদ্যোগী হল। ওরা হাত ধরে অকৃত্রিম, টেনে নিল ওকে। ঘোরে, ওদের পায়ে পা মিলিয়ে, নিজের আনন্দে নেচে চলেছে নন্দিনী। এখানে কোনো রং নেই, তবু যৌবন আছে। এখানে কোনো ভড়ং নেই, প্রাণ আছে। কোনো ছবি নেই, তবু মনের চোখে দেখা একটা আবছা ক্যানভাস আছে।

নাচ শেষ হতে না-হতেই, এক বৃদ্ধা মহিলা উঠে এসে নন্দিনীর হাতটা চেপে ধরল। বিড়বিড় করে কী যেন বলে যাচ্ছে। ওদের ভাষা কিছুই বুঝতে পারছে না। হাতটা ধরেই রেখেছে। কিছুতেই ছাড়ছে না।

প্রতিবাদ না করে বৃদ্ধার পাশে দাঁড়িয়ে।

নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে চলেছে “এনুএনুয়ে এ... আনা প্যলেমো”[3]

একটু থেমে আবার বলল “প্যলেমো এ... আনা হুলা হুলা”[4]

আবারও বিড়বিড় করে বলল “লা লিও কানে এ... আনা আলানা”[5]

নন্দিনীর হাত চাপ দিয়ে আবার ওই তিনটে পঙক্তি বিড়বিড় করে বলতে বলতে, এক সময় নন্দিনীর হাত ছেড়ে গাছের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

মাই তাই-এর নেশা, নাচের ক্লান্তি। ভাষা বুঝলেও তা নন্দিনীর বোধগম্য হত না।

সান ফ্রান্সিসকোতে পড়া মেয়েটার দিকে এগিয়ে গিয়ে নন্দিনী জিজ্ঞেস করল “হোয়াট ওয়াজ দ্য ওল্ড লেডি সেয়িং?”

“সি ইজ মাই গ্রন্ডমা। সি ইজ ক্রেজি। অল নাটস। সি গোস অন উইথ হার ওন প্রেডিকশনস অল দ্য টাইম। নোবডি গিভস হার এনি হিড”

“স্টিল! হোয়াট ওয়াজ সি সেয়িং?”

“সি সেইড ‘রেনবো উইল সিঙ্ক’ ‘ডার্কনেস অফ ডান্স উইল কাম’ ‘সান অফ মিউসিক উইল রাইজ’”

ঘোরে এমনিতেই মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মেয়েটির কথাগুলোই ঠিকভাবে বুঝতে পারছে না। তার ওপর গ্র্যান্ডমার কথাগুলো যেন সব কিছুকে কেমন ওলটপালট করে দিল। বুঝতে পারেনি ড্রিঙ্কটা এত স্ট্রং। খড়ের চালের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে চাইছে।

একটু ঘুম। বাস্তব থেকে স্বপ্নে যেতে। কিছুক্ষণ আগেই স্বপ্নের দেশে চলে গেছিল। গ্র্যান্ডমা তাকে ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবের কঠোর আঙিনায়। হোক সে পাগল। হয়ত কথাগুলো নিছক পাগলামি। আবার নাও হতে পারে। নন্দিনীর মনে হল হঠাৎ তার হাত ধরেই বা পাগলামো করতে যাবে কেন বুড়ি?

"কাম... টেস্ট আওয়ার কী-আহ-ভে [6]" মেয়েটি ডাকল।

"ওয়ান্ট টু স্লিপ" অর্ণবের দিকে ফিরে বলল "তুমি খেয়ে নাও। আমি শুতে যাচ্ছি"

পেছন ফিরে না তাকিয়ে হেঁটে চলল খড়ের চালের ডেরায়। কোনো এক অজানা কারণে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। গ্র্যান্ডমার কথায় এক অজানা আশংকায় বুকটা ছটফট করছে।

কীসের ভয়?

কে জানে?

ভয় হয়ত একটাই।

সুখের স্বপ্নটাকে ভাঙতে চায় না। সেও আর পাঁচজনের মতো স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চায় বাস্তবকে দূরে সরিয়ে রেখে।

---

[1] নারকেল মালা

[2] হাওয়াই এর ড্রিঙ্ক

[3] রেনবো উইল সিঙ্ক

[4] 'ডার্কনেস অফ ডান্স উইল কাম

[5] 'সান অফ মিউসিক উইল রাইজ

[6] সি ফুড

এগারো

কি. না।

স্বপ্ন ভেঙে বাস্তব ফিরিয়ে আনে মাটির পৃথিবীতে। পূর্ণতার মজলিস থেকে শূন্যতার ক্রুর ক্যানভাসে। ছবিটা আঁকতে গিয়েও ছবিটা সম্পূর্ণ হয় না। মুছে যায় জীবনের চোরাবালির স্রোতে। আলো থেকে অন্ধকারের রিক্ত নিঃস্বতায়।

রং মিলিয়ে, বারবার ছবিটাকে নন্দিনী আঁকতে চেয়েছে আলোর উদ্ভাসে। হয়ত দীপ্ত আলোর রোশনাইতে সেভাবেই আমরা সবাই রং নিয়ে খেলি। নন্দিনীও খেলছিল সেভাবে। দিনের আলোর বর্ণচ্ছটার দৃপ্তিতে। কিন্তু নিকষ কালো অন্ধকারের গভীর অলিন্দেও তো সপ্ত রং-এর ক্যালিডিওস্কপ ঘোরে। সেখানেই রং-এর বর্ণালি মিশে যায়। কালোয়। আঁধার করে আলো-কে।

সেই ধূসর কালো অন্ধকারটাই সঙ্গী। সাত বছরের অনীশকে বুকে আগলে, অর্ণবকে অ্যাটলান্টিকের ওপারে ফেলে, নায়েগ্রা থেকে কলকাতায় ফিরেছিল নন্দিনী। অ্যামেরিকাকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেশন করতে দিয়ে, নিজের ইচ্ছার পরাধীনতাকে ফেলে, অকল্পিত স্বাধীনতায় নিঃস্ব, শূন্য, অর্ণবহীন সল্ট লেকের বাড়িতে। তিল তিল করে এই ক'বছরে গড়ে তোলা ছবি, জীবনের রং দিয়ে আঁকা ক্যানভাস যে হঠাৎ একটা তুলির টানে এক নিমেষে মুছে যাবে, ভাবতেও পারেনি।

অথচ এমনই হল।

অর্ণবের ছোটবেলার পাড়ার কল্লোলদা উদাস নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল "এরপর?"

"জানি না। ভাবি না" কল্লোলদার দিকে ফ্যাকাসে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে বলল "ভাবতে চাই না। আচ্ছা, ভেবে কী কোনো লাভ আছে?"

"হয়ত নেই। যেটুকু আছে, তার মধ্যেই গুছিয়ে নিতে হবে"

"পড়ে আছে শুধু এই সল্ট লেকের প্রাসাদটা। সেখানে অনীশ, নারায়ণ আর একা আমি"

‘একা’ শব্দটায় কী বেশি জোর দিয়েছিল নন্দিনী? মাঝে মাঝে নিজের অজান্তে অনেক শব্দের ব্যঞ্জনা বেরিয়ে আসে, যা মনেও রাখা যায় না।

সেদিন আর বেশি কিছু বলতে পারেনি কল্লোলদা। সেই মুহূর্তে বলাও যায় না। হয়ত বলতে চাইছিল ‘তোমার বয়স এখনও কম। সারা জীবন পড়ে আছে। অনীশের কথা ভেবে কী আবার জীবনের দিকে তাকানো যায় না?’

ছন্নছাড়া জীবনটাকে মালা দিয়ে গেঁথে তো ক্যানভাসটাকেই সজীব করতে চেয়েছিল নন্দিনী। আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল অর্ণব আর অনীশকে নিয়ে। স্বাভাবিক জীবনের ছবি। সংসারের ছবি। ভালবাসার তুলি দিয়ে আঁকা চেনা ক্যানভাসে।

যেদিন অনীশ হল, অর্ণবের সে কি উচ্ছ্বাস!

“উ...লি আমার সোনাটা। তোকে নিয়ে আমরা সারা পৃথিবী ঘুরব জাহাজে করে”

ঘোরাটা অসমাপ্ত রেখে চলে গেল। শূন্যতা থেকে পূর্ণতা, আবার শূন্যতা - জীবনের একটা সার্কেল। তার থেকে কেকের মতো একাংশ কেটে নিলে, সেটাও জীবন, সেটাও স্বপ্ন, সেটাও সম্পর্ক, প্রত্যেকটা অংশই এক-একটা রং। বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্যালিডস্কপের চোখে খেলে যাচ্ছে নানা বর্ণে - একটা সম্পূর্ণ ছবি আঁকছে। কোনো রং-ই এককভাবে পূর্ণ নয়। তাই অসমাপ্ত ছবিটা শেষ হওয়ার আগেই, হারিয়ে যাচ্ছে রংহীন ধূসরে।

তবুও, এই সাত বছরে জীবনের স্লাইসে অনেক রং তো ছিল। যখন নন্দিনী গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে বেরবার জন্য তোড়জোড় করত, অর্ণব প্রতিবাদ করে বলত “না...না... এ শাড়িটা ভাল লাগছে না”

“কেন?” নন্দিনী তির্যক তাকিয়ে প্রশ্ন করত।

“কেমন ডিপ্রেসিং... বর্ষার কালো মেঘের মতো। তোমার চেহারাটাকে ম্লান করে দিয়েছে”

“তো কী পরব?”

“সামথিং ব্রাইট অ্যান্ড এনকারেজিং”

শাড়িটা পালটে হলুদ শাড়িতে নিজেকে মুড়িয়ে নন্দিনী বলত “এটা? চলবে তো?”

“বাঃ... এটা তো বেশ। তোমাকে দারুণ মানিয়েছে। আই লাইক ব্রাইট কালারস। আই ডোন্ট ফ্যান্সি ডার্কনেস। উইথ ইউ অ্যান্ড অনীশ অ্যারাউন্ড স্প্রিং ইজ অন দ্য কারডস।

ইওর ড্রেস রিফ্লেক্টস দ্য ইটারনাল কালারস অফ দ্য পারপেচুয়াল স্প্রিং”

নন্দিনী ঠাট্টা করে বলত “স্প্রিংটা তো মনে। ওটা কী শাড়ির রঙে?”

“হয়ত ওই রংটাই স্বপ্ন দেখতে শেখায়... কে জানে?”

“এত রং নিয়ে স্বপ্ন দেখার কিছু নেই। রং ছাড়াও আমি থাকব। অনীশ থাকবে”

ওরা থেকে গেল। নিজের রঙটাই মুছে দিল অর্ণব।

বাইরের রং-এর প্রতি অনীহা বলেই কি, নন্দিনী অন্তরের রং খুঁজতে চাইছিল? কিংবা শুধু বাসন্তী রং দিয়ে নয়, সব রং দিয়েই একটা ছবি আঁকতে চাইছিল। হয়ত অর্ণবের কাছে রং-এর মাধুর্য তার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে। নন্দিনী হয়ত সেখানে অন্তরের রংটাই খুঁজতে চেয়েছিল।

“বউ সুন্দর রঙে সাজলে কার না ভাল লাগে?”

“শুধু বাইরের রংটাই দেখলে? মনের রংটা দেখলে না?”

নন্দিনীর কথায় লজ্জা পেয়ে যেত অর্ণব। অর্ণবের ফটোগ্রাফারের দৃষ্টি বাইরের রংটাই খুঁজছিল। নন্দিনীর শিল্পীর অনভুতি তাকে অন্তরের ক্যানভাসটা আঁকবার রং ধরিয়ে দিচ্ছিল।

সাত বছরের বিবাহিত জীবনে, রামধনুর রং-এর বাহার দিয়ে জীবনটা আঁকলেও, মুহূর্তের মধ্যে নায়েগ্রা ফলসের রেইলস। সীমিত রেসিস্টেন্সটা হঠাৎই কে যেন বিদীর্ণ করে দিল এক মুহূর্তে - ভাসিয়ে নিয়ে অর্ণবকে বহু রং-এর সংমিশ্রণ থেকে ধূসর অন্ধকারে। সব রং মিশে গেল এক বর্ণহীন কালোর ধূসরে - নিউটনের কালার থিওরির মতো।

“কী করবে? কিছু ঠিক করলে?” কল্লোলদা আবার প্রশ্নটা করল।

“কী বলতে চাইছেন কল্লোলদা? আবার বিয়ে করতে?”

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল কল্লোলদা “তোমার আর অনীশের সারা জীবন পড়ে আছে। তোমার কথা ভুলেও, অন্তত অনীশের কথা ভেবে তো একটা স্ট্যাবিলিটি খুঁজতে পারো। আমি জানি যেখানেই থাকুক না কেন, অর্ণব তাতে খুশি হবে”

“আনস্ট্যাবিলিটির মধ্যেই স্ট্যাবিলিটি - এটাই তো আমার জীবন কল্লোলদা। এর বেশি আশা করাটাই ভুল। এইটুকুর মধ্যেই অনীশকে মানুষ করতে পারব”

সিদ্ধান্তে নন্দিনী যে দৃঢ়, একটুও বুঝতে অসুবিধা হয়নি কল্লোলদার। আলট্রা মেরিঙ্গে ফিরে যায়নি নন্দিনী। যদিও অফারটা খোলাই ছিল। অর্ণবকে ততটা সময় দিতে পারবে না ফুল টাইম চাকরি করলে। পৈতৃক সূত্রে অর্ণবের যা প্রপার্টি আর এতদিনে সে যা কামিয়েছে, সঙ্গে সল্ট লেকের সিডি ব্লকে অর্ণবের বাড়িটা নিয়ে কিছু না করেও মায়ে-বেটায় দিব্যি চলে যাবে। কিন্তু কিছু না করে কী থাকা যায়?

নীচের তলায় আবার রং তুলি। ছবি আঁকার ক্লাস। এতদিন কাজগুলো করেছে পেটের তাগিদে। এবার করবে মনের তৃপ্তির জন্য। নিজেকে রোজগারের দাস না করে, মনের আবরণের বিকাশে ঢেকে দিতে চাইল, তার থেমে যাওয়া জীবনটাকে। আর র‍্যট রেসে ছোঁটা নয়। এবার একটু বিশ্রাম চাই অনীশকে নিয়ে। অনীশটা মানুষ না হলে, তার জীবনে আর রইলটা কী?

টনিদা কলকাতায় এলেই তার বাড়িতে ওঠে। এখানে হংকং এর কোনো আভিজাত্য নেই। আছে একটা নির্মল সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবেশ। ওই কৃত্রিম মাদকতা থেকে নন্দিনীর স্নিগ্ধতাটাই ওকে বেশি টানে। চুল আরও সাদা। মেদ বেড়েছে। টনিদা ঠিক আগের মতোই। ছোটবেলায় কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে যেমন। পাজামা পাঞ্জাবি পরে সেই ঘরোয়া। এন্থনি মিত্রের পৃথিবীটা পালটে গেলেও, সে পালটায়নি।

সিডি ব্লকের বারান্দায় বসে সামনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে পাশে বসা নন্দিনীকে বলল "তুমি একদিন বলেছিলে মেক বেস্ট আউট অফ দ্য ওয়ার্স্ট - ইজ দিস দ্য বেস্ট অফ দ্য ওয়ার্স্ট?"

"অ্যাট লিস্ট ফর মি। অনেক তো ঘোরা হল, অনেক তো দেখা হল, একদিন একটা সম্পূর্ণ সংসারের ভাবনা নিয়ে তোমার অফার। কলকাতায় ফিরেছিলাম। মাঝে জীবনে আরেকটা অ্যাডিশন অনীশ। এখন ওকে নিয়ে দিব্যি আছি। এর বাইরের সব রংগুলো তো ক্লিসে, একটা চেনা ছবি"

"তোমার অনীশের ছবিটাও তো চেনা"

"ওই যে মাঠের গাছগুলো, ওগুলোও কিন্তু নিজের মতো একা দাঁড়িয়ে। ওদের ভরাট করে রেখেছে সবুজ পাতার রং"

“ওই বসন্ত থেকে শরৎ পর্যন্ত। শীত পড়লে পাতাগুলো ঝরে পড়বে। তখন পড়ে থাকবে শক্ত গাছের গুঁড়ি”

“শীতের কথা ভেবে কী হবে টনিদা? জীবনের সাইকেলটা তো ঋতুর মতো ঘুরতেই থাকে। ছবি আঁকা শেখাচ্ছি তো। এখন আরও বেশি করে বুঝতে পারছি, জীবনের রংগুলো অনেকটা নিউটনের কালার হুইলের মতো। সাতটা রং দিয়ে আরও সাত হাজার রং তৈরি করা যায়, কিন্তু এত রং দিয়েও সম্পূর্ণ ছবিটা আঁকা যায় না”

টনিদা গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বলল “তুমি কি এখন কোনো ছবি আঁকছ?”

নন্দিনী চুলটাকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে বলল “হ্যাঁ... একটা ছবি অনেক বছর ধরে আঁকছি। অর্ণব যাওয়ার পর থেকেই...”

“আমাকে দেখাওনি তো”

“এখনও শেষ হয়নি। শেষ হলে দেখাব। ইনকমপ্লিট ছবি দেখে কী করবে? তার থেকে কমপ্লিট হলে দেখ”

“হোয়েনেভার ইউ থিংক ইউ হ্যভ কমপ্লিটেড”

টনিদা বুঝতে পারছে, নন্দিনী সারা জীবন ধরে বারবার ছবি আঁকতে চেষ্টা করে বিফল। শেষ পর্যন্ত রং তুলি নিয়ে ক্যানভাসে। স্বপ্ন কিংবা সেখান থেকে কুড়িয়ে আনা বাস্তবের ছবি আঁকতে চায়। সবুজের সমারোহ একদিন মাল্টি ডাইমেনশনাল রঙে আত্মপ্রকাশ করবে নতুন ছন্দে। সেই নানা রং-এর ছন্দের স্বপ্ন নিয়ে নন্দিনী থাকতে চায় তার ক্ষুদ্র দুনিয়ায়। তার স্বল্প জীবনের ছবিটায় পূর্ণতার স্বাক্ষর রাখতে।

টনিদা নিজের জীবনে বারবার পূর্ণতার ছবি আঁকতে চেয়েছে। শেষমেশ অজগরের মতো শূন্যতাই তাকে গ্রাস করেছে। জীবনের এই সায়াহ্নে, শূন্য-পূর্ণর দোলাচলে যা অসমাপ্ত থেকে গেছে পাওয়া না-পাওয়ার চোরাবালিতে।

নন্দিনী যদি পারে আঁকুক। সে তো সারা জীবন ধরে আঁকতে চেয়েও পারেনি। তার পরিপাটি সাজানো ক্যানভাসটা এখনও ফাঁকা। নন্দিনী অন্তত তার জীবনের স্বপ্ন নিয়ে সেই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাক তুলির টানে।

ছেলে ও ছবি নিয়ে নন্দিনী যখন আপন পৃথিবীতে মশগুল, একদিন কল্লোলদা বলল “ঘরে বসে তো রেগুলার শখের রেওয়াজ করছ। নয় এবার বাইরে একটা প্রোগ্রাম

করলে”

“হঠাৎ?”

“নাঃ। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম। তোমাকে নিয়ে একটা ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রাম অরগ্যনাইজ করলে মন্দ হয় না”

“আমাকে নিয়ে?”

“অবশ্যই। তুমি চিন্তা করো না। আমার ওপর ছেড়ে দাও” কল্লোলদার কনফিডেন্স দেখে নন্দিনী আশ্চর্য।

কল্লোলদা সব অরগ্যনাইজ করেছিল। নন্দিনীকে বলেছিল “রেওয়াজটা ভালভাবে করো। অন্তত আমার কথা ভেবে”

করেও ছিল। যা কিছু করে সবেতেই সে তার ক্ষমতার সর্বস্ব দিয়ে করে। ফলও মিলেছিল হাতেনাতে।

“দারুণ হয়েছে” ছেলে তো বলবেই। কল্লোলদার প্রশংসাটাই মন ছুঁয়ে গেছিল।

“চেষ্টা করেছি কল্লোলদা” নন্দিনী লাজুক, বিনয়ী।

“মারভেলাস! এবার আর কী? আদাজল খেয়ে নেমে পড়। ডোভার লেন মিউসিক কনফারেন্স থেকে অন্যান্য জায়গায় তো এবার পারফর্ম করতে হবে”

“না কল্লোলদা। আপনি বলেছিলেন বলে একটা করলাম। এটা আমার অনেক শখের মধ্যে একটা। শখ দিয়ে নাম-টাকা কামানোর কোনো মোহ-ই আমার নেই” একটু থেমে বলেছিল “সবাইকে যে কেউকেটা হতে হবে, কে বলেছে? আর পাঁচজন সাধারণের মতোই থাকতে চাই”

হায় রে!

নন্দিনীর মতো জীবনের গূঢ় সত্যটা যদি আর সবাই বুঝত। জীবনটা তাহলে কত সহজ হয়ে যেত।

নন্দিনী তার ছেলেবেলার বন্ধু অর্ণবের বিধবা। হয়ত এখনও জিনস, টপস, সালওয়ার, স্কার্ট, শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। হয়ত অন্যান্য বউদের থেকে আলাদা। সিগারেট খায়, ড্রিঙ্ক করে। কিন্তু এত বছরের মধ্যে একদিনও ওকে পার্টিতে গিয়ে বেলেল্লাপনা করতে দেখেনি

কেউ। নিজের ছোট্ট সংসারে ছেলে অনীশকে নিয়ে ছবি এঁকে বা রেওয়াজ করে দিব্যি কাটিয়ে দেয়। গুটিকয়েক লোকের সঙ্গে মেশে।

নন্দিনীর বাইরের জগৎ সীমিত হলেও, অন্তর যেন তার বেষ্টনী ভেদ করে অসীমকে ছুঁতে চাইছে। সুপ্ত আত্মার মহাব্যোমেকে ছোঁয়ার চেতনায়। এত বর্ণের মধ্যেও কোথায় যেন বৈধব্যের ধূসরতা। কিংবা উচ্ছ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে এক নিজস্ব ঔদাসীন্য। সেটাই নন্দিনীর ছবি।

নন্দিনী কী বোঝাতে চাইছে সেটা সম্পূর্ণভাবে অনুভব না করতে পারলেও ওকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই কল্লোলদা বলল "তুমি তোমার মতোই থাক। অন্য কেউ হতে চেও না"

থাকতে চাইলেও, কল্লোলদা যা বুঝেছে তার বিশ্লেষণে না গিয়েও, নন্দিনীর এখনও নিজের প্রতি সংশয়। রং ছেড়ে কিংবা সব রং-কে একত্র করে নন্দিনী তার গোপন ক্যানভাসে যে ছবিটা আঁকতে চাইছে, সেটা কী তার আসল রূপ? না, তার আমি-র প্রতিচ্ছবি? না কি, পাঁচমিশালি রঙে মাখামাখি নিজের সীমিত দিব্যদৃষ্টি? সৃষ্টি তো মনের আয়নার জলছবি। কিন্তু সেটা কী আসল নন্দিনীকে নিখুঁত করে?

একদিন শেষ হবে। দেখাবে তার এত বছর ধরে আঁকা একটাই ছবি টনিদাকে। যাকে কখনো বলতেই পারেনি ওটা তারই ছবি। সেলফ পোট্রেট। নিজেও জানে না ক্যানভাসের সেই ছবিটা কবে শেষ হবে!

বারো

বসন্তের অপরাহ্ণের মিঠে আমেজের রেশ মেখে সিডি ব্লকের বাড়ির বারন্দায়। মাঠের ওপারে লাল পলাশের দিকে আনমনা নন্দিনী। অপার লালের সমারোহ। কোথাও একটা কোকিল ডাকছে কুহু কুহু। ডাকটা চেনা হয়েও অচেনা রাগ মুলতানির সুর শোনাচ্ছে। শুধু জাতিটা আউদব সম্পূর্ণ কি না বোঝা যাচ্ছে না। তবুও ঋতুস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহের বাইরে, কোথায় যেন হারানো কোকিলের ডাক, নতুন সুরে বাজছে। চিনেও অচেনা একটা নতুন বিট। পলাশের রংটাকে চেনাচ্ছে নতুন আঙ্গিকে।

অন্যমনস্কভাবে মোবাইল ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সময় হয়েছে স্ট্যানফোর্ড থেকে অনীশের ফোন আসার...

"কী করছ মম?" ফোনটা বেজে উঠতেই ভাইবারে ওপাশ থেকে ভেসে এল ছেলের গলা।

"কিছুই না। বারন্দায় বসে লাল পলাশের দিকে চেয়ে আছি"

"ইটস স্প্রিং। দ্য ফ্লাওয়ারস মাস্ট বি ব্লুমিং অল ওভার" অনীশের অ্যামেরিকান অ্যাক্সেন্ট শুনে চমকে উঠল!

অনীশ আজ সুদূর অ্যামেরিকাতেই নয়, হয়ত মাটির কৃষ্টি থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হয়ত এটা হওয়ারই ছিল। এত তাড়াতাড়ি যে হবে, বুঝতে পারেনি। কিংবা হয়ত বুঝতে চায়নি। হয়ত সাব-কন্সিয়াসলি, নায়েগ্রা ফলসে অর্ণবের মৃত্যুটা তাকে এখনও অজান্তে তাড়া করে বেড়ায় বলেই কী?

যেতে দিতে মন না চাইলেও কি ধরে রাখা যায়?

অর্ণবকে ওর নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তো ছেড়ে দিতে হয়েছে। দেশ তো তাদের মতো উঠতি ছেলেদের জন্য কোনো ইকনমিক কমফর্ট জোন তৈরি করেনি। উঠতি বয়সে নিজে বাবা-মাকে হারিয়ে তেমন পড়াশোনা করতে পারেনি। পেটের তাগিদে জ্যোতিকিরণের শরণে আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়েছিল। শুধু চেয়েছিল, নিজের অপূর্ণতার রেশ যাতে অর্ণবের মধ্যে না পড়ে। ওকে নিজের মতো করে এগিয়ে যেতে হবে নিজের লক্ষ্যে।

আর স্ট্যনফোর্ড ইউনিভারসিটিতে পড়ার সুযোগ তো সবাই পায় না! সঙ্গে স্কলারশিপ। বাধা দেওয়া বাতুলতা।

নন্দিনী জানে, অনীশ আর ফিরবে না। যদিও বলে গেছে "দেখ মা, কারিকুলাম শেষ করে আবার ফিরে আসব। তোমাকে একা ছেড়ে কি আমি থাকতে পারব? কখনই নয়"

"এলেই ভাল" নিস্পৃহ ঔদাসিন্যে নন্দিনীর মন বলছিল অর্ণব এদেশে আর ফিরবে না।

ওপাশ থেকে মায়ের গলা না শুনতে পেয়ে অনীশ ভাইবারে বলল "কী হল মম? ইউ আর সাইলেন্ট?"

"নাঃ। তোর কথাই ভাবছিলাম"

"হিয়ার আই অ্যাম ডুয়িং এ লট ইন অল্টারনেটিভ স্প্রিং ব্রেক"

"ডোন্ট ওভার ডু। শরীর ঠিক আছে তো?"

"পারফেক্ট। অ্যাবসলুটলি জাস্ট ফাইন। উইথ দ্য স্প্রিং ব্লুমিং আই উইশ ইউ ওয়ার হিয়ার"

"জাস্ট এনজয় ইওর হলিডেস"

"ট্রায়িং টু। জুলি ইজ দেয়ার টু গিভ মি কম্প্যানি ইন ইওর অ্যাবসেন্স"

"এই জুলি কে? আগে তো বলিসনি!"

"ওহ মম... আই জাস্ট ফরগট। জুলি ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড"

"তোরা ভাল থাকিস। গিভ মাই রিগারডস টু জুলি"

"ইউ টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ। আই মিস ইউ মম"

"আই মিস ইউ টু"

ইন্টারনেট ফোনটা ডিসকনেক্ট করে মনে হল, সত্যি কি অনীশ তাকে মিস করে?

হয়ত করে।

কিছুদিন পর, হয়ত আর করবে না। ও কিন্তু অর্ণবের মতো অনীশকেও মিস করে যাবে। না করলেই বোধহয় ভাল ছিল।

মুছে যাওয়া জীবনের রংগুলোকে আর আঁকড়ে ধরে কী লাভ? কোনো রং দিয়েই তো ছবিটা আঁকা হল না। কিংবা হলেও অসম্পূর্ণ। হাজার রং-এর মেলায় ছবিটা ধোঁয়াশায়

মেশে। ক্ষণিকের পাওয়াটা আবার না-পাওয়ার স্পেসশিপে চড়ে হারিয়ে যায় রামধনুর রং-এর সংমিশ্রণে, আরও হাজার রং-এর মেলায়।

রং পরে থাকে।

ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যায় একটা অস্পষ্ট সিল্যুটের মতো। চেনা অচেনার পাঁচমিশালিতে একটা অস্পষ্ট অবয়ব। অন্ধের মতো দিনের আলোতেও তাকে খুঁজে বেড়াতে হয়। মন সেই চেনা রামধনুর রং নিয়ে একটা অচেনা ছবি আঁকতে চায়।

নন্দিনীও চেয়েছিল।

এতদিনে সেই ছবিটা সম্পূর্ণ হয়েছে। নিজের মনের ডানা উড়িয়ে, পাখনা মেলে ভেসে এত রং দিয়ে আঁকা ছবিটার মধ্যে একটা অধ্যায় শুধু বাকি। সেই ক্যানভাসে নিজের চেতনার ছোঁয়া দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার। তার দেবী বরণ। সময়ের আবর্তের গোলোকে ঢুকে প্রাণের স্পন্দন দিয়ে ক্যানভাসের ছবিটাকে জীবন্ত করে তুলতে হবে।

সেই ম্যজিক ওয়ানডের আশায় পলাশের রং-এর মেলার দিকে তাকিয়েছিল নন্দিনী।

কত জনই না জীবনে এল, গেল - কত রং-এর বাটি নিয়ে। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে আঁকতে চেয়েছে। নন্দিনীর জীবনের ছবি। হয়ত কেউ প্যলেট পর্যন্ত নিয়ে যেতেও সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ক্যানভাসের পরিপূর্ণতা আনতে পারেনি। সেই রং-এর মূর্ছনায় নন্দিনীকে রেখে গেছে অসমাপ্ত, অপরিপূর্ণ। বারবার ক্যানভাস সাজিয়ে, রং তুলি নিয়ে, ছবিটা আঁকতে গিয়েও হয়নি। ছন্নছাড়া রংগুলো ঝরে পড়েছে। প্যলেট থেকে জীবন নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া অতীত। পাহাড়ি নদীর পথে হারিয়ে গেছে মোহনাহীন গন্তব্যে। চোরা স্রোতের আবর্ত রঙগুলো শুষে নিয়েছে। গভীরের অন্ধকারে। সেখানে মিশ্রিত রং-এর সমন্বয়, অন্ধকারের কালোতে।

নন্দিনী তো সেই কালো দেখার জন্যই ছবিটা এত বছর ধরে আঁকছিল না। আলোর সন্ধানেই তো তার এই প্রয়াস।

আলোর রং ছড়িয়ে তো ইন্দ্রনীলও এসেছিল। ফাগুয়ার হোলির স্বপ্নমাখা জীবনের প্রথম প্রেম। মাঝরাতে কেঁপে কেঁপে ওঠা। শরীর আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল ইন্দ্রনীলকে নিয়ে। দেহের প্রতিটা কোষ, প্রতিটা রোমকূপে আনন্দ নিয়ে যৌবনে পাড়ি দেওয়া এক নারী। সম্পূর্ণরূপে চেয়েছিল ইন্দ্রনীলকে। পেল শুধু দেহটা। কয়েক মুহূর্তের উত্তেজনা।

আর পেল, ইন্দ্রনীলের সযত্ন নিভৃত আবরণে অচেনা রং। ভিত না থাকতেও গড়ে ওঠা স্বপ্নের মিনার। চূর্ণ হল জীবন স্রোতের রুক্ষ বেলাভূমিতে। সিঁথির সিঁদুর রঙিন না করেই, ফাগুয়ার লাল মুছে গেল ক্যানভাস থেকে।

হয়ত সবার জীবনে ঋতব্রত আসে না। কিংবা এলেও এভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু ক্যসিনোতে দাঁড়িয়ে নন্দিনীর জীবনের মোড়টাই ঘুরিয়ে দিয়েছিল। হেঁটেছিল অন্যান্য মেয়েদের থেকে ভিন্ন পথে। জ্যোতিকিরণের সঙ্গে। একটা চেনা অথচ অজানা সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হতে। আরেক রং-এর জলছবি আঁকতে, বাঁচার পথে। সেই রংটাও তো একদিন হারিয়ে গেল, একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের আশায়।

প্যলেটে রং নিয়ে ক্যানভাসে নতুন ছবি আঁকতে গিয়ে তার অস্তিত্বে যে এরশাদ সাহেবের রঙটা বাড়তি, বুঝতে সময় লেগেছিল। কম্বোডিয়াতে সেটা উপলব্ধি করলেও, তার সিলমোহর বসাল হংকং-এ টনিদা। ক্যানভাসটা মুছে নতুন ভাবে আঁকার রসদ তুলে দিল নন্দিনীর হাতে। বাঁধতে তাকে শাশ্বত আকাঙ্ক্ষিত আলোকে। অবিরল ছোটা নয়। বিরাম স্বাভাবিক জীবনের নতুন স্বপ্নে। আলট্রা লাইফ মেরিন্স-এর নগণ্য একটা কর্মচারী।

কিন্তু শ্বাশ্বত নারী মন তো নানা রং-এর বৈচিত্র্য চায় না। চায় বন্ধন। চায় বন্ধনের মধ্যে রং-এর স্পন্দন। সুনিবিড় শান্তির নীড়। চায় বন্ধনের লক্ষ্মণরেখায় সীতার পবিত্র বিচরণ। সেখানেই শান্তি। সেখানেই মুক্তি। সেখানেই ইহজীবনের স্বর্গ। অতীতের ঝঞ্ঝাকে পেছনে ফেললেও, অর্ণবের সুনিবিড় ভালবাসার কোলেই স্বপ্নের ক্যানভাসটা সঁপে রঙিন করতে চেয়েছিল রামধনুর রং-এর সমন্বয়ে। নতুন ছন্দে, নতুন স্পর্শে, নতুন কল্পনার দিব্য আলোকে। সেই আপাত পূর্ণতার র‍্যকস্যকে অনীশের আগমন যেন নতুন ক্যাডেন্স জুড়ল এযাবৎ কম্পোজ করা আরেক নতুন সিম্ফনিতে।

এখানেই বেশিরভাগ নারীর জীবনের চেনা গল্পটা শেষ হয়ে যায়। চেনা রং-এর বাহারে চেনা ছবি আঁকে - পারিবারিক ছবি, ছেলে, বৌমা, নাতি-নাতনির ছবি। চেনা ক্যানভাস। চেনা বিন্যাস। চেনা পরিণতি। সেটাই গতানুগতিক। বিক্ষিপ্ত রং প্যলেটে থাকলেও তার মিশ্রণে ফুটে ওঠে একটা ‘চেনা পূর্ণতার’ পরিচিত ছবি। যে কারও হতে পারে। নন্দিনী, পদ্মিনী, রুক্মিণী বা মৃগনয়নীর ছবি।

জন্মাবার পর জ্যোতিষভাষ্য "শুক্ল পক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ভোর চারটে চুয়াল্লিশ মিনিটে জন্ম। এ মেয়ের জীবন আলোয় আলোয় ভরে উঠবে"

হয়ত সেই আলোটা খুঁজতেই নন্দিনীর ছবিটা পদ্মিনী, রুক্মিণী বা মৃগনয়নীর মতো হল না। অর্ণবকে অ্যামেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে-তে স্বাধীনতা দিয়ে অনীশকে বুকে আগলে ফিরে এল অন্তরের ছবিটা খুঁজতে। আবার নতুন আলোর সন্ধানে। বৈচিত্র্যর মধ্যে নিজের সৃজনশীলতাকে ভাসিয়ে দিতে ছবিতে, সুরে, নৃত্যের তালে। নিজের বৈচিত্র্যটাকে আরেকবার আর্কাইভ থেকে বার করে স্ক্যন করতে রানিং ক্যসের রেজিস্ট্রিতে। কোনো ডেডলি ভাইরাস বা ট্রজেন যাতে সেখানে বাসা বেঁধে না থাকে।

শুরু হল সেই রেস্টরড আর্কাইভ দিয়ে নিজের একটা ছবি আঁকা। তার একান্ত নিজের আপনার ছবি। র‍্যমের ক্যস থেকে সব কিছু মুছে, তার পিউরিফায়েড সেরিব্রাল কম্পিউটারের অ্যামিগড্যলা দিয়ে আঁকা, একান্ত পরিপূর্ণতার ছবি।

ছবিটা আঁকা শেষ হয়ে গেছে। শুধু উন্মোচনটাই বাকি, শেষ তুলির ছোঁয়া আর নিজের স্বাক্ষরের অপেক্ষা...

পলাশের পাতাগুলো কেমন স্থির। একটুও কাঁপছে না। একটা স্তব্ধ দ্বিপ্রহর বসন্তের আঙিনায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে। হয়ত সতেজ ফুলগুলো রং ভুলে নতুন রং-এর প্রতীক্ষায়। স্তব্ধ বিস্ময়ে। রংহীন রং-এর ফাগুয়ায়, আরেক সুর ভাঁজতে কিংবা আরেকটা ছবি। যা ঋতুরাজ চলে গেলেও মলিন হবে না ঋতুস্রোতের মহাপ্লাবনে। সেখানে হয়ত কোকিল ডাকবে নতুন কোনো এক সুরে। হয়ত চিরবসন্ত আঁকবে নতুন প্যলেটে কাল প্রবাহের রংহীন চিরশান্তির ছবি। সেখানে কোনো চেনা রং নেই। বাসন্তী, লাল সব মিলেমিশে একাকার এক অজানা রং-এর সংমিশ্রণে।

রংটা একটা আকার নিচ্ছে নন্দিনীর অবচেতনে। মাধুর্য নিয়ে বিকশিত সেই অচেনা রং-এর প্লাবন। একা বারান্দায় বসে আর্কাইভগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া।

হঠাৎ এত বছর পর মনে পড়ে গেল, হনলুলুর পাকালা ভিলেজ। নাচের শেষে পাগলি মামার হাত চেপে ধরা। ভবিষ্যদ্বাণী। এতদিন পরেও স্পষ্ট কথাগুলো।

মামা নন্দিনীর হাত চেপে বারবার বিড়বিড় করে বলেছিল, রেনবো উইল সিঙ্ক। রামধনুর রং বুঝি সত্যি অস্তাচলে। তাই গাছের পাতাগুলো হাওয়ার অভাবে স্তব্ধ বিস্ময়

অপেক্ষা করছে, ডুবে যাওয়া রামধনুর রং-এর নতুন রূপ দেখতে। অনীশের চলে যাওয়ার পর জীবনের শেষ পলাশের লালটাও ধূসর হয়ে গেছে।

আরও বলেছিল, ডার্কনেস অফ ডান্স উইল কাম। এত বছরেও মনে পড়ে না শখ করে আর কখনও ভরতনাট্যম নেচেছে কি না। খাজুরাহর স্মৃতিটা বিষধর সাপের মতো ছোবল দিয়েছে নাচের প্যশনটাতে। চেষ্টা করেও জাগাতে পারেনি বিস্মৃত প্রতিভা।

শেষ কথাটার ট্র্যান্সিলেটেড ভার্সনটা আবারও মনে পড়তে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। সান অফ মিউসিক উইল রাইজ। এই একাকী জীবনের ধূসরতার মধ্যে ছন্দ আঁকতে, এখন সে তো গানের মধ্যেই ডুবে গেছে। যদিও কল্লোলদার অনুরোধ সত্ত্বেও আর প্রোগ্রাম করেনি। তবুও মুক্তির পথে সেটাই তার জীবনের নব সূর্যের অভ্যুদয়।

মামাকে অন্যরা ক্রেজি বললেও হয়ত সত্যি পাগল ছিল না। অভিজ্ঞতার মোড়কে সারল্যের সততায়, বোধহয় সত্যিটাকেই আগাম দেখতে পেয়েছিল। আর পেয়েছিল বলেই হয়ত অচেনা নন্দিনীর হাত চেপে সেটাই বলতে চেয়েছিল। অনেক সময় অনেকে অনেক কিছু বলতে চায়। আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তাধারার অর্বিটের বাইরে আমরা তা শুনতে চাই না, বা বুঝতে পারি না।

নন্দিনী বারান্দার বেতের সোফা ছেড়ে উঠে হাউস কোটের গিট্টুটা বেঁধে স্টাডির দিকে এগোল। বেডরুমের পাশের এই ঘরটা তার স্টাডি কাম কম্পিউটার রুম, রেওয়াজ রুম কাম স্টুডিও। এখানেই সে দিনের বেশি সময় কাটায়। এটাই তার সৃষ্টি ও কৃষ্টির পৃথিবী, যেখানে সে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে তার সৃষ্টির মধ্যে। অর্ণব যখন বেঁচে ছিল, এটাই ছিল ওর অবসরের পীঠস্থান। নায়েগ্রা ফলস থেকে ফেরার পর, সেও এটাকেই নিজের দিন যাপনের বিচ্ছিন্ন মন্দির করে ফেলেছে।

এত বছর ধরে, তার নিভৃত রাজ্যে, সে সব সৃষ্টি ভুলে, একটাই ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। তার নিজের ছবি। অন্তর দিয়ে গড়া তার অন্তরের প্রতিমা। নিজের আলোয় নিজেকে দেখার চেষ্টা করেছে। সেলফ পোরট্রেট আঁকার চেষ্টা করেছে, তার অদেখা অবয়বটাকে খুঁজে পেতে। নিজের অচেনা প্রতিবিম্বকে দেখতে চায় সৃষ্টির ক্যানভাসে।

খুব কম লোকই জানে ছবিটার কথা। খুব কম লোকেরই অধিকার আছে, তার এই পৃথিবীতে প্রবেশ করার। এমনকী টনিদারও নয়।

একবার টনিদা জিজ্ঞেস করেছিল “ও ঘরে কী আছে?”

“আমার জীবন। মানে আমার পাগলামোর অ্যাসাইলাম” ঠাট্টা করে নন্দিনী উত্তর দিয়েছিল।

“ঠিক বুঝলাম না” টনিদা ভুরু তুলে নন্দিনীর দিকে তাকিয়েছিল মুচকি হেসে।

“দেখাব গো দেখাব। তোমাকে একদিন দেখাব। আমার স্বপ্নের ক্যানভাসটা”

“কবে?”

“যেদিন ছবিটা শেষ হবে”

গতকাল ঠিক রাত সাড়ে বারোটায় ছবিটা কমপ্লিট। এতদিন ধরে এত রং দিয়ে আঁকা ছবি। ছবিটার ওপর রং-এর শেষ আঁচড় দেওয়ার আগে নন্দিনী নিষ্পলক চেয়ে বসেছিল।

হয়েছে তো?

পেরেছে তো মনের ক্যানভাসের প্রতিচ্ছবি নিখুঁত আঁকতে?

ঠিক যেমনটি চেয়েছিল।

ফ্যালফ্যাল করে নিজের সৃষ্টির দিকে চেয়ে বিহ্বল। আত্মতৃপ্তিতে মনটা ভরে গেছে।

হ্যাঁ। ঠিক যেমন চেয়েছিল, তেমনই হয়েছে।

মনের মাধুরী দিয়ে আঁকা অমলিন। তার দৃপ্ত বলিষ্ঠ নারীত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ছবির নীচে নিজের স্বাক্ষর আঁকতে গিয়ে থমকাল।

নাঃ... থাক।

কাল ফাইন্যাল দেখে আঁকবে।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে...

আজ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ছবিটা কমপ্লিট করতে এসেছে। কাপড়ে ঢাকা ছবিটা খুলে সামনে দাঁড়াল। দেখছে মনের তুলির স্পর্শে আঁকা নিজেকে।

এই কি সে নন্দিনী?

থমকে তাকাল।

একবার...

দুবার...

অনেকক্ষণ ধরে

বারবার...

মনের মধ্যে ডুয়েল বিটস-এর লহরা বাজছে। এটা কোনো প্রচলিত মধুর রাগ নয়। কোনো পরীক্ষিত স্তুতি নয়। কোনো চেনা সুরের মাদল নয়। এই ছন্দকে সময়ের ব্যাপ্তিতে, চিন্তার উর্বর বিন্যাসে, ক্রিটিকের দৃষ্টিতে, সুপ্ত ইমোশনের স্ফুলিঙ্গের দৃপ্তিতে কোনো চেনা গতের কৃষ্টির মধ্যে বন্দি করা যায় না।

তার অন্তরের ডামাডোলের শেষ স্বাক্ষর। একান্তই নিজস্ব।

এটাই সে।

আসল নন্দিনী।

চোখের পলকে পেইন্ট ব্রাশটা হাতে তুলে নিল। রং-এর প্যালেটটা খুঁজছে। সব রং দিয়ে ছবিটা আঁকা হয়েছে। শুধু একটাই রং বাকি। এই মুহূর্তে সে রংটাকে চিনতে পারছে। সব রং যেখানে গিয়ে মিলেছে সেটাই তার রং। তার আসল রং। বাকি রংগুলো সত্য হলেও তার ক্যানভাসে এদের কোনো জায়গা নেই। এগুলো এখন তার সম্পূর্ণতার পথে বাড়তি। এগুলোকে মিশিয়ে মেলাতে হবে একটাই রঙে।

সাদা রং দিয়ে ধীরে ধীরে ছবিটাকে মুছে দিচ্ছে নন্দিনী। তার প্রাণ প্রতিষ্ঠার শেষ স্বাক্ষর এঁকে দিচ্ছে সুপ্ত চেতনার জাগরণে। এত বছরের আঁকা ছবিটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে তার শেষ রং-এর তুলির স্পর্শে। তার শেষ স্বাক্ষর বহন করে, নিজের হাতে গড়ে তোলা নিজের প্রতিমাটাকে নিজের তুলিতে বিসর্জন দিয়ে, তাকে মুক্তির মন্ত্র শোনাতে। সেখানেই তার আকৃতি, প্রকৃতি, বিকৃতি। সেখানেই সে অমলিন। সদর্পে সীমাহীন। নিজের চেতনার উদ্ভাসে। সেখানেই সে পরিপূর্ণ রংহীন ক্যানভাসের প্রত্যক্ষ বর্ণহীন আকারে। তার নিজেকে চেনার প্রস্ফুটিত দৃপ্তলোকে। সেখানেই তার ক্যানভাস পূর্ণ উজ্জ্বল, দ্বিপ্রহরের দিবালোকে। আপন মহিমায় উদ্ভাসিত, নিজের মলিনতার না-চেনা শ্লোকে।

ছবিটাকে সাদায় ঢেকে, একটা ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাসকে পেছনে ফেলে নন্দিনী আবার বারান্দায় এসে বসল।

অপারাহ্ন তখন পুরিয়া ধানেশ্রীর সুর শোনাচ্ছে নতুন তানে। এই সুরটাকে নন্দিনী চিনতে পারছে - চেনা সুর নয়, তবুও বড্ড চেনা। সে সুর একটাই মন্ত্র দিয়ে যাচ্ছে কানে কানে - সূর্য এখনও ডোবেনি। এখনও পাখিরা দিন শেষের শেষ রবির কিরণ ছুঁয়ে

ফেরেনি নীড়ে। এখনও সারা পৃথিবী মুখরিত নিজেদের কোলাহলে, অট্টরোলে। এখনও যা হয়নি সংগীত, হবে কালকের গীত, নন্দিনীর চেতনার অনুরণনে। সেটাই সংগীত, সেটাই ছবি, নন্দিনীর আগামীর গীত। নিস্তেজ অপরাহ্নে।

তাকিয়ে রইল পলাশ গাছটার দিকে। গাছের পাতাগুলো কেমন নিঃসাড়, প্রাণহীন, স্তব্ধ। বসন্তের আঙিনাতে। সেখানে ঝরে যায় বিস্মৃত বকুল নব কলেবরের সৌরভে। সেখানেই ফোটে নব পল্লব, কিশলয়ের জাগৃতিতে। সেখানেই আছে যত সৌরভ। ফুলঝরা ওই বাগানে। যেখানে অনাবিল স্নিগ্ধ শান্তি খেলে বেড়ায় এই বিশ্ব চরাচরের বুকে। যেখানে সব ক্যানভাস মুছে যায় এক ব্যথাভরা চিরন্তন সুখে। যেখানে স্থিত জাগ্রত জীবাত্মা। সেখানেই প্রকাশ রংহীন অন্তহীন পরমাত্মার, নতুন রং-এর উন্মোচনে।

নন্দিনী সূর্যাস্তের শেষ কিরণের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। স্বাদ নেই, তবু একটা বর্ণ আছে। সে বর্ণটা অর্থহীন এখন নন্দিনীর কাছে। সিগারেটের ধোঁয়াটায় সোয়াস্তি নেই, মুক্তি নেই, আরাম নেই। যেন সব রং মিলে কুণ্ডলী পাকিয়ে বাষ্পে মিশে যাচ্ছে। সিগারেটটা বারান্দার বাইরে ছুড়ে দিতে গিয়ে চোখ পড়ল পলাশ গাছটার দিকে।

শীত তো এখনও আসেনি। তবুও পাতাগুলো কেমন ঝরে ঝরে পরছে বসন্তের স্তব্ধতায়। ঝরা পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে নন্দিনীর মনে হল এটাই বসন্ত। এটাই তো জীবনের সত্যিকারের ক্যানভাস।

মন বলছিল, আরেকটা ছবি আঁকবে, এই স্তব্ধ বদ্ধতার মুখরতায়। সাদা ক্যানভাসে রঙিন বসন্তের আকারহীন ছবি। সেটাই তো সত্যের প্রতিমূর্তি।

তার জীবনের না-ছোঁয়া, এতদিনে চেনা, আসল ক্যানভাস।

তার সদ্য চেনা নিজের ছবি।

যে নন্দিনীকে অন্যরা কেন, সে নিজেও চিনত না। আজ যেন সে সেই অচেনা নন্দিনীকে চিনতে পারছে। মনের ক্যানভাসে।

ক্যানভাসে ছবিটা আঁকা হল...

হয়ত অনেক রং দিয়ে অনেক ছবি আঁকা যায়।

এই সাতটা গল্পের সাতটা ন. নীদের মধ্যে কেউ কিংবা সকলেই ইন্ডিভিজুয়ালি বলতে পারে "এটা আবার কোন ধরনের উপন্যাস হল?"

"নয় কেন?"

"বেশ তো আমার জীবনের একটা সিকোয়েন্স নিয়ে গল্প শুরু করেছিলে। ওটাই কন্টিনিউ করে যেতে পারতে। তাহলেই তো একটা উপন্যাস হয়ে যেত। আমার মধ্যে আবার অন্য নন্দিনীকে টানলে কেন?"

"ক্ষতি কী? কত ভ্যরাইটি আছে লেখাটার মধ্যে"

"ধ্যত... ভ্যারাইটি না ছাই। মাথামুণ্ডু নেই। এভাবে কী কেউ নভেল লেখে?"

"হয়ত লেখে না। লিখলেই বা ক্ষতি কী?"

"এভাবে তো আগে কখনও লেখা হয়নি"

"নয় আমিই লিখলাম..."

"এ মা! তুমি কী বোকা। এই সাতটা নন্দিনীর গল্প নিয়ে সাত-সাতটা নভেল হয়ে যেত। এক সঙ্গে সাতটা নভেল ছাপিয়ে বার করলে কত...ত টাকা পেতে, বল তো? রাইটিং ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার নাম সব জায়গায় ঘোরাফেরা করত"

"নামের কথা বাদ দাও। আমি তো রাইটিং ইন্ডাস্ট্রির লোক নই। আমার ওই পৃথিবীতে কোনো কদরও নেই। তবে কেন ওদের কথা ভেবে আমি লিখব?"

"ওদের কথা না ভাবলেও আমাদের কথা তো ভাবতে পারতে?"

"ভেবেছি তো"

"কই? আমাকে তো সম্পূর্ণভাবে পেলাম না তোমার লেখায়? তুমি তো একটা নন্দিনী থেকে আরেকটা নন্দিনীতে স্কিপ করেছ"

"তাতে অসুবিধে কোথায়? সবার মধ্যে তো একটাই নন্দিনী"

"এমা! তা কখনও হয় নাকি!"

“কেন হতে পারে না?”

“হতে যাবে কেন? হয় না। আমরা প্রত্যেকেই এক একটা নিজস্ব অস্তিত্ব”

“মানছি তোমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন। আমি তো বিভিন্ন নন্দিনীকে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছি”

“বাঁধবার কী দরকার ছিল? সব নন্দিনীকে একসঙ্গে বেঁধে তো আমাদের নিজস্বতাকে নষ্ট করে দিলে। আমরা তো প্রত্যেকেই এক একটা স্বতন্ত্র চরিত্র। আমাদের নিজস্বতা নিয়ে। কী দরকার ছিল আমাদের নিজস্বতাকে ইগনোর করে সবাইকে একটা নন্দিনীর ছাঁচে ফেলতে?”

“এই সব মিলেই তো আসল নন্দিনী”

“তাও কখনও হয় নাকি? প্রত্যেক নারীর একটা নিজস্বতা আছে। একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। একটা নিজস্ব জীবন আছে। একটা নিজস্ব মনন আছে”

“আছে বৈকি”

“তাহলে সব নন্দিনী এক হয়ে গেল কী করে?”

“নিজেদের ভারে”

“ধ্যত... কী যা তা বকছ। তোমার প্রব্লেমটা কোথায় জানো? সবাইকে এক ছাঁচে দেখতে চাইছ”

“সবাই তো মিলমিশে এক। তাই নয় কী?”

“মোটেই না। সবার একটা নিজস্বতা আছে। তোমার প্রত্যকেটা নন্দিনীর মতো। প্রত্যেকেই এক অন্য নারী”

“আমি তো সেই নারীত্বকেই আঁকতে চেয়েছি আমার ক্যানভাসে”

“তোমার ক্যানভাসে তো একটাই নারী। এবার ক্যানভাসটা মুছে ফেলে অনেক মেয়ের ছবি আঁকবে?”

“না আঁকব না। সব মেয়েই আমার কাছে একটা ছবি। আমার গল্পে লেখা আমার মনের তুলির ক্যানভাসে আঁকা নন্দিনী”

“কী করে সব নন্দিনী একটাই হয়ে যায়?”

প্রশ্নটা বড্ড জটিল। ওদের বোঝাই কী করে?

সব নন্দিনীরা ভিন্ন হলেও, আমার উপাখ্যানের নন্দিনী অনন্যা। এটা তো ছকে বাঁধা কোনো গতানুগতিক নভেল নয়। অন্তরের চেতনা।

কেমন করে বোঝাই ওদের, কোথায় পরিতৃপ্তি?

যেখানে চেনা স্রোত মেশে অচেনার মোহনায়। সেখানেই আছে পরিতৃপ্তি নিভৃত সাধনায়। সেখানেই আছে আগামী দিন, নব চিন্তার ভোর। সেখানেই আছে সুপ্ত শান্তি, চেতনার নতুন উত্তরণ। সেখানেই আছে, ফেলে আসা ক্লিসে হয়ে যাওয়া চেতনার আঙ্গিক থেকে নব জাগরণের নতুন উন্মোচন।

আমি শুধু ক্যানভাসে সাতটা রং মিলিয়ে একটাই ছবি আঁকার চেষ্টা করছিলাম। নিজের মতো করে। কিন্তু সাত রং-এর সমন্বয়ে পূর্ণ নন্দিনীর ছবিটা তো সে নিজেই মুছে ফেলল। হয়ত নিজে সম্পূর্ণতা পেয়ে গেছে বলেই। তাই এখনও ক্যানভাসটা সাদা থেকে গেছে। সব রং দিয়ে তুলি বুলিয়েও ছবিটা অসম্পূর্ণ।

লেখার সব নন্দিনীই তো সম্পূর্ণতা খুঁজছিল। তাহলে কী ছবি আঁকতে গিয়েও গল্পের নন্দিনী সম্পূর্ণতা পেল না? কিংবা আমার লেখা নিয়মিত গতের পরিণামে পৌঁছল না?

এদের মধ্যে কোনো এক নন্দিনী তির্যক ভাবে বলল “ছবিটা রাখলেই পারতে...”

“কী রং-এর ছবি?”

“তোমার ওই সাত রং-এর রামধনু দিয়ে আঁকা ছবি”

“নন্দিনীর যে কোনো রং-ই পছন্দ হল না”

“ওই রং মিশিয়ে আরও তো কত রং তৈরি করা যেত”

“হয়ত যেত। কিন্তু নন্দিনীকে ওই ছবিতে ধরা যেত না। কিংবা নন্দিনী নিজেই নিজেকে এঁকেও ধরতে পারেনি”

“কেন?”

“সেই রংগুলোও তো অস্থায়ী”

“কেন?”

“সেগুল তো নন্দিনীর তৈরি করা রং। রং-এর খেলায় সেগুলোও টিকত না”

“তবুও তো ছবিটা থেকে যেত। তোমার চোখে আমাদের ছবি”

“থাকত কী?”

“কেন থাকত না?”

“রং নিয়ে খেলেছ কখনও?”

“ওটা তো আর্টিস্টদের কাজ”

“ওরা খেলে রং নিয়ে, মনের কল্পনাকে ক্যানভাসে ধরে রাখতে” একটু থেমে বললাম “কল্পনাটাকে একটা ক্যানভাসে ধরে রাখতে চায় নিজেদের দেখা চোখে”

“তার জন্যই তো ছবি আঁকা হয় ক্যানভাসে”

“যা কালের চক্রে হারিয়ে যায় বিবর্ণ হয়ে। কারণ সত্যি ছবির তো দুটোই রং হয়”

“কী সেই রং?”

“সে দুটো রং-এর কথা বলেই আমি লেখা শেষ করব। ক্যানভাসে ছবি আঁকতে পারলেও সে ছবি চেনা সহজ নয়। তুমি আলোতে দেখলে একটা রং। অন্ধকারে দেখলে আরেকটা। আমার নন্দিনী, শেষ বার সিগনেচার দিতে গিয়ে নিজের আঁকা ছবিটা আলোতেই দেখেছিল, অন্ধকারে নয়”

“কী দেখেছিল?”

আমার মতো নন্দিনীও তার জীবনের রং মিলিয়ে একটাই ছবি আঁকতে চাইছিল। তার নিজের মনের ছবি। কিন্তু ক্যানভাসে তার আঁকা শেষ হওয়া ছবিটাতে, শেষ তুলি বোলাতে গিয়ে তার সামনে ফুটে উঠেছিল আসল ছবিটা। যা ছবিটাকে প্রাণ দিতে পারে। যার কোনো রং নেই।

সেই ছবিটাকে তো ক্যানভাসে বন্দি করা যায় না। জীবন্ত প্রাণের অন্তরের চেতনাকে, কী কেউ কখনও ক্যানভাসে ধরে রাখতে পেরেছে?

স. ূর্ণ ক্যানভাসের আসল রং

একটা অস্পষ্ট অবয়বকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে কোথায় পৌঁছে গেলাম!

ফেসবুকের মতো ভারচুয়াল জগতের এক অচেনা মহিলার অনুরোধে, তাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে শুরু করেছিলাম। মহিলা কাল্পনিক না হলেও, গল্পটা কাল্পনিক। সেই কাল্পনিক উপাখ্যানে বাস্তবের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছিলাম। না-চেনা নারীকে ক্যানভাসে ফোটাতে চেনা রূপে। রামধনুর সাতটা রং-এর সিঁড়ি বেয়ে নারীর বিভিন্ন রূপের বিন্যাসে। বেগুনি থেকে লাল-এর বিস্তৃত স্পেকট্রামে। জীবনের চলার পথে, এক একটি নারীর নিজস্ব ভূমিকায়।

কিংবা সামগ্রিকভাবে সব ভূমিকাই সমন্বিত অন্তর্নিহিত চেতনার সংমিশ্রণে। প্রত্যেকের নিজস্ব মননের নিজ নিজ রূপে, অন্তরের ব্যাপ্তিতে। চেনা রূপের অচেনা চেতনার রং-এর পারমুটেশন-কম্বিনেশনে।

এই নারীদের মধ্যে যে কোনো মহিলাই, ফেসবুকের সেই অচেনা নারী হতে পারে। কিংবা এদের মধ্যে কোনোটাই নয়। অন্য আরেকজন। অন্য এক বিন্যাসে। নাম যাই হোক না কেন। নন্দিনী, পদ্মিনী, দর্পিণী, মৃগনয়নী, শঙ্খিনী, কৌশানি, রিনি কিংবা অন্য কেউ। নামটা অবান্তর। গল্পের খাতিরে, নামটা নন্দিনী দিয়েছিলাম।

ফেসবুকের ম্যসেজ-বক্সে ম্যসেজ করলাম "গল্পটা লেখা শেষ হয়েছে"

উত্তর এল "আমাকে নিয়ে?"

"তোমাকে নিয়ে কি না বলতে পারব না। তবে একজন মহিলাকে নিয়ে। সে তুমিও হতে পার, আবার নাও হতে পার। অন্য কেউও হতে পারে। আবার সবাই হতে পারে"

ওপাশ থেকে কোনো উত্তর এল না। বোধহয় কনফিউজড হয়ে গেছে। কিংবা যা এক্সপেক্ট করেছিল ঠিক তা পায়নি।

কার যে কী এক্সপেক্টেশন, বোঝা মুশকিল। তাকে খুশি করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। একজন খুশি হলে, আরেকজন খুশি নাও হতে পারে। হয়ত এই মহিলা নিজের অবয়বের

একটা বাস্তব জলছবি দেখতে চাইছিল। কিংবা তার কল্পনার রং-এর ক্যানভাসে নিজের রঙিন ছবিটাই দেখতে চাইছিল।

আমি বোধহয় ক্যানভাসে ছবিটা আঁকতে পারিনি। শেষমেশ আমার গল্পের নন্দিনী সাদা রং টেনে তৈরি ক্যানভাসটা মুছে দিয়েছে।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। মহিলা অসন্তুষ্ট জেনে তাকে আর বিরক্ত করিনি।

হঠাৎ এক শনিবারের সকালে ম্যসেজ বক্সে একটা ম্যসেজ দেখলাম "আমাকে নিয়ে গল্প লেখেননি, তো কাকে নিয়ে লিখলেন?"

"একজন মহিলাকে নিয়ে"

"আমি তো সেই মহিলা"

থমকে গেলাম। কী উত্তর দেব?

ওর হয়ত নিজের সম্বন্ধে একটা ডেফিনেট ধারণা ছিল। কিংবা নিজের চোখে দেখা একটা স্বপ্ন ছবি। কিংবা নিজস্ব চেতনার প্রোজ্জ্বল ছবিটা দেখতে চাইছিল, নান রং-এর মেলায়। নিজের চেতনার প্রতিবিম্ব। হয়ত সেই চেনা আকারের ছবিটাকে নিরাকারে নিয়ে গেছি বলেই ক্ষোভ।

বললাম "তোমার গল্পই তো লিখেছি। কিংবা তোমাদের সকলের গল্প"

"হু..." সংক্ষিপ্ত উত্তর।

কী করে বোঝাই ওকে, এই চেতনাটাই তো আসল ছবি। সত্যিকারে ছবি। মানুষের মনের আসল রং। যা ক্যানভাসে ধরে রাখা যায় না। কিংবা ধরে রাখলেও চেনা যায় না। অথবা সাজিয়ে মুছে ফেলতে হয়। তখন সব রং মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় রংহীন রং-এর খেলায়, ভেসে যায় জাগ্রত চেতনার ধূসর দ্বিপ্রহর বেলায়।

আকাশে ওড়া পাখিটা ডাক দেয় ভেসে যেতে স্বপ্নের বাস্তবে, প্রশস্ত মহাবিশ্বের দিক ছেড়ে, নিজের অন্তরের না-চেনা দিগন্তে। যেখানে চির বসন্ত ছবি এঁকে দেয় অনন্ত কালস্রোতের মহা নির্বাণে। যেখানে সুপ্ত শ্বাস ফেলে নিশ্বাস, জাগতিক রশ্মির কিরণে। যেখানে চিরশান্তি হাতছানি দেয় জীবলোকের আলোকে।

সেটাই তো আসল ক্যানভাস। যাকে আমরা বারবার ধরতে চাই অবচেতনের ছবিতে।

কত লোক মিছে ঘুরে ফেরে দিশাহীন ভাবে ওই আকাশের মিছিলে। অযুত জন তাকে আঁকতে চায় নিযুত কথার মালা দিয়ে, নিজের রঙে মেশা ধ্বজার কেতন উড়িয়ে। নাকি আরও... আরও... আরও বেশি - সহস্র, লক্ষ, কোটি কোটি? অঙ্কের শূন্যগুলো পার হয়ে, শূন্যের গোলকে। হারিয়ে যায় অঙ্ক-বিহীন ভাবের খেলায় এক স্বপ্নমাখা দেশে।

সে দেশে সবাই জাদুকর, বুনে চলেছে নকশিকথা কালের অরবিট ছাড়িয়ে ভূলোক থেকে দ্যুলোকে, মনের রং-এর ব্যাপ্তিকে ছাড়িয়ে, সুপ্ত চেতনা থেকে জাগ্রত আলোকে, বিশ্ব ভেদ করে মহাবিশ্বের মহাব্যোমের ক্যানভাসে। আঁকছে মহাকালের মানচিত্রে, রংহীন ছবি তাদের ম্যাজিক ওয়ান্ড বুলিয়ে।

পরিরা এসে বলে "কার ছবি আঁকতে চাও এ সুন্দর স্বর্গে?"

"তোমাদের ছবি"

"আমাদের ছবি তো তোমার ভেতরে"

"চিনিনি তো তাকে এতদিন"

"ডেকে আনো তোমাদের চিত্রকার নন্দিনীকে। সেই চিনিয়ে দেবে তোমাকে, আমাদের না-চেনা কালোত্তীর্ণ শূন্যতার পূর্ণ ছবি"

নন্দিনী আসতে চায় না।

সে স্বপ্নলোক পেরিয়ে পৌঁছে গেছে নিজের দীপালোকে। নিষ্পলক চেয়ে থাকে বসন্তের রঙিন ঝরা পাতার ফাঁক দিয়ে রংহীন পাতার সুপ্ত আলোকে। সেখানেই তো আছে জীবনের সব চাওয়ার ঠিকানা। রং থেকে মুক্ত হওয়া সাদা মেঘের মোহনা। যেখানে চিরবসন্তের কোকিল গায় সময় কালের বাইরে। যেখানে মর্ত্যের মোহ স্পর্শ করে না নিষ্কলুষ শান্তির দুয়ারে।

সেটাই তো রংহীন পরিদের আসল নিবাস। তাই ওদের অনন্ত আনন্দ, উচ্ছ্বাস।

মর্ত্যের জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতরা বিহ্বল তাকিয়ে থাকে নন্দিনীর দিকে "শেষ পর্যন্ত আসল রংটাকে চিনলে?"

ঘরের ভেতরে, ফেলে আসা ক্যানভাসটার দিকে না তাকিয়ে মুচকি হাসে নন্দিনী।

পণ্ডিত হেসে বলে "ওই যে ছবিটা এত বছর ধরে রং দিয়ে আঁকছিলে, একবার যদি চোখে স্পেক্ট্রোস্কোপ লাগিয়ে দেখতে। ওটা তো শুধু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ঢেউয়ের মেলা।

ছোটো বড় ঢেউয়ে পালটে যাচ্ছে শক্তির খেলা। তুমি এতদিন চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে ভাবছিলে রং নিয়ে খেলছ! হে... হে... হে...”

নন্দিনী বোঝে রং-এর কারিগর চিত্রকরদের মিরাজটাকে। খুঁজতে খুঁজতে, মিশতে মিশতে, এক সময় হারিয়ে যায়।

পণ্ডিত কানে কানে ফিসফিস করে “এই যে লালের মেলা দেখে লাফাচ্ছ, নানা বিশেষণে তাকে সাজাচ্ছ, কখনও বিপ্লবের বন্যার সাজে, কখনও প্রবহমান রক্তকণিকার স্রোতে, কখনও বা দয়িতার লাজুক লালিমায় - ওটা তো সব থেকে দুর্বল রং। আর ওই বেগুনি রংটা? ওটা যে লালের থেকে অনেক জোরালো, সে খবর রাখ?”

নন্দিনী কতদিন ধরে তো এই রং নিয়েই খেলেছে। কখনও চিত্রপটে, কখনও জীবনের মাঠে। খেলতে খেলতে রং-এর মাধুর্য মলিন হয়ে গেছে এত রং-এর মেলায়। আর সেই মলিন কঠোর রুক্ষ পৃথিবীতে যে রংটা সব থেকে ভেজাল, সেই সাদা রং নিয়েই সবাই মাতামাতি করে।

সাদা দেখলেই তো মানসিক পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা শ্যমলা ক্রীতদাসরা লাফিয়ে ওঠে। সাদা চামড়া দেখলেই ভয়ে জড়োসড়ো কেঁচো হয়ে পা চাটতে শুরু করে। নয়ত লালসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আ-দেখলার মতো। যেন পৃথিবীর সব সম্ভার লুকিয়ে আছে ওই সাদার আড়ালে। নয়ত সাবেকি প্রথার না-বোঝা নিয়মের বন্ধনে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে, তাকে পবিত্রতার মোড়কে উপঢৌকন সাজিয়ে, বিয়ে থেকে শ্মশানে সঙ্গী করে, মর্ত্য থেকে স্বর্গের স্পর্শ পেতে।

অথচ ওই সাদাটাই হচ্ছে সব থেকে ভেজাল। সব রং মিশেই তো ওর সৃষ্টি।

এই তো কালই তার বাগানের মালীটাকে নন্দিনী জিজ্ঞেস করেছিল “সারাদিন তো গাছপালা নিয়ে আছ। জান কী এই গাছের রংগুলো সব দুটো রং-এই মেশে?”

গাছের চারায় জল দিতে দিতে মালী বলেছিল “অতশত বুঝিনে দিদিমণি, পষ্ট দেখছি গোলাপটা লাল আর রজনীগন্ধাটা সাদা। আর তুমি কি না মোটা মোটা বইয়ের ছাইভস্ম কতা আমায় শোনাচ্ছ। আমি যে মাথামুণ্ডু কিসুই বুঝিনে”

প্রথম জীবনে কত ছেলের মুখেই না শুনেছে জীবনানন্দর কবিতা চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা

আজ যেন পণ্ডিত, কবির কল্পনার বনলতা সেনকে নতুন করে চেনাচ্ছে নন্দিনীকে। অন্ধকারে সব রং মিলেই তো কালো দেখায়। নয় কী? কবি বুঝি রং হারিয়ে, অন্য রং না খুঁজে পেয়ে, তার চিরতৃপ্তির শান্তিকে, সব রং-এর মিশ্রণে মিশিয়ে ফেলেছে।

ওই যে কালী মন্দিরে দেবীর বন্দনা হচ্ছে, তারাও কিন্তু সব রং-এর সংমিশ্রণে গড়া পাথর প্রতিমার বন্দনা গানের আরাধনায় ব্যস্ত মা কী আমার কালো রে... তারপর দুচোখ ভাসিয়ে হৃদমাঝারে কালীমূর্তির ধ্যান করতে করতে বলছে এ কালো সে কালো নয় গো শ্যামা, ভুলাবি কী মা মায়ার জালে? কৃষ্ণভক্তরা তাদের সুরে তাল মিলিয়ে গাইছে কালাচাঁদের রূপ দেখলে কী আর কেউ ওকথা বলতে পারে?

তাদের বন্দনাগান শুনে পণ্ডিত মুচকি মুচকি হাসছে।

এই বসন্তের স্তব্ধ ঝরা পাতাগুলো নন্দিনীকে আরেক সুর শোনাচ্ছে। এতদিন ধরে যে রংগুলো নিয়ে ক্যানভাসে আঁকিবুঁকি কাটছিল, আজ ওই সাদা ক্যানভাসটার দিকে ফ্যলফ্যল করে তাকিয়ে, বাইরে এসে লাল পলাশ গাছ থেকে পাতাগুলোকে ঝরে পড়তে দেখে নন্দিনীর মনে হল, এতদিন কী বোকাই না সে! এতদিন ধরে সাতটা রং-কে সাতশো রং-এর প্যলেটে মিশিয়ে, সে কী রং-এর ছবি আঁকার চেষ্টা করছিল তার ক্যানভাসে?

আজ মুক্ত জীবনের আঙিনায় দাঁড়িয়ে তার মনে হল, জীবনের সব রংগুলো তো সাতরং-এর ক্যলিডস্কপিক খেলা। সেই খেলা ভাঙার খেলার দেওয়ালিতে, সাতটা রং যতই ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে যত রকম প্যাটার্ন তৈরি করুক না কেন, শেষমেশ মিলে যাচ্ছে একটাই রঙে। তার মনের লুকানো ভেলায়, তাকে নিয়ে যেতে ছোটবেলায় ওই স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের দেশে।

নিরাকারের বর্ণহীন আকারে - শ্বেতশুভ্র শান্তির বর্ণহীন মহাবিশ্বে।

নন্দিনীর মনে হল, এই বর্ণহীন বর্ণটাই তো আসল বর্ণ। তার জীবনের সাত-সাতটা রং-এর ঝলকানির রূপ যেন মিলেমিশে একাকার। ধূসর বর্ণহীন অনাড়ম্বর। যেখানে হাসি-কান্না, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ স্থবির। জাগতিক শেষ বর্ণ মিশেছে মহাজাগতিকের প্রেমে। সেখানেই তার সম্পূর্ণতা। সেখানেই তার পরিপূর্ণতা। সেখানেই সে আসল নন্দিনী।

তারপর?

কোনো গভীর কোণ থেকে একটা সুর ভেসে আসে ঘুড়ি লক্ষে দু-একটা কাটে মা, হেসে দাও গো হাত চাপড়ি।

নন্দিনী সেই দু-একটা কাটা ঘুড়ির ওপর ভর করে পৌঁছে গেল এক অবাক জগতে, সব আলোর ওপারে, এক আলো-উজানির দেশে, গুণ ছাড়িয়ে নির্গুণের রাজ্যে...

যেখানে আলো নেই তবু আলোর বন্যা, যেখানে গন্ধ নেই তবু সুগন্ধের ঝর্না, যেখানে কেউ নেই, তবু যেন কার অমৃতস্পর্শে দেহ মন আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে প্রতি পলে। যেখানে স্তম্ভিত জাগ্রত মহাবিশ্ব বরণ করে নেয় তার সত্ত্বা আর আত্মাকে পরম স্নেহে। কানে কানে নিঃশব্দে শোনায় এক গম্ভীর প্রণবধ্বনি শান্তির আলোকে, মহাবিশ্বের পরম সত্যের অমৃত কথাঃ

'ওঁ প্রত্যাগ্যানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপং

অ-কার উ-কার ম-কার ইতি

ওঁ স্বর্বভূতস্থং একং বই নারায়ণং পরমপুরুষং

অকারণং পরমব্রহ্মং ওঁ

ওমিতি ব্রহ্ম ওমিতি ব্রহ্ম...'